বাংলা একাডেমি
বাংলাদেশের
লোকজ সংস্কৃতি
গ্রন্থমালা
বান্দরবান

বাংলা একাডেমি
বাংলাদেশের
লোকজ সংস্কৃতি
গ্রন্থমালা

বাংলা একাডেমি

বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা

বান্দরবান

প্রধান সম্পাদক

শামসুজ্জামান খান

ব্যবস্থাপনা সম্পাদক

মো. আলতাফ হোসেন

সহযোগী সম্পাদক

আমিনুর রহমান সুলতান

বাংলা একাডেমি ঢাকা

প্রধান সমন্বয়কারী

চৌধুরী বাবুল বড়ুয়া

সংগ্রাহক

এ.টি.এম এমদাদ হোসেন
জির কুং সাহু
সিংইয়ং ম্রো
ক্যসামং মারমা
সিঅং খুমী

বাংলা একাডেমি
বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা
বান্দরবান

প্রথম প্রকাশ
আষাঢ় ১৪২১/জুন ২০১৪

বাএ ৫৩১১

প্রকাশক
মো. আলতাফ হোসেন
লোকজ সংস্কৃতির বিকাশ কর্মসূচি
বাংলা একাডেমি ঢাকা

মুদ্রণ
সমীর কুমার সরকার
ব্যবস্থাপক
বাংলা একাডেমি প্রেস

প্রচ্ছদ
কাইয়ুম চৌধুরী

মূল্য
২৩০.০০ টাকা

BANGLADESHER LOKOJO SOMSKRITI GRONTHAMALA : Bandarban (Present state of Folklore in Bandarban District) Chief Editor : Shamsuzzaman Khan. Managing Editor : Md. Altaf Hossain, Associate Editor : Aminur Rahman Sultan. Publication : *Lokojo Somskritir Bikash Karmosuchi* (Programme for the Development of Folklore), Bangla Academy, Dhaka 1000, Bangladesh. First Published : June 2014, Price : Tk. 230.00 Only. US $: 4.00

ISBN 9 840-7-5320-7

প্রসঙ্গ-কথা

বাংলা একাডেমি তার জন্মলগ্ন থেকেই বাংলাদেশের সমৃদ্ধ ফোকলোর উপাদান (folklore materials) সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং তার গবেষণার প্রয়াস চালিয়ে আসছে। এই কাজের জন্য সূচনাপর্বেই একটি ফোকলোর বিভাগও গঠন করা হয়। এই বিভাগটির নাম লোকসংস্কৃতি বা ঐতিহ্যগত সংস্কৃতি বিভাগ না রেখে ফোকলোর নামটি যে ব্যবহার করা হয় তাতে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। যতদূর জানা যায়, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ এই নামকরণ করেন। তবে একই সঙ্গে ফিল্ডওয়ার্কভিত্তিক সংগ্রহ প্রকাশের জন্য যে-সংকলনটি প্রকাশ করা হয় তার নাম ছিল *লোকসাহিত্য সংকলন*। এই নামটি ফোকলোরের অনেকগুলো শাখাপ্রশাখার (genre) একটি প্রধান শাখা মাত্র (folk literature)। এর ফলে ফোকলোরের আধুনিক ও সার্বিক ধারণা সম্পর্কে কিছু অস্পষ্টতার পরিচয় পরিলক্ষিত হয়। এই অপূর্ণতা পূরণের উদ্দেশ্যে ১৯৮৫ সালে আমরা যখন বাংলা একাডেমি থেকে ফোকলোর আধুনিকায়নের লক্ষ্যে ফোর্ড ফাউন্ডেশনের অর্থানুকূল্যে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ফোকলোরবিদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বার্কলিস্থ ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রখ্যাত অধ্যাপক অ্যালান ডান্ডেস, ফিনল্যান্ডস্থ নরডিক ইনস্টিটিউট অব ফোকলোরের পরিচালক প্রফেসর লাউরি হংকো, ভারতের মহীশূরস্থ কেন্দ্রীয় ভাষা ইনস্টিটিউটের ফোকলোর বিভাগের প্রধান ড. জহরলাল হান্ডু, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ববিখ্যাত লোকশিল্প বিশেষজ্ঞ ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফোকলোর বিভাগের অধ্যাপক হেনরি গ্লাসি, ইউনিভার্সিটি অব পেনসিলভানিয়ার অধ্যাপিকা মার্গারেট এন মিলস্, পাকিস্তানের লোকভিরসার (ফোকলোর ইনস্টিটিউট অব পাকিস্তান) নির্বাহী পরিচালক আকসি মুফতি, ফিনল্যান্ডের ফোকলোর বিশেষজ্ঞ ড. হারবিলাতি এবং কলকাতার Folklore পত্রিকার সম্পাদক শঙ্কর সেনগুপ্ত প্রমুখ বিশেষজ্ঞবৃন্দকে কর্মশালার ফ্যাকাল্টি মেম্বার করে তিনটি আন্তর্জাতিক কর্মশালার আয়োজন করি। এতে বাংলাদেশের ফোকলোর-বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক মযহারুল ইসলাম, অধ্যাপক আশরাফ সিদ্দিকী, অধ্যাপক আবদুল হাফিজ, অধ্যক্ষ তোফায়েল আহমদ, অধ্যাপক নিয়াজ জামান, ড. হামিদা হোসেন, মিসেস পারভীন আহমেদ প্রমুখ প্রশিক্ষণ দান করেন। বাংলাদেশের আধুনিক ফোকলোর চর্চার অন্যতম পথিকৃৎ অধ্যাপক মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন প্রধান অতিথি হিসেবে প্রথম কর্মশালাটির উদ্বোধন করেন। সেই কর্মশালাসমূহের অভিজ্ঞতার প্রেক্ষাপটে একাডেমির ফিল্ডওয়ার্কভিত্তিক লোকজ উপাদান সংগ্রহসমূহ প্রকাশের পত্রিকার নাম *লোকসাহিত্য সংকলন* পরিবর্তন করে *ফোকলোর সংকলন* নামকরণ করা হয়। ওই কর্মশালা আয়োজনের আগে দেশব্যাপী একটি জরিপের মাধ্যমে ফোকলোরের কোন কোন ক্ষেত্রে কাজ হয়েছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে একেবারেই কোনো কাজ হয়নি তা চিহ্নিত করার জন্য দেশের বিভিন্ন স্থানে জরিপ চালানো হয়। তবে তখন লোকবল এবং অর্থ সংস্থান সীমিত থাকায় তাকে খুব ব্যাপক করা যায়নি। ফলে বাংলাদেশে ফোকলোর সংগ্রহ,

সংরক্ষণ ও গবেষণার উপর যে-সমস্ত গ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়েছে তার একটি দ্বিভাষিক গ্রন্থ *Bibliography of Folklore in Bangladesh* এবং *Folklore of Bangladesh* নামে ইংরেজি ভাষায় একটি সংকলন গ্রন্থ প্রকাশ করা হয়। এছাড়া *মৈয়মনসিংহ গীতিকা* যেহেতু আমাদের ফোকলোর গবেষণার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হিসেবে বিবেচিত সে-কথাটি মনে রেখে *লোকসংগীত সমীক্ষা : কেন্দুয়া অঞ্চল* প্রকাশ করা হয়। এর লক্ষ্য ছিল *মৈয়মনসিংহ গীতিকা*-র পটভূমি (context) সম্পর্কে অবহিত হওয়া। এ ধরনের বিচ্ছিন্ন দু-একটি কাজের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে ফোকলোরের সামগ্রিক চিত্র পরিস্ফুট হয়নি। সে-কাজ করার মতো অবকাঠামোগত ব্যবস্থা, আর্থিক সঙ্গতি এবং প্রশিক্ষিত লোকবলও তখন বাংলা একাডেমিতে ছিল না। তবুও যাঁরা ছিলেন তাঁরা সকলেই অত্যন্ত নিষ্ঠা ও পরিশ্রমের সঙ্গে কাজ করার ফলে উপাদান যে কম সংগৃহীত হয়েছিল তা নয়। কিন্তু সর্বসাম্প্রতিক গবেষণা পদ্ধতি ও তাত্ত্বিক বিষয়ে ভালো ধারণা না থাকায় বাংলাদেশের ফোকলোরের সামগ্রিক চিত্র যথাযথভাবে উদ্‌ঘাটিত হয়নি। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, কয়েক বছর আগে এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে Cultural Survey of Bangladesh গ্রন্থমালা-এর অধীনে ফোকলোর অংশ ইংরেজি ও বাংলা ভাষায় প্রকাশ করা হয়েছে। এতেও বাংলাদেশের ফোকলোরের ব্যাপকতা, আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের ধরন এবং উপাদানসমূহের প্রবহমানতার ফলে নিয়ত যে পরিবর্তন ঘটছে সে-সম্পর্কেও মাঠপর্যায়ভিত্তিক বাস্তব অভিজ্ঞতালব্ধ (empirical) গবেষণার পরিচয় খুব একটা লক্ষ করা যায় না।

ফোকলোর সমাজ পরিবর্তনের (social change) সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত, বিবর্তিত ও রূপান্তরিত হয়। কোনো কোনো উপাদানের কার্যকারিতা (function) সমাজে না থাকায় তা তখন ফোকলোর হিসেবে বিবেচিত হয় না। সেজন্যই যে-সমস্ত ফোকলোর উপাদানের সামাজিক উপযোগিতা নেই এবং সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে তার কী ধরনের রূপান্তর ঘটছে তা যদি ব্যাখ্যা করা না হয় তা হলে তাকে আধুনিক ফোকলোর গবেষণা বলা যায় না। ফোকলোরের সামাজিক উপযোগিতার একটি প্রধান দিক হলো এর পরিবেশনা (performance)। ফোকলোর হিসেবে চিহ্নিত হওয়ার জন্য সমাজে এর পারফরমেন্স থাকা চাই। ফোকলোরবিদ্যার এ-কালের প্রখ্যাত গবেষক ও পণ্ডিত প্রফেসর রজার ডি আব্রাহামস্ (Professor Roger D Abrahams) তাই বলেছেন, "Folklore is folklore only when performed". অর্থাৎ, যে-সমস্ত ফোকলোর উপাদানের এখন আর পরিবেশনা বা অন্য কোনো সামাজিক কার্যকারিতা (social function and utility) নেই তা আর ফোকলোর নয়।

ফোকলোর চলমান (dynamic) এবং বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষুদ্র গ্রুপসমূহের মধ্যে শিল্পিত সংযোগের (artistic communication) এক শক্তিশালী মাধ্যম। বর্তমান যুগ সংযোগের (age of communication) যুগ। দেশের বিভিন্ন স্থানে স্থানীয় গ্রুপসমূহের মধ্যে লোকজ উপাদানসমূহের (folkloric elements) কীভাবে সাংস্কৃতিক ও শিল্পসম্মত সংযোগ তৈরি হচ্ছে তা জানা ও বোঝার জন্য ফোকলোরের গুরুত্বও তাই সামান্য নয়। এই বিষয়গুলোকে মাথায় রেখেই বর্তমান শেখ হাসিনা সরকারের অর্থানুকূল্যে বাংলা একাডেমি ২০১০-১১ অর্থবছর থেকে *লোকজ সংস্কৃতির বিকাশ কর্মসূচি*-র মাধ্যমে দেশের ৬৪টি জেলার সামাজিক-সাংস্কৃতিক রূপান্তরের

ধারায় লোকজ সংস্কৃতির ইতিহাসের একটি রূপরেখা তুলে ধরার লক্ষ্যে প্রতিটি জেলায় একজন প্রধান সমন্বয়কারী এবং একাধিক সংগ্রাহক নিয়োগের মাধ্যমে জেলাসমূহের তৃণমূল পর্যায় থেকে ফিল্ডওয়ার্কের মাধ্যমে উপাদান সংগ্রহের কাজ শুরু করে। কাজের শুরুতে অকুস্থল থেকে কীভাবে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করতে হবে সে-সম্পর্কে তাদের হাতে প্রথমে একটি সাধারণ পরিচিতিমূলক ধারণাপত্র ধরিয়ে দেওয়া হয়। তা ছিল নিম্নরূপ :

লোকজ সংস্কৃতির তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন সংক্রান্ত নির্দেশাবলি

স্থবিরতা নয়, সামাজিক প্রবহমানতার মধ্যে লোকজ সংস্কৃতির উপাদান সংগ্রহ করাই এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য

এই কর্মসূচির উদ্দেশ্য হলো দেশের প্রতিটি জেলার লোকজ সংস্কৃতির তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করে বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতির বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে জানা। সেই লক্ষ্যে প্রতিটি জেলার জন্য মনোনীত একজন প্রধান সমন্বয়কারীর তত্ত্বাবধানে সংগ্রাহকদের মাধ্যমে কাজটি সম্পন্ন করা।

কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে যা করতে হবে

১. সংশ্লিষ্ট জেলা/উপজেলার ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও ফোকলোর বিষয়ক গ্রন্থ পাঠ করতে হবে।
২. সংযোগ ব্যক্তি (contact person) পূর্বেই নির্বাচন করতে হবে।
৩. সংশ্লিষ্ট এলাকায় থাকার ব্যবস্থা আগে থেকেই ঠিক করে রাখতে হবে।
৪. সকল তথ্য-উপাত্ত সরাসরি সক্রিয় ঐতিহ্যধারক (active tradition-bearer)-এর কাছ থেকে সংগ্রহ করতে হবে।
৫. সংগৃহীত তথ্য-উপাত্ত অবশ্যই মৌলিক ও বিশ্বস্ত হতে হবে।
৬. সংগ্রহকালে প্রয়োজনীয় প্রতিটি বিষয় ও পর্যায়ের আলোকচিত্র গ্রহণ করতে হবে।
৭. সংগ্রহ পাঠাবার সময় কাগজের এক পৃষ্ঠা ব্যবহার করতে হবে।
৮. প্রতিটি পৃষ্ঠার নিচে পাদটীকায় দুরূহ আঞ্চলিক শব্দের অর্থ ও প্রয়োজনীয় টীকা (তথ্যদাতার কাছ থেকে জেনে নিয়ে) দিতে হবে।
৯. সংগ্রহ পাঠানোর সময় সেগুলোর কপি নিজেদের কাছে রাখতে হবে।
১০. সংগ্রাহক ও তথ্য প্রদানকারীর নাম, ছবি, বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা, পেশা, বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা (যদি থাকে) প্রভৃতি উল্লেখ করতে হবে।
১১. সংগ্রহের তারিখ, সময় ও স্থান অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে।
১২. বই/প্রবন্ধ থেকে কোনো তথ্য/বিবরণ নেয়া যাবে না। তবে উদ্ধৃতি দেয়া যাবে।

যেসব তথ্য/উপাদান সংগ্রহ ও লিপিবদ্ধ করে পাঠাতে হবে

ক. জেলা/উপজেলার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

১. জেলা/উপজেলার সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাস ও পরিবেশ-প্রতিবেশ (milieu and context)-এর বিবরণ (২০ পৃষ্ঠা)।

২. জেলা/উপজেলার মানচিত্র, সীমানা, শিক্ষার হার, জনসংখ্যার বৈশিষ্ট্য (১০ পৃষ্ঠা)।
৩. জেলা/উপজেলার নদনদী, পুকুরদিঘি, মসজিদ-মন্দির ইত্যাদি লোকজ সংস্কৃতির উপাদান সৃষ্টিতে কী ভূমিকা রাখছে তার বিবরণ (১৫ পৃষ্ঠা)।
৪. জেলা/উপজেলার প্রধান প্রধান খাদ্যশস্য ও চাষাবাদের সঙ্গে লোকজ ঐতিহ্যের সম্পর্ক (যেমন : নবান্ন, পিঠাপুলি, পৌষপার্বণ, বৈশাখি খাবার ইত্যাদি) (২০ পৃষ্ঠা)।
৫. জেলা/উপজেলার ঘরবাড়ি, পোশাক-পরিচ্ছদ, খাদ্য-খাবারের লোকজ-ঐতিহ্যগত বৈশিষ্ট্য (১৫ পৃষ্ঠা)।
৬. লোকজ সংস্কৃতিতে জেলা/উপজেলার হাটবাজারের ভূমিকা (৫ পৃষ্ঠা)।
৭. অন্যান্য ঐতিহ্যিক বিষয়াদি (যদি থাকে)।

খ. লোকজ সংস্কৃতির তথ্য-উপাত্ত সম্পর্কিত

১. জেলা/উপজেলার প্রধান প্রধান লোকসংগীতের নাম, ফর্ম ও গায়নরীতি, কারা গায়ক, কখন গাওয়া হয় ইত্যাদির বিবরণ (৪০ পৃষ্ঠা)।
   ক. লোকসংগীত আসরের বিবরণ, দর্শকশ্রোতার প্রতিক্রিয়া, কবিয়াল/বয়াতির সংগীত পরিবেশন কৌশল ইত্যাদি লিপিবদ্ধ করতে হবে।
   খ. সংগৃহীত লোকসংগীত কোন্ শাখার (যেমন : কবিগান, জারিগান, গম্ভীরাগান, সারিগান, বাউলগান, মেয়েলি গীত, বারোমাসি ইত্যাদি) উল্লেখ করতে হবে।

ফিল্ডওয়ার্ক-এর ছক ও আনুষঙ্গিক তথ্যপত্র

প্রস্তুতিপর্ব : ম্যাপ, স্থানীয় ইতিহাস ও সংশ্লিষ্ট বইপুস্তক দেখা, পাঠ ও অনুসন্ধান/সংযোগ ব্যক্তি ও থাকার জায়গা ঠিক করা

ক. ফিল্ডওয়ার্কের নাম, সময়সীমা ও বিষয়, উদ্দেশ্য, প্রকৃতি অর্থ-সংস্থান-সূত্র, উদ্যোক্তা ইত্যাদি ঠিক করা।
খ. ডেস্ক-ওয়ার্কের পরিকল্পনার বিবরণ, ডিভিশন অব লেবার (যৌথ ফিল্ডওয়ার্কে) ও প্রাসঙ্গিক তথ্য।
গ. দলের গঠন-প্রকৃতি, সদস্যবৃন্দ ও ব্যবহৃতব্য যন্ত্রপাতি।
ঘ. যাত্রার বিবরণ (খুব সংক্ষিপ্ত) : যানবাহন, যাত্রা-পথ।
ঙ. স্থানীয় সংযোগ ব্যক্তির নাম ও পরিচয়।
চ. থাকার স্থান : সুবিধা-অসুবিধা এবং ফিল্ডগ্রুপের অকুস্থলে পৌঁছা এবং কোনো কর্মবিভাগ বা আলোচনা হলে তার বিবরণ।
ছ. Milieu-এর প্রাসঙ্গিক বর্ণনা।
জ. উৎসবধর্মী-অনুষ্ঠান হলে : সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, ধরন, কী কী Genre-এর Performance হবে তার বর্ণনা, এর উদ্যোক্তা, অর্থনীতি, উদ্দেশ্য-এর মূল আকর্ষণ বা Main Item- যোগদানকারীদের ধরন, শ্রেণি বয়োবর্গ উদ্দেশ্য, যাতায়াত ও থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা।

ঝ. ফটোগ্রাফার/ভিডিওগ্রাফার থাকলে তিনি নিসর্গ-বিন্যাস, গৃহ ও বাস্তব জীবন-যাত্রার ধরন ও সামাজিক অর্থনৈতিক জীবনের প্রাসঙ্গিক পটভূমির (relevant context) চিত্র বা ভিজ্যুয়াল নেবেন।

১. যে অনুষ্ঠানে ছবি বা ভিজ্যুয়াল নেবেন তার ডিটেইলস, শিল্পীদের গঠন (একক, গ্রুপ, পুরুষ, মহিলা, দ্বৈত, সমবেত), সঙ্গতীয়াদের বাদ্যযন্ত্রাদির ডকুমেন্টেশন করবেন—শিল্পীদের সাদাকালো ছবি কিছু নেবেন, দলনেতাদের সঙ্গে আলোচনা করে বিশেষ ফোকাস ও সময়সীমা এবং তারিখ নির্ধারণ।

২. খাতায় শিল্পী ও সঙ্গতীয়াদের নাম লিখবেন ও চিহ্নিতকরণের ব্যবস্থা করবেন।

৩. শিল্পীর কোনো গান থাকলে বা ভিডিওতে থাকলে ক্রস রেফারেন্স হিসেবে কোন্ ফিল্ড-সহকর্মী লিখেছেন তার নোট রাখবেন।

৪. মনিটর নেবেন এবং শিল্পী বা তথ্যদাতা রেকর্ড কেমন হলো দেখতে চাইলে দেখাবেন।

৫. কী কী যন্ত্রপাতি নিচ্ছেন তার তালিকা করবেন এবং কতটি ক্যাসেট, ফিল্ম নিলেন তার নাম, সংখ্যা ও দাম লিপিবদ্ধ করবেন এবং অফিসের রেকর্ড-বুকে তুলে রাখবেন।

ঞ. গবেষক যে তথ্যদাতা (informant) বা সংলাপীর (interlocuter) জীবন তথ্য বা অনুষ্ঠানের পরিবেশনার তথ্য (repertoire) নিচ্ছেন তা তিনি একটি প্রক্রিয়া (process) হিসেবে পর্যায়ক্রমে অনুপুঙ্খভাবে নেবেন। প্রয়োজনে তথ্যদাতার সঙ্গে বার বার সংলাপে বসবেন এবং নিয়মিত যোগাযোগ রাখবেন। গোটা পরিবেশনার বৈশিষ্ট্য এতে বিধৃত হবে। ক্রস রেফারেন্স হিসেবে তথ্যদাতা সংলাপীর ছবি নেয়া হয়েছে কিনা নিশ্চিত হবেন। গানের শিল্পী হলে গান যথাযথভাবে (exactly performed) লিখে শিল্পীকে দিয়ে চেক করিয়ে নেবেন।

ট. উৎসবে/এক বা দুই দিনের ফিল্ডওয়ার্কে ব্যক্তি শিল্পীর সঙ্গে বিস্তৃত কাজ করার সুযোগ কম। তবু যতদূর সম্ভব Dialogical Anthropology-র পদ্ধতি অনুসরণ করার চেষ্টা করতে হবে। এক্ষেত্রে একটি বিশেষ সংস্কৃতিতে দেখতে হবে "From the perspective of living community and to be specific, functionally", ফলে জীবন্ত সমাজ বা গ্রুপের যে-সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বা ধারা নিয়ে যে-ফিল্ডওয়ার্কার কাজ করবেন তাকে ওই সংস্কৃতি বা উপাদানের সামাজিক, সাংস্কৃতিক গতিশীলতার (dynamics) অভ্যন্তরীণ নিয়ম (inner rule) এবং পরিবেশনায় শিল্পীর ভূমিকা (role) ও উদ্ভাবনা এবং দর্শকশ্রোতা (audiance) সক্রিয় ঐতিহ্যবাহকের (active tradition-bearer) প্রতিক্রিয়া/ মিথস্ক্রিয়া বুঝে নিতে হবে—তথ্যদাতাদের সঙ্গে সংলাপের মাধ্যমে বা সময় থাকলে রিফ্লেক্সিভ এথনোগ্রাফির মাধ্যমে। এ ধরনের কাজে তথ্যদাতা বা সংলাপী ওই সংস্কৃতির অভ্যন্তরীণ ব্যাখ্যাতা, বিশেষ শব্দ, প্রতীক বা দুর্জ্ঞেয় তত্ত্বের ব্যাখ্যাতাও হবেন তিনি এবং ফিল্ড গবেষক বাইরের দিক থেকে পর্যবেক্ষক, দলিলীকরণকারী ও সংলাপ সমন্বয়ক। তিনিও ব্যাখ্যাতা তবে বাইরের দিক থেকে।

ঠ. যৌথ ফিল্ডওয়ার্কে দলনেতা প্রতিদিন রাতে সমন্বয় ও মূল্যায়ন সভা করবেন এবং প্রয়োজনে পরিকল্পনার পরিবর্তন বা পুনর্বিন্যাস করবেন।

ড. প্রত্যেক সদস্য যন্ত্রপাতির হেফাজত ও নিরাপত্তার প্রতি লক্ষ রাখবেন।

ঢ. ফিল্ডওয়ার্ক থেকে ফিরে সাত দিনের মধ্যে সকল সদস্য নিজ নিজ প্রতিবেদন জমা দেবেন। ভিডিওগ্রাফার-ফটোগ্রাফার তার কাজ শেষে জমা দেবেন। এরপরে একটি সমন্বয় সভা করে সংগ্রহসমূহের আর্কাইভিং, সম্পাদনা বা প্রকাশনার ব্যবস্থা করতে হবে।

মনে রাখবেন, ফোকলোরবিদ হিসেবে আপনার কাজ হলো আপনার তথ্য-উপাত্ত-উপাদানকে যে-সমাজের ফোকলোর তাদের দৈনন্দিন জীবন, বিশ্বাস-সংস্কার-বিচার-বিবেচনা এবং বিশ্ববীক্ষার নিরন্তর পরিবর্তনশীলতার প্রেক্ষাপটে খুঁটিয়ে দেখে বস্তুনিষ্ঠভাবে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা। উপাদানের অর্থ ও ইতিহাস তাদের কাছ থেকেই জানা এবং সেভাবে রেকর্ড করা।

এই নির্দেশনাটি সমন্বয়কারী এবং সংগ্রাহকদের কাজের জন্য যথেষ্ট ছিল না। কারণ, যাদের নির্বাচন করা হয়েছিল তাদের অনেকেরই আধুনিক ফোকলোর সংগ্রহের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক ধারণা তেমন একটা ছিল না। ১৯৬০-এর দশক থেকে পাশ্চাত্য বিশ্বে ফোকলোর চর্চার (folklore studies) যে নতুন প্যারাডাইম (paradigm) তৈরি হয় তার সঙ্গে আমাদের দেশের ফোকলোর অনুরাগীদের এখন পর্যন্ত সুস্পষ্ট কোনো পরিচিতি ঘটেনি। তাছাড়া আমাদের দেশের ইতিহাসের প্রাচীনতার জন্য এখানকার ফোকলোর চর্চা শুধুমাত্র পাশ্চাত্যের মতো সংকালিক (synchronic) ধারার হলেই উপাদানসমূহের মর্মার্থ যে বোঝা যাবে না সেই জায়গাটা বুঝে নেয়া আরও জটিল। আমাদের ফোকলোর উপাদানের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ইতিহাসের পটে (diachronic) স্থাপন করেই প্রেক্ষাপট (context) হিসেবে অকুস্থলের পরিবেশনকলার (local performance) অনুপুঙ্খ রেকর্ড না করা হলে সে-ব্যাখ্যাবয়ান বাস্তবানুসারী (empirical) হবে না। এই কথাগুলো মনে রেখেই সংগ্রহ কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিদের (field-worker) জন্য দুইটি আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ এবং দুইটি কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণ প্রদান করেন বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক শামসুজ্জামান খান, ড. ফিরোজ মাহমুদ, অধ্যাপক সৈয়দ জামিল আহমেদ এবং বাংলা একাডেমির পরিচালক জনাব শাহিদা খাতুন। কক্সবাজারের আঞ্চলিক প্রশিক্ষণে অন্তর্ভুক্ত করা হয় চট্টগ্রাম, সিলেট ও বরিশাল বিভাগের সমন্বয়ক ও সংগ্রাহকদের। অন্যদিকে রাজশাহির প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন রাজশাহি ও খুলনা বিভাগের সমন্বয়ক ও সংগ্রাহকেরা। ঢাকার কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণে সকল অঞ্চলের সমন্বয়ক এবং সংগ্রাহক অংশগ্রহণ করেন। এই চারটি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আধুনিক ও বাস্তব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ফোকলোর সংগ্রহ সম্পর্কে সমন্বয়কারী ও সংগ্রাহকদের ধারণা দেবার চেষ্টা করা হয়।

এই পর্যায়ে মূল কাজটি করার জন্য একটি সুস্পষ্ট রেখাচিত্র প্রশিক্ষণার্থীদের হাতে ধরিয়ে দেয়া হয় :

লোকজ সংস্কৃতির বিকাশ কর্মসূচি
নির্দেশিকা

সংজ্ঞা : Folklore : Artistic communication in small groups– Dan-Ben-Amos

ফোকলোর উপাদান চেনার উপায় : Folklore is folklore only when performed– Rodger D Abrahams

জীবন্ত/বর্তমানে প্রচলিত না থাকলে তা Folklore নয়।

জেলা পরিচিতিতে যা থাকবে :

১. নামকরণের ইতিহাস : কাহিনি, কিংবদন্তি ॥ প্রতিষ্ঠাকাল ও বর্তমান প্রশাসনিক ইউনিট ॥ ভৌগোলিক অবস্থান ও ভূপ্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য ॥ বনভূমি, গাছপালা, বনজ ও ফলদ ওষধি বৃক্ষ, নদীনালা, খালবিল-হাওর ॥ মৃত্তিকার ধরন ॥ প্রধান পশুপাখি ও অন্যান্য বন্য জীবজন্তু ॥ জনবসতির পরিচয় (জনসংখ্যা, ধর্মগত পরিচয়), জাতি পরিচয় (হাড়ি, ডোম, ভুঁইমালি, নাগারচি, কৈবর্ত ইত্যাদি) ॥ নারী-পুরুষের হার ॥ তরুণ ও প্রবীণের হার ॥ শিক্ষার হার ॥ নৃগোষ্ঠী পরিচয় (যদি থাকে), গৌণ বা লোকধর্ম পরিচয়॥ চাষাবাদ ও ফসল (উৎপাদন বৈশিষ্ট্য, লাঙল, জোয়াল, ট্রাক্টর ইত্যাদি) ॥ শিল্প-কারখানা॥ ব্যবসা-বাণিজ্য ॥ যাতায়াত-যোগাযোগ (যানবাহন : নৌকা, জাহাজ, লঞ্চ, খেয়া, গরুর গাড়ি, ঘোড়ার গাড়ি, মোষের গাড়ি, পালকি, মাওফা, নসিমন, করিমন, ভ্যানগাড়ি, বাস, ট্রেন ইত্যাদি) ॥ খাদ্যাভ্যাস ॥ পোশাক-পরিচ্ছদ ॥ পেশাগত পরিচয় ॥ বিনোদন ব্যবস্থা : গ্রামীণ ও লোকজ, নাগরিক ও আধুনিক (সিনেমা হলসহ) ॥ হাটবাজার, বড় দিঘি, পুষ্করিণী, মেলা, ওরস, বটতলা ইত্যাদি ॥ মাজার, মসজিদ, মন্দির, গির্জা, বৌদ্ধ মন্দির, চণ্ডীমণ্ডপ, আখড়া, সাধন-কেন্দ্র ইত্যাদি। (৩০-৪০ পৃষ্ঠা)

২. বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের লোকজ সংস্কৃতির বিষয়সমূহ : আপনার জেলার জন্য যা প্রয়োজন তা নিয়েই ফিল্ডওয়ার্ক করবেন।

জেলার সাংস্কৃতিক ইতিহাস : ঐতিহাসিক স্থান ও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন। গ্রামের নামকরণ (যদি পাওয়া যায়)। সাবেক কালের বিখ্যাত গায়ক, শিল্পী, কবিয়াল (master artist)-এর সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও ছবি (যদি পাওয়া যায়) কিচ্ছা, পুথিপাঠ, কবিগান (বহু জেলা), মহুয়া, মলুয়া, রূপবান, সাবেক কালের পালাগান, যেমন : গুণাই যাত্রা, রয়ানি (পটুয়াখালী, বরিশাল), ভাওয়াল যাত্রা (গাজীপুর, মানিকগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ ও অন্যান্য অঞ্চল), খ্রিষ্টের পালা (গাজীপুর), মালকা বানুর পালা, আমিনা সুন্দরীর পালা (চট্টগ্রাম), আলাল-দুলাল, আসমান সিং (ঢাকা ও ঢাকার আশপাশের জেলা), বেহুলা, রামযাত্রা, রামলীলা, কৃষ্ণলীলা (বহু জেলা), বনবিবির পালা, মাইচাম্পা (সাতক্ষীরা, খুলনা), কুশানগান (রংপুর), বাউলগান (কুষ্টিয়া, নেত্রকোনা ও অন্যান্য জেলা), কীর্তন (বহু জেলা), আলকাপগান, গম্ভীরা (চাঁপাই নবাবগঞ্জ), ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া (কুড়িগ্রাম, রংপুর), মলয়া সংগীত (ব্রাহ্মণবাড়িয়া), মুর্শিদি, মারফতি (ঢাকা, ফরিদপুর), গাজির গান (চুকনগর, খুলনা, গাজীপুর ও অন্যান্য জেলা), বিয়ের গান, অষ্টগান, পাগলা কানাইয়ের গান (ঝিনাইদহ), বিচারগান, হাবুগান (মানিকগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ), ধান কাটার গান (সন্দ্বীপ), ভাবগান, ফলইগান (যশোর), হাছন রাজার গান (সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার, বালাগঞ্জ, সিলেট), শাহ আবদুল করিম ও রাধারমণের গান

(সুনামগঞ্জ), মর্মসংগীত, ধুয়াগান (বিভিন্ন জেলা) ইত্যাদি; লোকনৃত্য, কালীকাচ নৃত্য (পূর্বদাগুরা, গড়পাড়া, মানিকগঞ্জ ও টাঙ্গাইল), ধামাইল (সুনামগঞ্জ, নেত্রকোনা), মণিপুরী নৃত্য (মৌলভীবাজার), পুতুলনাচ (ব্রাহ্মণবাড়িয়া), পাঁচালি (বিভিন্ন জেলা), লম্বা কিচ্ছা (নেত্রকোনা), নাগারচি সম্প্রদায় (ব্রাহ্মণবাড়িয়া, বরিশাল), অনুকূল ঠাকুর (পাবনা), মতুয়া (গোপালগঞ্জ) ইত্যাদি; মাজারকেন্দ্রিক অনুষ্ঠান মাইজভাণ্ডার, বায়েজিদ বোস্তামী (চট্টগ্রাম), হজরত শাহজালাল (সিলেট), শাহ আলী (মিরপুর), মহররমের মিছিল (ঢাকা, সৈয়দপুর, গড়পাড়া, মানিকগঞ্জ), আটপাড়া, নেত্রকোনা, মানিক পির (সাতক্ষীরা) ইত্যাদি; মনসা মন্দির (শরিয়তপুর), আদিনাথের মন্দির (মহেশখালী, কক্সবাজার), রথযাত্রা (ধামরাই ও মানিকগঞ্জ, জয়দেবপুর) ইত্যাদি; লাঠিখেলা (কিশোরগঞ্জ, নড়াইল, কুষ্টিয়া, ফরিদপুর); শব্দকর সম্প্রদায় (কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার, সিলেট), বাওয়ালি সম্প্রদায় (সুন্দরবন), রবিদাস-বলাহাড়ি সম্প্রদায় (মেহেরপুর); লোকমেলা, নেকমরদের মেলা (ঠাকুরগাঁ), সিদ্ধাবাড়ির মেলা (সাহরাইল, সিংগাইর, মানিকগঞ্জ), গুড়পুকুরের মেলা (সাতক্ষীরা), মহামুনি বৌদ্ধমেলা (চট্টগ্রাম), বউমেলা (মহিষাবান, বগুড়া), মাছমেলা (পোড়াদহ, বগুড়া), সার্কাস (বিভিন্ন জেলা) ইত্যাদি; লোকশিল্প, কাঠের ঘোড়া (সোনারগাঁ), শোলার কাজ (মাগুরা, যশোর), নকশিপিঠা (ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ, চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা), নকশিকাঁথা (যশোর, ফরিদপুর, জামালপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ), জামদানি (রূপসি, নারায়ণগঞ্জ), টাঙ্গাইল শাড়ি, বাবুরহাটের শাড়ি, পূজার মূর্তি (রায়ের বাজার, শাঁখারিবাজার, ঢাকা, নেত্রকোনা), বাঁশ-বেতের কাজ (সিলেট), পট/পটচিত্র (মুন্সিগঞ্জ), মৃৎশিল্প (রায়ের বাজার, ঢাকা, কাগজিপাড়া, কাকড়ান-সাভার, শাঁখারিবাজার ঢাকা, হাটহাজারী চট্টগ্রাম), তামা-কাঁসা-পিতল (ধামরাই, ঢাকা, চাঁপাই নবাবগঞ্জ, ইসলামপুর, জামালপুর, তাঁতিবাজার, ঢাকা), শীতলপাটি (বড়লেখা), বটনি, জায়নামাজ (লেমুয়া, ফেনী) ইত্যাদি; হাটবাজার, ঘরবাড়ির ধরন, বিবাহের প্যান্ডেল (সজ্জিত গেট), বিয়ের আসর, পার্বত্য ও অন্যান অঞ্চল। রাউজানের অনন্ত সানাইওয়ালা, বিনয় বাঁশি, ফণী বড়ুয়া, রমেশ শীল, (চট্টগ্রাম), নারীদের অনুষ্ঠান যেখানে পুরুষের প্রবেশাধিকার নেই এমন অঞ্চল ও অনুষ্ঠান।

নৌকা নির্মাণ : (লক্ষ্মীপুর), জাহাজ নির্মাণ : (জিনজিরা, ঢাকা)।

লোকউৎসব : নবান্ন, হালখাতা, নববর্ষ, ঈদোৎসব, দুর্গাপূজার উৎসব ও মেলা, বৌদ্ধ পূর্ণিমা, জন্মাষ্টমী, শবেবরাত, মানিক পির উৎসব (সাতক্ষীরা), ইলিশ উৎসব (চাঁদপুর), আঞ্চলিক রাসের মেলা, রাস মেলা (দুবলার চর, সুন্দরবন, ঠাকুরগাঁ, রংপুর), গাজন (কোনো উৎসব যদি থাকে), বাঘাইর শিরনি (নেত্রকোনা), বৃক্ষপূজা, বাওয়ালিদের কথা, গোলপাতা ও মধু সংগ্রহের কথা (সুন্দরবন), শিবরাত্রি (বিভিন্ন জেলা)।

লোকখাদ্য : মিষ্টি : মালাইকারী, মুক্তাগাছার মণ্ডা (ময়মনসিংহ), পোড়াবাড়ির চমচম (টাঙ্গাইল), রসমালাই (কুমিল্লা), প্যাড়া (রাজশাহি), কাঁচাগোল্লা (নাটোর), বালিশ মিষ্টি (নেত্রকোনা), ছানামুখী-লেডিকেনি (ব্রাহ্মণবাড়িয়া), মহারাজপুরের দই (মোকসেদপুর, ফরিদপুর), মহিষের দই (ভোলা), দই (গৌরনদী-বরিশাল, বগুড়া), তিলের খাজা, রসকদম্ব (রাজশাহি), তিলের খাজা (কুষ্টিয়া), চমচম (রাজবাড়ী), রসগোল্লা (জামতলী,

যশোর), মালাইকারি (ময়মনসিংহ), পানতোয়া, খেজুর গুড়ের সন্দেশ (শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ), ফকিরের ছানা সন্দেশ (সাতক্ষীরা), বরিশালের উজিরপুর উপজেলার গুঠিয়ার সন্দেশ ; হাজারি গুড় (ঝিটকা, মানিকগঞ্জ), নড়াইলের কার্তিক কুণ্ডুর মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের ক্ষীরের চমচম, সন্দেশ, নড়াইল ; বরিশালের মেহেন্দিগঞ্জের ঘোল এবং অন্যান্য জেলার বিখ্যাত মিষ্টি।

করণক্রিয়া (folk ritual) : মানত, শিরনি, ভাদু, ব্রত, টুসু, চড়ক উৎসব, কুশপুত্তলিকা দাহ, বেড়াভাসান, জামাইষষ্ঠী, বরণকুলা, গায়েহলুদ, বধূবরণ, সাতশা (baby shower), ভোগ।

লোকক্রীড়া : কানামাছি, দাড়িয়াবান্ধা, গোল্লাছুট, হাডুডু, বউছি, নৌকাবাইচ, গরুর দৌড়, মোরগের লড়াই, ঘুড়ি ওড়ানো ও অন্যান্য।

লোকচিত্রকলা : গাজির পট, লক্ষ্মীর সরা, কাঠখোদাই, মন্দির-মসজিদ চিত্রণ, বিয়ের কুলা, দেয়াল চিত্রণ (১ বৈশাখ, চারুকলা অনুষদ, ঢা.বি) বিয়ের গেট, টিনের ঘরের বারান্দার গেটের ওপরের দিকে ড্রপওয়াল (মানিকগঞ্জ, নেত্রকোনা)।

শোভাযাত্রা : সিদ্ধাবাড়ীর শোভাযাত্রা (সিংগাইর, মানিকগঞ্জ), মহররমের তাজিয়া মিছিল (গড়পাড়া, মানিকগঞ্জ, ঢাকা)।

লোকপুরাণ ও কিংবদন্তি : বিভিন্ন জেলা।

লোকজ খেলনা : বিভিন্ন জেলা।

লোকচিকিৎসা : ওঝা, গুণিন (পটুয়াখালী, বরিশাল)।

গুহ্যসাধনা/তন্ত্রসাধনা/ (mystic cult) : দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলা।

মন্ত্র/কায়া-সাধনা/হঠযোগ : যেখানে আছে। আপনার এলাকায় নতুন কোনো উপাদান থাকলে তা যোগ করে নিন। গ্রাম দেবতা, বৃক্ষপূজা, লৌকিক দেবতা ও পির (বিভিন্ন অঞ্চলে)। (৭০-১০০ পৃষ্ঠা)

৩. উপাদানের বিন্যাস : একই উপাদান (যেমন নকশিকাঁথা, নকশিপিঠা, পিঠাপুলি, মিষ্টি ইত্যাদি) জেলার বিভিন্ন স্থানে থাকলে উপজেলাভিত্তিক দেখাতে হবে। (১০-২০ পৃষ্ঠা)

৪. তথ্যদাতাদের (contact person) জীবনকথা। (১০-২০ পৃষ্ঠা)

৫. ছবি। (১০-২০ পৃষ্ঠা)

৬. সাক্ষাৎকারের সময়, তারিখ ও স্থান।

মাঠকর্মে প্রতি বিষয় (genre) যেসমস্ত উপাদান নিয়ে বিন্যস্ত হবে। যথা :

১. লোকসাহিত্য, কিচ্ছা, কাহিনি, কিংবদন্তি, লোকপুরাণ, পথুয়া সাহিত্য (একই পরিচ্ছেদে)। ২. ধাঁধা, প্রবাদ, প্রবচন ও শুলুক। ৩. লোকসংগীত (folk song) : লোকগীতি : ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া, মারফতি, মুর্শিদি, গাজির গান, লালন, রাধারমণ, হাছন, পল্লিগীতি, পাগলা কানাই, রামলীলা, কৃষ্ণলীলা ও অন্যান্য। ৪. গীতিকা (ballad)। ৫. গ্রামনাম। ৬. উৎসব : মেলা/শবেবরাত। ৭. করণক্রিয়া (ritual)। ৮. লোকনাট্য ও নৃত্য (চিত্রে দেখান)। ৯. লোকচিকিৎসা। ১০. লোকচিত্রকলা (লক্ষ্মীর সরা, শখের হাঁড়ি)। ১১. লোকশিল্প : নকশিকাঁথা, তামাপিতল, বাঁশ-বেতের কাজ, শোলার কাজ, মৃৎশিল্প ও মসজিদের চিত্র, আলপনা। ১২. লোকবিশ্বাস ও সংস্কার। ১৩. লোকপ্রযুক্তি : মাছধরার যন্ত্র, হালচাষের যন্ত্রাদি, কামার-কুমারদের কাজ, তাঁতের যন্ত্রপাতি। ১৪. খাদ্যশিল্প/ ভেষজ-ইউনানি চিকিৎসা

পদ্ধতি। ১৫. মাজার ওরস, পির। ১৬. আদিবাসী ফোকলোর। ১৭. নারীদের ফোকলোর। ১৮. হাটবাজার, পুকুর। ১৯. বটতলা, চণ্ডীমণ্ডপ, গ্রাম-বাংলার চায়ের দোকান। ২০. আঞ্চলিক ইতিহাস। ২১. তন্ত্র ও গুহ্য সাধনা। ২২. পোশাক-পরিচ্ছদ। ২৩. মেজবান (চট্টগ্রাম), কুলখানি/ফয়তা/জিয়াফত/চল্লিশা, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া।

মাঠকর্মে অন্য যেসব বিষয় থাকবে না

১. জেলার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস।

২. জীবিত রাজনীতিকদের পরিচয় ও জীবনকথা।

৩. এলাকার কবি-সাহিত্যিকদের জীবনকথা ও তাদের বইপুস্তকের নাম।

সংগ্রহ কাজের শেষ পর্যায়ে যখন সংগ্রাহক এবং সমন্বয়কারীবৃন্দ সংকলন কাজ শুরু করেন তখন কাজটি কীভাবে সম্পন্ন করতে হবে তার জন্য একটি চূড়ান্ত নির্দেশনাপত্র প্রদান করা হয়।

প্রথম অধ্যায় : জেলা পরিচিতি (introduction of the district)

ক. নামকরণ ও প্রতিষ্ঠাকাল, খ. ভৌগোলিক অবস্থান, গ. বনভূমি ও গাছপালা, ঘ. সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, ঙ. জনবসতির পরিচয়, চ. নদনদী ও খালবিল, ছ. গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, জ. ঐতিহাসিক স্থাপনা, ঝ. রাজনৈতিক ঐতিহ্য ও ব্যক্তি, ঞ. বিখ্যাত গায়ক, শিল্পী ও কবিয়ালের সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

দ্বিতীয় অধ্যায় : লোকসাহিত্য (folk literature/folk narrative)

ক. লোকগল্প/কাহিনি/কিস্‌সা (folk tale), খ. কিংবদন্তি (legend), গ. লোকপুরাণ (myth), ঘ. কবিগান, ঙ. লোকছড়া, চ. লোককবিতা, ছ. ভাট কবিতা, জ. পুথিসাহিত্য ও পুথি পাঠ।

তৃতীয় অধ্যায় : বস্তুগত লোকসংস্কৃতি (material culture)

ক. লোকশিল্প (folk art) : লক্ষ্মীর সরা, নকশিকাঁথা, মৃৎশিল্প, খেলনা, বাঁশ-বেতশিল্প, নকশিপাটি, নকশিশিকা, হাতপাখা, খ. লোকজ পোশাক-পরিচ্ছদ ও গহনা (folk costume & folk ornaments), গ. লোকবাদ্যযন্ত্র (folk instruments), ঘ. লোকস্থাপত্য (folk architecture)।

চতুর্থ অধ্যায় : লোকসংগীত (folk song) ও গাথা (ballad)

ক. লোকসংগীত : ১. মাজারের গান, ২. উড়িগান, ৩. কর্মসংগীত, ৪. গাইনের গীত, ৫. মেয়েলি গীত, ৬. ভাটিয়ালি। খ. গাথা/গীতিকা (ballad)

পঞ্চম অধ্যায় : লোকউৎসব (folk festival)

১. নববর্ষ বা বৈশাখি উৎসব, ২. ঈদ উৎসব, ৩. শারদীয় দুর্গোৎসব, ৪. অষ্টমী স্নান ও মেলা, ৫. রথযাত্রা ও রথমেলা, ৬. ওরস ও মেলা, ৭. আশুরা, ৮. চৈত্রসংক্রান্তির মেলা ও চড়কপূজা, ৯. বৈসাবি (বৈসুক-ত্রিপুরী, সাংরাইন-মারমা ও রাখাইন এবং বিজু-চাকমা), ১০. মারমা ও গারোদের ওয়ানগালা উৎসব, ১১. হাজংদের বাস্তুপূজা, ১২. থুবাপূজা, ১৩. মান্দিদের বিয়ে, ১৪. গুপ্তবৃন্দাবন : লোকমেলা, ১৫. অন্নপ্রাশন, ১৬. খৎনা বা মুসলমানি, ১৭. সাধভক্ষণ, ১৮. সিমন্তোন্নয়ন, ১৯. ষষ্ঠী, ২০. আকিকা, ২১. শিশুর জন্মের পর আজান বা শঙ্খধ্বনি, ২২. শিশুকে খির খাওয়ানো, ২৩. মানসিক

(মানত), ২৪. গরুন্নাতের শির্নি, ২৫. ছড়ি (ষটি/ষষ্ঠী), ২৬. গায়েহলুদ, ২৭. সদরভাতা, ২৮. মঙ্গলাচরণ, ২৯. বউবরণ, ৩০. ভাত-কাপড়, ৩১. বউভাত, ৩২. রাখাল বন্ধুদের উৎসব।

ষষ্ঠ অধ্যায় : লোকনাট্য (folk theatre) ও লোকনৃত্য (folk dance)

ক. লোকনাট্য : ১. যাত্রা, ২. পালাগান, ৩. আলকাপ গান, ৪. সংযাত্রা। খ. লোকনৃত্য।

সপ্তম অধ্যায় : লোকক্রীড়া (folk games)

১. বলাই, ২. তই তই, ৩. রস-কস-সিঙ্গারা, বুলবুলি খেলা, ৪. লাঠিখেলা, ৫. হুমগুটি/গুটি খেলা, ৬. হাডুডু খেলা, ৭. ঘুড়ি ওড়ানো, ৮. ডাংগুলি খেলা, ৯. নৌকাবাইচ, ১০. ষাঁড়ের লড়াই, ১১. দাড়িয়াবান্ধা খেলা, ১২. গোল্লাছুট খেলা, ১৩. অন্যান্য লোকক্রীড়া।

অষ্টম অধ্যায় : লোকপেশাজীবী গ্রুপ (folk groups)

১. মিস্ত্রি/সুতার, ২. কলু, ৩. তাঁতি, ৪. জেলে, ৫. কামার, ৬. ঘরামি, ৭. সৈয়াল, ৮. বাউয়ালি প্রভৃতি।

নবম অধ্যায় : লোকচিকিৎসা (folk medicine) ও তন্ত্রমন্ত্র (chant)

ক. লোকচিকিৎসা : ১. কলতার ঝাড়া, ২. সাপে কাটার ঝাড়া, ৩. অন্যান্য কবিরাজি চিকিৎসা। খ. তন্ত্রমন্ত্র।

দশম অধ্যায় : ধাঁধা (riddle)

একাদশ অধ্যায় : প্রবাদ-প্রবচন (folk sayings & proverb)

দ্বাদশ অধ্যায় : লোকখাদ্য

১. পিঠা, ফিরনি, কদমা, মিষ্টি, ইত্যাদি

ত্রয়োদশ অধ্যায় : লোকবিশ্বাস (folk belief) ও লোকসংস্কার (folk superstition)

চতুর্দশ অধ্যায় : লোকপ্রযুক্তি (folk technology)

১. মাছ ধরার উইন্যা/বাইর/ঝাঁকা/চাঁই/দুয়ারী, ২. সরিষা ভাঙার ঘানিগাছ, ৩. কাপড় বোনার তাঁত, ৪. জাঁতি বা সরতা, ৫. ইঁদুর মারার কল ইত্যাদি।

এরপর সংগ্রাহক ও সমন্বয়কারীরা মিলিতভাবে তাদের সংকলন কাজ শেষ করে পাণ্ডুলিপি প্রকাশের জন্য বাংলা একাডেমির সচিব এবং প্রকল্প-পরিচালক জনাব মো. আলতাফ হোসেনের হাতে তুলে দেন। এই কাজে সামগ্রিক তত্ত্বাবধান, সমন্বয় সাধন এবং অনবরত তাগাদা ও নির্দেশনার মাধ্যমে সমন্বয়কারীদের কাছ থেকে সময়মতো পাণ্ডুলিপি আদায় করার জন্য তাকে যে নিষ্ঠা, অভিনিবেশ ও দক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করতে হয় তার জন্য তাকে অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানাই। সারাদেশ থেকে যে-বিপুল তথ্যসমৃদ্ধ ৬৪-খানি পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে তা আমাদের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের এক গৌরবময় অধ্যায়। ইতিপূর্বে এত বিস্তৃতভাবে সারাদেশের লোকজ সংস্কৃতির ইতিহাস এতটা অনুপুঙ্খতায় মাঠপর্যায় থেকে আর সম্পন্ন করা হয়নি। এই কাজের সঙ্গে যুক্ত সংগ্রাহক, সংকলক ও প্রধান সমন্বয়কারী, বাংলা একাডেমির পরিচালক, প্রধান গ্রন্থাগারিক, ফোকলোর উপবিভাগের উপপরিচালক জনাব আমিনুর রহমান সুলতান,

সহকারী সম্পাদক ইসরাত জাহান পপী এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি আরেকবার ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

লোকজ সংস্কৃতি বিষয়ক দেশব্যাপী বিস্তৃত এই তথ্যসমৃদ্ধ উপাদান নিয়ে আমরা প্রকাশ করছি *বাংলা একাডেমি বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা*। বাংলাদেশের ফোকলোর চর্চার ক্ষেত্রে এখন পর্যন্ত বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনা না হওয়ায় প্রাথমিক পর্যায়ের যে-কাজ—Genre চিহ্নিতকরণ ও তার বিশ্লেষণ করা হয়নি। 'লোকসাহিত্য' বলেই ফোকলোরের সব উপাদানকে চালিয়ে দেওয়ার একটি ধরতাই প্রবণতা দেখা যায়। সেই অবস্থা থেকে আমরা Genre চিহ্নিতকরণ ও বিশ্লেষণের (genre identification and analysis) মাধ্যমে বাংলাদেশের ফোকলোরের প্রাথমিক বিজ্ঞানভিত্তিক গবেষণার পদ্ধতিটি নিশ্চিত করে পরবর্তীকালে অন্যান্য স্তর যথাক্রমে পটভূমি (context), পরিবেশনা (performance) ইত্যাদি প্যারাডাইম অনুসরণ করার মাধ্যমে ফোকলোর আলোচনাকে পরিপূর্ণভাবে বিজ্ঞানভিত্তিকতার উপর দাঁড় করাতে চাই।

গ্রন্থমালার এই খণ্ডে বর্তমান বান্দরবান জেলার লোকজ সংস্কৃতির বিশদ পরিচয় তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। এখানে বান্দরবানের সমৃদ্ধ ফোকলোর উপাদানসমূহকে Genre ভিত্তিকভাবে সাজানো হয়েছে।

শামসুজ্জামান খান
মহাপরিচালক

সূচিপত্র

জেলা পরিচিতি

ক. নামকরণ ও প্রতিষ্ঠা

বান্দরবান পার্বত্য জেলা বাংলাদেশের এক অপরূপ ভূখণ্ড। প্রাকৃতিক রম্যতা যেমন এ ভূখণ্ডকে বিশিষ্টতা দিয়েছে, তেমনি এ অঞ্চলে বসবাসরত জনবৈচিত্র্যও যে কোনো আগ্রহীজনের মনোযোগের বিষয় হয়ে উঠতে সক্ষম। বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বকোণে অবস্থিত এই জেলা একটি নৈসর্গিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি। বান্দরবান দেশের একটি অন্যতম পর্বতময় জেলা। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও জনবৈচিত্র্য এ জেলাকে দেশের অন্যান্য অঞ্চল থেকে আলাদা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছে। এই জেলায় পার্বত্য চট্টগ্রামে এগারোর অধিক ক্ষুদ্র জাতিসত্তার সব ক'টিরই বসবাস রয়েছে। এই পর্বতময় অঞ্চলকে ঘিরে বাস করছে ভিন্ন ভাষাভাষীর বিভিন্ন আদিবাসী মানুষ। রয়েছে তাদের নানামুখী সাংস্কৃতিক জীবন। আদিবাসীদের বৈচিত্র্যময় জীবনধারা ও বৈচিত্র্যময় নান্দনিক সংস্কৃতি দেশের মূলধারার সংস্কৃতিতে একটি অনুপম সংযোজন। বান্দরবানের সংস্কৃতি এ অঞ্চলের মাটি ও আবহাওয়ায় বেড়ে ওঠা মানুষগুলোর জীবনযাপনের নির্যাসে তৈরি। এ জনপদের জীবনধারায় যেমন রয়েছে বৈচিত্র্য ও সৌন্দর্য, তেমনি এখানেই রয়েছে প্রাকৃতিক সম্পদের বিপুল সমাবেশ। বলতে গেলে প্রাকৃতিক সম্পদের বৈচিত্র্যময় উপস্থিতিই এখানকার সংস্কৃতি ও জীবনধারাকে বৈচিত্র্যময় করেছে।

বান্দরবান জেলার নামকরণ নিয়ে একটি কিংবদন্তি রয়েছে। এই এলাকায় একসময় অসংখ্য বানরের বসবাস ছিল। এই বানরগুলো প্রতিনিয়ত শহরের প্রবেশ মুখে ছড়ার পাড়ে পাহাড় হতে সৃষ্ট প্রস্রবণের লবণাক্ত পানি খেতে আসত। এক সময় অনবরত বৃষ্টির কারণে ছড়ার পানি বৃদ্ধি পাওয়ায় বানরের দল ছড়া পার হয়ে যেতে না পারায় একে অপরকে ধরে সারিবদ্ধভাবে ছড়া পার হয়। তখন সারিবদ্ধ বানরের পারাপারের দৃশ্য যেনো ছড়ার মধ্যে বাঁধের মতো মনে হতো। বানরের ছড়া পারাপারের এই দৃশ্য দেখতো এই জনপদের মানুষ। তখন থেকেই এই জায়গাটি 'ম্যাকছিঃ' ছড়া নামে পরিচিতি লাভ করে। মারমা ভাষায় 'ম্যাক' অর্থ বানর, আর 'ছিঃ' অর্থ বাঁধ। কালের পরিক্রমায় বাংলা ভাষাভাষীদের সাধারণ উচ্চারণে এই এলাকা বান্দরবান হিসেবে পরিচিতি লাভ করে।

বান্দরবান শহরকে নিয়ে এ অঞ্চলের মানুষের কাছে একটি পৌরাণিক কাহিনিও রয়েছে। ভারতের অযোধ্যা রাজ্যের রাজকুমার রাম গৃহত্যাগ করলে তিনি এতদঞ্চলে অবস্থান করেন। তার সাথে তার প্রিয় সঙ্গিনী সীতা ও ছোটো ভাই লক্ষ্মণও বনবাসে চলে আসেন। একদিন লঙ্কাধিপতি রাবণের সাথে রাম-লক্ষ্মণের প্রচণ্ড যুদ্ধ বাঁধে। এতে লক্ষ্মণ রাবণের তীরাঘাতে গুরুতর আহত হন। তখন শ্বসেন নামে এক বৈদ্য গণনা করে দেখলেন সূর্য ডুবলে নাকি লক্ষ্মণ প্রাণত্যাগ করবেন। তাই তাঁর জীবনরক্ষার জন্য
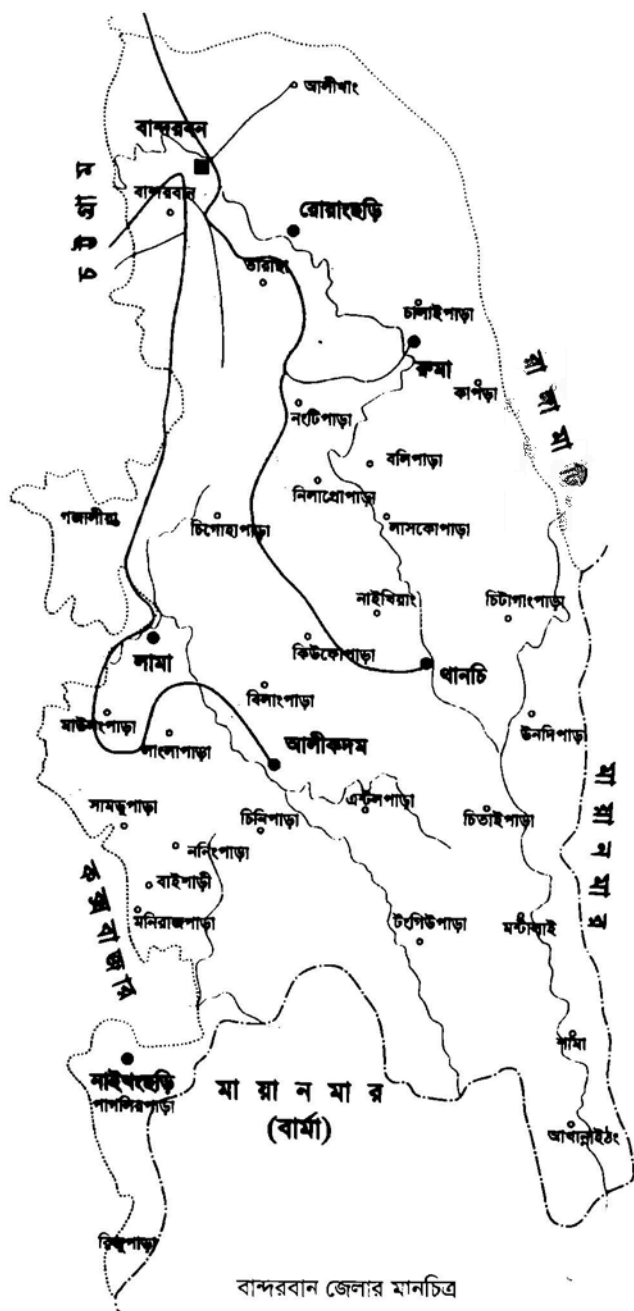
বান্দরবান জেলার মানচিত্র

অতিশীঘ্রই জীবনবৃক্ষের রস প্রয়োজন। জীবনবৃক্ষের রস লক্ষ্মণের নাকে দিলে তিনি পুনরায় জীবন ফিরে পাবেন। এসময় রামের বিশ্বস্ত এক সহায়তাকারী হনুমান লক্ষ্মণকে পুনর্জীবিত করার জন্য জীবনবৃক্ষের সন্ধানে মৈনাক পাহাড়ে ছুটে যায়। সেই পাহাড়ে ছিল এক ছলনাময়ী রাক্ষসী। সেই রাক্ষসী তার জাদুর মায়ায় জীবনবৃক্ষকে লুকিয়ে রাখে। হনুমান বারবার চেষ্টা করেও সেই জীবনবৃক্ষকে সনাক্ত করতে পারেনি। অপরদিকে সূর্য ডুবলেই লক্ষ্মণের নির্ঘাত মৃত্যু! তাই কোনো উপায় না দেখে হনুমান সমস্ত পাহাড়কে উপড়ে নিয়ে আকাশ পথে পবনবেগে ছুটে যায়। এমন সময় হনুমানের হাতের ফাঁক থেকে সামান্য মাটির খণ্ড নীচে পড়ে যায়। এতে একটি সুন্দর উপত্যকার সৃষ্টি হয়। এই উপত্যকাটির নাম বর্তমানে বান্দরবান শহর।

পার্বত্য চট্টগ্রাম ব্রিটিশ সরকারের অধীনে চলে গেলে চট্টগ্রাম ও পার্বত্য অঞ্চলের রাজস্ব আদায়ের সুবিধার্থে বোমাংগ্রী কংহ্লাপ্রু ১৭১০ খ্রিষ্টাব্দে বান্দরবান শহরের অনতিদূরে সুয়ালক নদীর তীরে কাঠের রাজবাড়ি নির্মাণ করে বসতি স্থাপন করেন। পরবর্তীকালে ১৮২২ খ্রিষ্টাব্দে বোমাং রাজা সা থাং প্রু-এর আমলে সাথাংপ্রু 'ক্যক্চিং ম্রোহ' অর্থাৎ বর্তমান বান্দরবানে বোমাং সার্কেলের রাজধানী স্থানান্তর করেন। ১৯০০ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম রেগুলেশন অ্যাক্ট প্রণয়নের পর পার্বত্য চট্টগ্রামকে মং সার্কেল, চাকমা সার্কেল ও বোমাং সার্কেল এই তিনটি সার্কেলে বিভক্ত করা হলে বান্দরবান জেলাটি বোমাং সার্কেলের আওতাভুক্ত হয়। এই রিগুলেশন অনুসারে বোমাং সার্কেল চিফকে খাজনা আদায় এবং এলাকার শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব প্রদান করা হয়। বোমাং রাজার রাজধানীকে বলা হতো 'ক্যক্চিং ম্রোহ্'। এরপর 'রোয়াদ ম্রোহ্', বর্তমানে বান্দরবান।

১৮৬০ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামকে জেলা ঘোষণা করা হয়। তৎকালীন সময়ে বান্দরবান পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার অধীনে ছিল। ক্যাপ্টেন মাগ্রেথ ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার প্রথম সুপারিনট্যান্ডেন্ট। ১৯৫১ সালে এ জেলা মহকুমা হিসেবে প্রশাসনিক কার্যক্রম শুরু করে এবং পরবর্তীকালে বান্দরবান ১৯৮১ সালের ১৮ই এপ্রিল ৭টি উপজেলা সমন্বয়ে বান্দরবান পার্বত্য জেলা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

খ. উপজেলার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

১. বান্দরবান সদর উপজেলা

উপজেলার গোড়াপত্তন

বান্দরবান সদর উপজেলা ১৯২৩ সালে থানা হিসেবে স্থাপিত হয়। আর ১৯৮৩ সালে উপজেলাতে উন্নীত হয়।

আয়তন ও সীমানা

আয়তন ৫০১.৯৯ বর্গকিলোমিটার। এর উত্তরে রাঙ্গামাটি জেলার রাজস্থলী উপজেলা, দক্ষিণে লামা, পূর্বে রোয়াংছড়ি এবং রুমা, পশ্চিমে চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়া, চন্দনাইশ, সাতকানিয়া, এবং লোহাগাড়া উপজেলা অবস্থিত।

ইউনিয়নের সংখ্যা : ৫টি। যথা : ১. বান্দরবান সদর, ২. সুয়ালক, ৩. টংকাবতী, ৪. কুহালং ও ৫. রাজবিলা ইউনিয়ন।

পৌরসভা : ১টি

মৌজার সংখ্যা : মোট ১৬টি।

মোট লোকসংখ্যা : ৮৮,২৮২ জন। তারমধ্যে পুরুষ ৪৭,৬৮৭ জন ও নারী ৪০,৫৯৫ জন।

জাতিসত্তার নাম : মারমা, ম্রো, বম, লুসাই, ত্রিপুরা, চাকমা, খিয়াং ও বাঙালি ।

প্রধান প্রধান হাট-বাজারের নাম : ১. বান্দরবান বাজার, ২. বালাঘাটা বাজার, ৩. সুয়ালক বাজার।

গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা

(১) কলেজ : ৪টি

(২) মাধ্যমিক বিদ্যালয় : ১৫টি

নদ-নদী : সাঙ্গু নদী

প্রধান প্রধান অর্থকরী ফসল : তামাক, চিনাবাদাম, কমলা, আনারস, আম, কলা, পেঁপে, তুলা, আদা, হলুদ, কচু, কলাই, শিম, বরবটি ইত্যাদি।

২. আলীকদম উপজেলা

উপজেলার গোড়াপত্তন

আলীকদম ১৯৭৬ সালে থানা হিসেবে প্রশাসনিক কার্যক্রম শুরু করে। প্রশাসনিক বিকেন্দ্রিকরণ কর্মসূচির আওতায় ১৯৮২ সালের ৭ নভেম্বর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের থানা প্রশাসন পুনর্বিন্যাস অধ্যাদেশ ১৯৮২ মতে আলীকদমকে 'মনোনীত থানা' ঘোষণা দেওয়া হয়। ২টি ইউনিয়ন ও ৬টি মৌজা নিয়ে আলীকদম ১৯৮৩ সালে 'থানা' থেকে উপজেলাতে উন্নীত হয়। আলীকদমের সদর দপ্তর সমতলে অবস্থিত হলেও তার চারপাশে রয়েছে নিসর্গ পর্বতরাজি আর গিরিতরঙ্গীনি মাতামুহুরী নদী।

আয়তন ও সীমানা

আলীকদম এর আয়তন ৮৮৫.৭৮ বর্গকিলোমিটার। উত্তরে লামা উপজেলা, দক্ষিণে মায়ানমারের আরাকান পর্বতমালা, পূর্বে থানছি উপজেলা ও পশ্চিমে নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলা। এককালে আলীকদম লামা মহকুমার অন্তর্ভুক্ত ছিলো।

ইউনিয়নের সংখ্যা : ২টি। আলীকদম ও চৈক্ষ্যং ইউনিয়ন।

মৌজার সংখ্যা : ৬টি

মোট লোকসংখ্যা : ৫৯,৩১৭ জন। তারমধ্যে পুরুষ ২৫,৬৫০ জন ও নারী ২৩,৬৬৭ জন।

জাতিসত্তার নাম : মারমা, ম্রো, ত্রিপুরা, তঞ্চঙ্গ্যা, চাকমা ও বাঙালি ।

প্রধান প্রধান হাট-বাজারের নাম : ১. আলীকদম বাজার, ২. রেফার ফারি বাজার, ৩. পান বাজার, ৪. কুরুক পাতা বাজার, ৫. পোয়ামুহুরী বাজার।

গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা

(১) কলেজ : নাই

(২) মাধ্যমিক বিদ্যালয় : ৫টি

নদ-নদী : মাতামুহুরী নদী ও তৈন খাল।

প্রধান প্রধান অর্থকরী ফসল : তামাক, চিনাবাদাম, কলা, পেঁপে, তুলা, আদা, হলুদ, কচু, কলাই, শিম, বরবটি ইত্যাদি।

৩. লামা উপজেলা

উপজেলার গোড়াপত্তন

লামা ১৯২৩ সালে থানা হিসেবে প্রশাসনিক কার্যক্রম শুরু করে। প্রশাসনিক বিকেন্দ্রিকরণ কর্মসূচির আওতায় ১৯৮২ সালের ৭ নভেম্বর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের থানা প্রশাসন পুনর্বিন্যাস অধ্যাদেশ ১৯৮২ আদেশ বলে লামাকে "মনোনীত থানা" ঘোষণা দেওয়া হয় এবং ১৯৮৫ সালে থানা থেকে উপজেলাতে উন্নীত করা হয়। লামা সদর দপ্তর সমতলে অবস্থিত হলেও এর চারপাশে রয়েছে নিসর্গ পর্বতরাজি এবং গিরিতরঙ্গীনি মাতামুহুরী নদী।

আয়তন ও সীমানা

লামা উপজেলার আয়তন ৬৭১.৮৪ বর্গকিলোমিটার। উত্তরে বান্দরবান সদর উপজেলা, দক্ষিণে নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলা, পশ্চিমে কক্সবাজারের চকরিয়া উপজেলা এবং পূর্বে আলীকদম উপজেলা অবস্থিত।

ইউনিয়নের সংখ্যা : ৭টি। যথা : ১. আজিজনগর, ২. ফাইতং, ৩. ফাঁসিয়াখালী, ৪. গজালিয়া, ৫. লামা, ৬. রূপসীপাড়া ও ৭. সরই

পৌরসভা : ১টি

মৌজার সংখ্যা : ১৮টি

মোট লোকসংখ্যা : ১,০৮,৯৯৫ জন। তারমধ্যে পুরুষ ৫৬,৬১০ জন ও নারী ৫২,৩৮৫ জন।

জাতিসত্তার নাম : মারমা, ম্রো, ত্রিপুরা ও বাঙালি,।

প্রধান প্রধান হাট-বাজারের নাম : ১. লামা বাজার, ২. ইয়াংছা বাজার, ৩. কুমারী বাজার, ৪. গজালিয়া বাজার, ৫. বনফুল বাজার, ৬. আজিজনগর বাজার ৭. ক্যজু বাজার।

গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা

(১) কলেজ : ১টি

(২) মাধ্যমিক বিদ্যালয় : ১১টি

নদ-নদী : মাতামুহুরী নদী।

প্রধান প্রধান অর্থকরী ফসল : তামাক, চিনাবাদাম, আম, কলা, পেঁপে, তুলা, আদা, হলুদ, কচু, কলাই, শিম, বরবটি ইত্যাদি।

৪. নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলা

উপজেলার গোড়াপত্তন

নাইক্ষ্যংছড়ি ১৯২৩ সালে থানা হিসেবে প্রশাসনিক কার্যক্রম শুরু করে। প্রশাসনিক বিকেন্দ্রিকরণ কর্মসূচির আওতায় ১৯৮২ সালের ৭ নভেম্বর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের থানা প্রশাসন পুনর্বিন্যাস অধ্যাদেশ ১৯৮২ আদেশ বলে নাইক্ষ্যংছড়িকে "মনোনীত থানা" ঘোষণা দেওয়া হয় এবং ১৯৮৫ সালে নাইক্ষ্যংছড়িকে থানা থেকে উপজেলাতে উন্নীত হয়।

আয়তন ও সীমানা

নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার আয়তন ৪৬৩.৬১ বর্গকিলোমিটার। উত্তরে লামা ও আলীকদম উপজেলা, দক্ষিণে টেকনাফ ও মায়ানমারের আরাকান প্রদেশ, পশ্চিমে কক্সবাজার জেলার উখিয়া ও রামু উপজেলা এবং পূর্বে মায়ানমারের আরাকান প্রদেশ অবস্থিত।

ইউনিয়নের সংখ্যা : ৪টি। যথা : ১.বাইশারী, ২. দোছড়ি, ৩. ঘুমধুম ও ৪. নাইক্ষ্যংছড়ি ইউনিয়ন।

মৌজার সংখ্যা : ১৭টি

মোট লোকসংখ্যা : ৬১,৭৮৮ জন। তারমধ্যে পুরুষ ৩১,৩৪৭ জন ও নারী ৩০,৪৪১ জন।

জাতিসত্তার নাম : বাঙালি, মারমা, ম্রো, ত্রিপুরা ও চাক।

প্রধান প্রধান হাট-বাজারের নাম : ১. নাইক্ষ্যংছড়ি বাজার, ২. বাইশারী বাজার ও ৩. দোছড়ি বাজার।

গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা

(১) কলেজ : ১টি

(২) মাধ্যমিক বিদ্যালয় : ৫টি

নদ-নদী : বাঁকখালী নদী

প্রধান প্রধান অর্থকরী ফসল : তামাক, চিনাবাদাম, আনারস, কলা, পেঁপে, তুলা, আদা, হলুদ, কচু কলাই, শিম, বরবটি ইত্যাদি।

৫. থানছি উপজেলা

উপজেলার গোড়াপত্তন

থানছি ১৯৭৬ সালে থানা প্রশাসনিক কার্যক্রম শুরু করে। প্রশাসনিক বিকেন্দ্রিকরণ কর্মসূচির আওতায় ১৯৮২ সালের ৭ নভেম্বর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের থানা প্রশাসন পুনর্বিন্যাস অধ্যাদেশ ১৯৮২ আদেশ বলে থানছিকে "মনোনীত থানা" ঘোষণা দেওয়া হয়। ৪টি ইউনিয়ন ও ১২টি মৌজা নিয়ে থানছি ১৯৮৫ সালে থানা থেকে উপজেলাতে উন্নীত হয়।

আয়তন ও সীমানা

এ উপজেলার উত্তরে রুমা উপজেলা, দক্ষিণে মায়ানমারের আরাকান, পূর্বে মায়ানমারের চীন প্রদেশ ও রাঙ্গামাটির বিলাইছড়ি এবং পশ্চিমে আলীকদম ও লামা উপজেলা। গবেষক আতিকুর রহমান থানছি উপজেলা সম্পর্কে লিখেছেন, "The Burma-British War of 1824 resulted in inclusion of Arakan as one of the provinces of British India. This had eased the migration of the Arakanis to Thanchi and its neighbouring areas. The migrants later became permanent settlers in the area and were recognized as residents by Regulation-1 of 1900, popularly known as the CHT Manual."

ইউনিয়নের সংখ্যা : ৪টি। যথা : ১. বলিপাড়া, ২. রেমাক্রী, ৩. থানছি ও ৪. তিন্দু ইউনিয়ন।

মৌজার সংখ্যা : ১১টি

মোট লোকসংখ্যা : ২৩,৫৯১ জন। তারমধ্যে পুরুষ ১২,৩৪৪ জন ও নারী ১১,২৪৭ জন। [তথ্য : ২০১১ সালের আদমশুমারি]

জাতিসত্তার নাম : মারমা, ম্রো, ত্রিপুরা, বম, খুমী, চাকমা ও বাঙালি।

প্রধান প্রধান হাট-বাজারের নাম : ১. থানছি বাজার, ২. বলিবাজার বাজার, ৩. তিন্দু বাজার।

গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা

(১) কলেজ : নাই
(২) মাধ্যমিক বিদ্যালয় : ২টি

নদ-নদী : সাঙ্গু নদী

প্রধান প্রধান অর্থকরী ফসল :

তামাক, চিনাবাদাম, কমলা, আনারস, কাজুবাদাম, আম, কলা, পেঁপে, তুলা, আদা, হলুদ, কচু, কলাই, শিম, বরবটি ইত্যাদি।

৬. রোয়াংছড়ি উপজেলা

উপজেলার গোড়াপত্তন

১৯৭৬ সালে রোয়াংছড়ি থানা প্রশাসনিক কার্যক্রম শুরু হয়। প্রশাসনিক বিকেন্দ্রিকরণ কর্মসূচির আওতায় ১৯৮২ সালের ৭ নভেম্বর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের থানা প্রশাসন পুনর্বিন্যাস অধ্যাদেশ ১৯৮২ আদেশ বলে রোয়াংছড়িকে 'মনোনীত থানা' ঘোষণা দেয়া হয় এবং ১৯৮৫ সালে থানা থেকে উপজেলাতে উন্নীত করা হয়।

আয়তন ও সীমানা

রোয়াংছড়ি উপজেলার আয়তন ৪৪২.৮৯ বর্গকিলোমিটার। উত্তরে রাঙ্গামাটি জেলার রাজস্থলী ও বিলাইছড়ি উপজেলা, দক্ষিণে বান্দরবান সদর, পশ্চিমে বান্দরবান সদর উপজেলা ও পূর্বে রুমা উপজেলা অবস্থিত।

ইউনিয়নের সংখ্যা : ৪টি। যথা : ১. আলেক্ষ্যং, ২. নোয়াপতং, ৩. রোয়াংছড়ি ও ৪. তারাছা ইউনিয়ন।

মৌজার সংখ্যা : ১৩টি

মোট লোকসংখ্যা : ২৭,২৬৪ জন। তারমধ্যে পুরুষ ১৪,২৪৩ জন ও নারী ১৩,০২১ জন।

জাতিসত্তার নাম : মারমা, ম্রো, ত্রিপুরা, খিয়াং, বম, তঞ্চঙ্গ্যা ও বাঙালি।

প্রধান প্রধান হাট-বাজারের নাম : ১. রোয়াংছড়ি বাজার, ২. ঘেরাউ বাজার, ৩. বাঘমারা বাজার ও ৪. নোয়াপতং বাজার।

গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা

(১) কলেজ : নাই

(২) মাধ্যমিক বিদ্যালয় : ২টি

নদ-নদী : তারাছা খাল

প্রধান প্রধান অর্থকরী ফসল : তামাক, চিনাবাদাম, কমলা, আনারস, আম, কলা, পেঁপে, তুলা, আদা, হলুদ, কঁচু, কলাই, শিম, বরবটি ইত্যাদি।

৭. রুমা উপজেলা

উপজেলার গোড়াপত্তন

রুমা উপজেলা ১৯৭৬ সালে থানা হিসেবে প্রশাসনিক কার্যক্রম শুরু করে। প্রশাসনিক বিকেন্দ্রিকরণ কর্মসূচির আওতায় ১৯৮২ সালের ৭ নভেম্বর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের থানা প্রশাসন পূনর্বিন্যাস অধ্যাদেশ ১৯৮২ আদেশ বলে রুমাকে "মনোনীত থানা" ঘোষণা দেয়া হয় এবং ১৯৮৫ সালে থানা থেকে উপজেলাতে উন্নীত করা হয়। গবেষক আতিকুর রহমান রুমা উপজেলা সম্পর্কে লিখেছেন "One of the Arakanese kings Meng Beng (known as Sultan Jabouk Shah) ruled this region for 21 years (1532-53). The Mughals invaded the area in 1666 and ruled until the British had taken control. The region was under the reign of Mraku dynasty until 1784. "

আয়তন ও সীমানা

রুমা উপজেলার আয়তন ৪৯২.১০ বর্গকিলোমিটার। উত্তরে রোয়াংছড়ি উপজেলা, দক্ষিণে থানছি উপজেলা, পশ্চিমে বান্দরবান সদর ও লামা উপজেলা এবং পূর্বে ভারতের মিজোরাম রাজ্য অবস্থিত।

ইউনিয়নের সংখ্যা : ৪টি। যথা : ১. রুমা, ২. গালেংগ্যা, ৩. পাইন্দু ও ৪. রেমাক্রী প্রাংসা ইউনিয়ন।

মৌজার সংখ্যা : ১৪টি

মোট লোকসংখ্যা : ২৯,০৯৮ জন। তারমধ্যে পুরুষ ১৫,৪৬৯ জন ও নারী ১৩,৬২৯ জন।

জাতিসত্তার নাম : মারমা, ম্রো, ত্রিপুরা, খিয়াং, বম, তঞ্চঙ্গ্যা ও খুমী।

প্রধান প্রধান হাট-বাজারের নাম : ১. রুমা বাজার, ২. কক্ষ্যংঝিড়ি বাজার, ৩. মুরুংগো বাজার।

গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা

(১) কলেজ : ১টি

(২) মাধ্যমিক বিদ্যালয় : ২টি

নদ-নদী : সাঙ্গু নদী ও রুমা খাল।

প্রধান প্রধান অর্থকরী ফসল : তামাক, চিনাবাদাম, কমলা, আনারস, কাজুবাদাম, আম, কলা, পেঁপে, তুলা, আদা, হলুদ, কচু, কলাই, শিম, বরবটি ইত্যাদি।

গ. ভৌগোলিক অবস্থান ও জনসংখ্যা

বান্দরবান বাংলাদেশের ২৩°১১′ উত্তর অক্ষাংশ হতে ২২°২২′ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯২°৪০′ পূর্ব-দ্রাঘিমা হতে ৯২°৪১′ পূর্ব-দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত। এ জেলার উত্তরে রাঙ্গামাটি জেলা, দক্ষিণে আরাকান (মিয়ানমার), পূর্বে ভারতের মিজোরাম প্রদেশ এবং পশ্চিমে চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলা অবস্থিত। প্রধান গিরি ও পর্বতশ্রেণির মধ্যে চিম্বুক, কেওক্রাডং, তাজিংডং, মিরিঞ্জা, ওয়াইলাটং, তামবাং এবং পলিতাই উল্লেখযোগ্য। এখানে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৪.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন ১৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এ অঞ্চলে বৃষ্টিপাত হয় ৩০-৩১ মিমি.। এ অঞ্চলের পর্বতশ্রেণি সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৩৫০০ ফুট পর্যন্ত উচ্চ। বর্তমানে এ জেলার মোট জনসংখ্যা ৩,৮৮,৩৩৫ জন। এর মধ্যে পুরুষ ২,০৩,৩৫০ জন এবং মহিলা ১,৮৪,৯৮৫ জন।

ঘ. বনভূমি ও গাছপালা

বান্দরবান পার্বত্য জেলায় মোট অশ্রেণিভুক্ত বনাঞ্চলের পরিমাণ হলো ৭,২২,০৭১ একর। এর মধ্যে বনবিভাগ বনায়ন করেছে—

১। বান্দরবান বনবিভাগ	২৩,৬৮১ একর
২। পাল্পউড বনবিভাগ বান্দরবান	২৬,৯৪২ একর
৩। লামা বনবিভাগ	১৯,১৩৫ একর
৪। পাল্পউড বনবিভাগ কাপ্তাই	১৬,০০০ একর
৫। ১৫৫ জুমিয়া পরিবারকে পুনর্বাসন	৭,৭৭৫ একর
	সর্বমোট = ৬,২৮,৫৩৮ একর।

পার্বত্য বনাঞ্চলকে Rain Forest বলা যেতে পারে। এ অঞ্চলের মাটি প্রায় সময়ই স্যাঁতসেঁতে থাকত। উচ্চ উচ্চ বৃক্ষের ডালে নানা ধরনের অর্কিড শোভা ছিল দৃষ্টিনন্দন। এই বনে সবচেয়ে উচ্চ গাছপালা প্রায় ৭০-৭৫ মিটার লম্বা হয়। এদের গুঁড়ি ও আকার বেশ বৃহৎ হয়। এই বৃক্ষগুলো সবসময় তীব্র রোদ ও বাতাস মোকাবেলা করে। এই বৃক্ষগুলোয় ঈগল পাখি, বানর, হনুমান, উল্লুক, বাদুর, ধনেশ পাখি, ভীমরাজ এবং প্রজাপতিরা বসবাস করতে দেখা যায়।

এখানকার বনাঞ্চল সবচাইতে ঘন এবং সবুজ স্তর। উপর থেকে দেখলে মনে হবে সবুজ ছাদ। এই স্তরের গাছগুলো সবচাইতে বেশি সূর্যের আলো আর বৃষ্টি পায়। এখানে পশুপাখিদের খাবার যোগাড় করতে বেশ সুবিধাজনক। তাই এখানে বাসা বাঁধে বিভিন্ন ধরনের পশুপাখি। এ স্তরের প্রাণীদের মধ্যে রয়েছে কাঠবিড়ালী, ময়না, টিয়া, লেমুর, বানর, ব্যাঙ, সাপ ও নানা প্রাজাতির সরীসৃপ।

এই বনের নীচুস্তরে কচি গাছপালা আর লতাগুল্ম জন্মে। বনের ঘন সবুজ ছাদ ভেদ করে সামান্য কিছু সূর্যের আলো এই স্তরে পৌঁছায়। তবে এখানেও বিভিন্ন ধরনের প্রজাপতি, ব্যাঙ আর সাপের দেখা মেলে। মাটির সবচাইতে কাছাকাছি অর্থাৎ এ বনের গাছপালার মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন প্রজাতির ফার্ণ, তৃণলতা ও চারাগাছ। এই বনের এই স্তরের সূর্যের আলো পৌঁছায় মাত্র দুই শতাংশ। মাটি প্রায়সময় থাকে স্যাঁতসেঁতে। এই মাটিতে প্রচুর ঝরাপাতা, মরা গাছপালা, মৃত পশুপাখির দেহ পড়ে থাকে। এই বনে নানা ধরনের জঙ্গলী ফলজবৃক্ষ দেখা যায়। ফলজবৃক্ষের মধ্যে রয়েছে–ডুমুর, গুটগুটিয়া, লক্কন, আমলকি, বহেরা, আমড়া ইত্যাদি। উল্লেখযোগ্য গাছপালার মধ্যে রয়েছে-গামার, সেগুন, গর্জন, তৈলসুর, গোদা, গুটগুটিয়া, চাঁপালিশ, চাঁপাফুল, শিলকড়ই, কড়ই, উড়িআম, ধুন্দল, কাঁঠাল, তুলাগাছ, লালিগাছ ইত্যাদি।

ঙ. সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

আরাকানি ও মোগল শাসন আমলে চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার মধ্যে কোনো সুনির্দিষ্ট সীমারেখা ছিল না। বিপদসঙ্কুল এই পার্বত্য অঞ্চলে আদিকাল থেকে মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন শাখাভুক্ত জাতিসত্তার বসবাস ছিল। ব্রিটিশ শাসনামলে ১৮৬০ খ্রিষ্টাব্দে পার্বত্য চট্টগ্রামকে জেলা গঠন করা হলে চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার সীমারেখা সৃষ্টি করে দুটি পৃথক অঞ্চল বা জেলা গঠিত হয়। তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলাকে তিনটি সার্কেলে বিভক্ত করে প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনা করে। এই তিনটি সার্কেল যথাক্রমে– দক্ষিণাংশে বোমাং সার্কেল (বান্দরবান), উত্তরে মং সার্কেল (খাগড়াছড়ি) এবং মধ্যবর্তী স্থানে চাকমা সার্কেল (রাঙ্গামাটি)। সার্কেল চিফকে 'রাজা' বলা হয়। পার্বত্য চট্টগ্রামের সার্বিক ইতিহাসের সাথে রাজাগণ ওতপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত।

১৫১৪ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত তৎকালীন চট্টগ্রাম অঞ্চল আরকানের মহারাজা মাংরাজাগ্রীর শাসনের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৫৯৯ খ্রিষ্টাব্দে আরাকান রাজা মাংরাজাগ্রী ও তঙ্গু রাজ্যের গভর্নর রেঃসীহা-এর যৌথ সামরিক অভিযানের ফলে হাইসাওয়াদি রাজ্যের পতন ঘটে।

হ্যাইসাওয়াদি রাজ্যের রাজধানী ছিল পেগু। মাংরাজাগ্রী পেগু রাজকন্যা সাইং ড হ্লাকে বিয়ে করে রাজকুমার মং চ প্যাইকে আরাকানি গভর্নর হিসেবে চট্টগ্রামে নিযুক্ত করেন। ১৬২০ খ্রিষ্টাব্দে চট্টগ্রামের শাসনকর্তা মং চ প্যাই অতি সাহসিকতার সাথে পর্তুগিজদের আক্রমণকে প্রতিহত করে আরাকানি শাসনকে সুসংহত রাখেন। এতে আরাকানী রাজা মাংখমং সন্তুষ্ট হয়ে মং চ প্যাইকে 'বোমাং' উপাধিতে ভূষিত করেন। মং চ প্যাই-এর মৃত্যুর পর বোমাং হেরী ঞো-এর আমলে তাঁর সহায়তায় আরাকানি রাজা উইজায়াংহ্ কিছুদিনের জন্য মোঘলদের হাত থেকে চট্টগ্রাম অঞ্চলকে পুনর্দখল করতে সক্ষম হন। ১৬৬৬ খ্রিষ্টাব্দে মোঘলরা চট্টগ্রাম অঞ্চল দখল করলে আরাকানি শাসনের অবসান হয়। মোঘল শাসনামলে বোমাং রাজাগণ জনসাধারণ থেকে কার্পাস তুলা, তিল, তিশি ইত্যাদি পণ্যের উপর খাজনা আদায় করে মোঘল শাসনকর্তাদের কাছে অর্পণ করে তাদের বশ্যতা স্বীকার করে নেয়। এরপর থেকে বোমাং রাজাগণ আরাকান রাজাকে রাজস্ব না দিয়ে তার পরিবর্তে মোঘল রাজাকে রাজস্ব দিতেন। এভাবে মোঘল রাজশক্তি বোমাং রাজাকে দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলের শাসন ও রাজস্ব আদায়ের স্বার্থে মোঘল রাজশক্তি হিসেবে ব্যবহার করে। পরবর্তীকালে ব্রিটিশ সরকার ১৮৬০ সালে বেঙ্গল অ্যাক্ট-২২ প্রণয়ন করে ১ সেপ্টেম্বর ১৮৮১ সালে সার্কেল চিফ হিসেবে বোমাং-এর পদমর্যাদাকে সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। এরপর ১৯০০ সালে 'চিটাগাং হিল ট্রেক্টস রেগুলেশন অ্যাক্ট' প্রণয়ন করে বোমাং রাজাগণকে 'সার্কেল চিফ' পদে অধিষ্ঠিত করা হয়।

এই জেলায় বসবাস করে দশ ভাষাভাষী, এগারোটি আদিবাসী ও বাঙালিসহ মোট তেরোটি জনগোষ্ঠী। এর ফলে জেলায় রয়েছে জাতিগত বৈচিত্র্য, সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য, ভাষাবৈচিত্র্য, জীববৈচিত্র্য ও ভূবৈচিত্র্য। এ জেলার সামাজিক অবস্থাও অত্যন্ত বৈচিত্র্যময়। বাংলা সংস্কৃতির সাথে আদিবাসী সংস্কৃতির সম্মিলনের ফলে হয়ে উঠেছে সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য। এখানে এগারোটি আদিবাসী বসবাস করলেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে সামাজিক ব্যবস্থা ভিন্ন। আদিবাসীদের নৃত্যগীত ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল অত্যন্ত সমৃদ্ধ ও বিস্তৃত। আদিবাসীদের বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতির সাথে বাঙালির সংস্কৃতি একই সূত্রে গ্রথিত না হলেও উভয়ের সংস্কৃতির সহাবস্থান রয়েছে। বাঙালি মুসলমান ও হিন্দুদের বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসব, পূজা-পার্বণ ও নানা ধরনের সামাজিক অনুষ্ঠান আয়োজনে এখানকার জনগণের কোনো সাম্প্রদায়িক মনোভাব নেই। মুসলমানদের বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও হিন্দুদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে আদিবাসীরাও স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে। একইভাবে আদিবাসীদের বৈসাবি উৎসবেও বাঙালিদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণও পরিলক্ষিত হয়। মারমাদের ওয়াগ্যোয়াই, ওয়াছো, সাংগ্রাইং, ম্রোদের 'চিয়াসদ পই' (গো-হত্যা অনুষ্ঠান), ত্রিপুরাদের বৈসুক, তঞ্চঙ্গ্যাদের বিষু ও চাকমাদের বিজু উৎসবসহ আদিবাসীদের বিভিন্ন সামাজিক ও ধর্মীয় উৎসব প্রতিবছর যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে পালন করা হয়ে থাকে। এখানে আদিবাসী ও বাঙালিদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব ও সৌহার্দ্যপূর্ণ সহাবস্থান রয়েছে। এ জেলায় আদিবাসী ও বাঙালিরা সামাজিক-সাংস্কৃতিক মেলবন্ধনে আবদ্ধ। অনেক আদিবাসী গ্রামের পাশে বাঙালিপাড়া রয়েছে। তারপরও তাদের মাঝে কোনো সংঘাত বা সম্প্রীতি বিনষ্টের খবর পাওয়া যায়নি। কোনো কোনো গ্রামে আদিবাসী ও বাঙালিরা একই সাথে বসবাস করে এমন অনেক নজিরও পাওয়া

যায়। নিজের মতো যে যার ধর্ম, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানাদি স্বাধীনভাবে পালন করাকে এলাকায় আদিবাসী ও বাঙালিদের মাঝে সম্প্রীতি ও সাম্যের প্রতীক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ধর্মীয় ও সামাজিকভাবে তারা এক সমাজ থেকে অন্য সমাজে ভিন্ন হলেও সামাজিক আচার-আচরণে তাদের মধ্যে প্রগাঢ় আন্তরিকতা দেখা যায়।

চ. প্রধান পশুপাখি ও জীবজন্তু

পার্বত্য অঞ্চল ছিল পশুপাখি ও জীবজন্তুর অভয়ারণ্য। হাতি, হরিণ, বন্য শূকর, বন্য গরু, বানর, অজগর, ময়না, বাঁদুর, বনমোরগ, শকুন ইত্যাদির বিচরণ এখানে পূর্বেও ছিল, এখনও আছে। তবে আশ্রয়াণের অভাবে এদের জীবন হুমকির মুখে। সংরক্ষণের প্রকল্পও আছে। থাকলে কী হবে, জাতীয় গুরুত্ব খুবই কম। হাতি পূর্ব-পুরুষের বিচরণক্ষেত্রে এখনও আসে। মাঠে ধান পাকলে হাতির উপদ্রব বেড়ে যায়। খাদ্যের সন্ধানে লোকালয়ে ঢুকে পড়ে। ধানের ফসল, কলাগাছ ও অন্যান্য গাছপালাও বিনষ্ট করে। এরা দলবদ্ধভাবে চলে, সাধারণত এরা মানুষের ক্ষতি করে না। এদের মাঝে দু'একটি পাগলা হাতি আছে যা পাহাড়ি এলাকার বসতিতে প্রবেশ করে বাড়িঘর ভাংচুর করে এবং ফসলাদি নষ্ট করে। ঘরে ঢুকে মানুষের ধান-চাল খাওয়া কিংবা নষ্ট করার কাহিনিও প্রতি বছর ঘটে। এরপরও রয়েছে প্রতিবছরই মানুষ মারার ঘটনা। ফসল রক্ষার জন্য কৃষকেরা শক্ত বড়ো গাছের উপর 'ইউ-অথবা ভি' আকৃতির মাচা তৈরি করে রাতে পাহারা দেয়। হাতিকে প্রতিহত করার জন্য অনেক সময় বাঁশের আগায় বোম্বা (এক ধরনের মশাল) ভয় দেখানোর জন্য আগুন ধরিয়ে দেয়, তাতে হাতির পাল দিক পরিবর্তন করে সরে যায়।

এ এলাকাতে গরুর অবাধ বিচরণ রয়েছে, মহিষও আছে তবে কম। ভেড়া-ছাগলের সংখ্যা খুবই কম। বাঙালি-পাহাড়ি সবাই হাঁস-মুরগি ও গরু লালনপালন করে। সমতল ভূমির তুলনায় এখানে গরুর পালন পদ্ধতি ভিন্ন। এখানেও গরুর গলায় দড়ি বা রশি বাঁধে না। বলা চলে স্বরাজ বিচরণ। গরু-বাছুরের স্বাস্থ্য খুবই দুর্বল। দুধেল গাভীর দুধ গোবৎসেরই হয় না, তাই কৃষক গরুর দুধ প্রাপ্তির আশাও করে না। আদিবাসীদের অনেকেরই ধারণা মায়ের দুধ শিশুরাই খাবে, এটাতো মানুষদের প্রাপ্য হতে পারে না। তবে যেসব খামারি ঘরে রেখে দুধের গাভী লালন-পালন করেন, রীতিমতো খাদ্য দেন, তারা দুধ খেয়ে থাকেন কিংবা বিক্রয় করে থাকেন। পাহাড়িদের তুলনায় বাঙালিদের গরু ও হাঁস-মুরগি পালনের হার বেশি।

এখানে গরুর অবাধ বিচরণ থাকলেও গরুগুলো পুষ্টিহীনতায় ভোগে। এখানে পাহাড়ি এলাকার মাটি অনুর্বর। অনুর্বর মাটির ঘাসও পুষ্টিহীন। তাই এহেন খাদ্য খেয়ে এরা মোটাতাজা হতে পারে না। অপরপক্ষে দারিদ্র্যতার কঠিন দণ্ডমানে বোঝা যায়, গরুর জন্য অতিরিক্ত টাকা খরচ করে তাদের গরু পোষণ সম্ভব নয়। এছাড়া একটি বিষয় লক্ষণীয়, যে পরিমাণ শক্তি ক্ষয় করে উঁচু-নীচু পাহাড়ে গো-মহিষাদি ঘাস খায় তাতে গরুর শরীরে পুষ্টি সঞ্চয় হয় না। ব্যক্তি মালিকানায় রাবার চাষ এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে গো-বিচরণযোগ্য ভূমির পরিমাণও কমে আসছে।

ছ. জেলার প্রধান প্রধান খাদ্যশস্য

এখানে বিভিন্ন মৌসুমে বিভিন্ন ধরনের ফসল ফলে।
ধানের আবাদকৃত জাত :

(ক) খরিপ-১ মৌসুম

১. **উচ্চ ফলনশীল জাত** : বি আর-১২, বি আর-২১, বি আর-২৮

২. **স্থানীয় জাত (জুমে উৎপাদিত)** : বড় ধান, লালগ্যালন, সাদাগ্যালন, ফকর, চাকমা চিকন, তুলশিমালা, লালবিন্নি, কালোবিন্নি ও সাদাবিন্নি।

(খ) খরিপ-২ মৌসুম

১. উচ্চ ফলনশীল জাত : বি আর-১০, বি আর-১১, বি আর-৩০, বি আর-৩১, বি আর-৩২, পাজাম।

২. স্থানীয় জাত : বিন্নি ধান।

(গ) রবি মৌসুম

উচ্চ ফলনশীল জাত : বি আর-৩, বি আর-১১, বি আর-১২, বি আর-১৪, বি আর-২৮, বি আর-৩৬।

এছাড়াও তুলা, ভুট্টা, বাদাম, আলু, মিষ্টি আলু, আদা, হলুদ, মরিচ, কচু ইত্যাদি ফসল জন্মে।

এই জেলার অধিবাসীদের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য যেমন রয়েছে তেমনি তাদের চাষাবাদ পদ্ধতিতেও বৈচিত্র্যের ছাপ রয়েছে। বাঙালিরা সমতল ও মালভূমিতে হালচাষ করে বিভিন্ন মৌসুমে নানা ধরনের ফসলের চাষ করে। মারমা, চাকমা, তঞ্চঙ্গ্যা, চাক, খিয়াং ও ত্রিপুরা আদিবাসীরা সমতল বা নদীর অববাহিকায় বাস করলেও ম্রো, খুমী, লুসাই, পাংখোয়া ও বমরা বাস করে গভীর বনে ও উঁচু উঁচু পাহাড়ে। মারমা, চাকমা, তঞ্চঙ্গ্যা, চাক, খিয়াংরা জমি চাষ করলেও ম্রো, খুমী, লুসাই, পাংখোয়া ও বমরা সাধারণত এখনও জুমচাষ করে অথবা ফলজ বাগান করে।

জ. লোকজ সংস্কৃতিতে হাট-বাজারের ভূমিকা

বান্দরবান জেলার পাহাড়ি-বাঙালি সমাজ ও সংস্কৃতিতে বাজারগুলোর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। আদিবাসীদের উৎপাদিত পণ্যদ্রব্যগুলো এসব বাজারে বিক্রি করা হয়। আবার দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে যে জিনিসগুলো এসব বাজারে পাওয়া যায় না বা এখানে উৎপাদন হয় না, সেসব জিনিস ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে স্থানীয় লোকেরা ক্রয় করে। যার ফলে এ জেলার জনসাধারণের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে এসব বাজারগুলোর বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। এ জেলায় বসবাসরত আদিবাসীদের লোকসংস্কৃতির উপাদান হিসেবে যেগুলো তারা নিজেরাই তৈরি করতে পারে না সেগুলো তারা বাঙালি ব্যবসায়ী বা বেপারিদের নিকট হতে ক্রয় করে। আদিবাসীদের জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ—'দা' যেটা তারা দৈনন্দিন কাজে নিত্য ব্যবহার করে, সেটি তারা কাঠে ডিজাইন বানিয়ে স্থানীয় বাজারের কামারদের দিয়ে তৈরি করে।

আবার আদিবাসীদের তৈরি করা বা উৎপাদন করা জিনিসপত্র বাঙালি ব্যবসায়ীরা ক্রয় করে নিয়ে বিভিন্ন স্থানে বিক্রি করে অর্থোপার্জন করেন। তাছাড়া বিভিন্ন সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে ব্যবহারের জন্য বাজার থেকে নানা ধরনের পণ্য ক্রয় করা হয়। শবদাহ বা অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদনের জন্য বাজার থেকে নানা ধরনের আগরবাতি, মোমবাতি, রঙিন কাগজ ইত্যাদি ক্রয় করা হয়। বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠান যেমন : বিবাহ, জন্মদিন, পূজা-পার্বণ প্রভৃতি অনুষ্ঠানে বর-কনের সাজানো, বিবাহ আসর সাজানোসহ নানা ধরনের বিবাহের উপকরণ ও অন্যান্য অনুষ্ঠানের উপকরণ বাজার থেকে ভাড়া করে আনা হয় অথবা ক্রয় করা হয়। তাছাড়া আদিবাসী ও বাঙালিদের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ও নানা ধরনের অলংকার বাজার থেকে ক্রয় করা হয়।

বাজারে বেচা-কেনার দৃশ্য

ঝ. জনবসতি পরিচয়

মারমা জাতি পরিচিতি

পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত আদিবাসীদের মধ্যে মারমারা দ্বিতীয় বৃহত্তম জনগোষ্ঠী। তিন পার্বত্য জেলার মধ্যে মারমাদের সবচেয়ে বেশি বসবাস রয়েছে বান্দরবান পার্বত্য জেলায়। তাছাড়া খাগড়াছড়ি জেলার সদর, রামগড়, উপজেলা সদর ও ভাইবোন ছড়া, মানিকছড়ি, মাটিরাঙ্গা উপজেলার তবলছড়ি, মহালছড়ি উপজেলার মাইসছড়ি ও পানছড়ি উপজেলার বরনাল এবং রাঙ্গামাটি জেলার চন্দ্রঘোনা, রাজস্থলি, কাউখালী ও সদর উপজেলায় মারমাদের বসতি রয়েছে। ১৯৯১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত মারমা জনগোষ্ঠীর মোট সংখ্যা হচ্ছে ১,৪২,৩৩৪ জন। এর মধ্যে বান্দরবান পার্বত্য জেলায় বসবাস করে ৫৯,২৮৮ জন, রাঙ্গামাটি পার্বত্য

জেলায় বসবাস করে ৪০,৮৬৮ জন এবং খাগড়াছড়ি জেলায় বসবাস করে ৪২,১৭৮ জন। ২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী বান্দরবান পার্বত্য জেলায় মারমাদের জনসংখ্যা ৭৭,৪৭৭ জন।

'মারমা' (Marma) শব্দের উৎপত্তি ঘটেছে মূলত 'মায়াইমা' (Myaima) বা 'ম্রাম্মা' (Mramma) বা 'ম্রাইমা' (Mraima) শব্দ থেকে (ক্যশৈপ্রু ১৯৯৪)। 'মারমা' বা 'ম্রাইমা' নামক একটি জনগোষ্ঠী বা জাতিসত্তার অস্তিত্ব প্রাচীনকালেও ছিল বলে জানা যায়। আনুমানিক নবম ও দশম শতাব্দীতে হীনযান বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী ও তিব্বত-দ্রাবিড়ীয় গোষ্ঠীভুক্ত 'ম্রাম্মা' নামের এক জাতির প্রাচীন ব্রহ্মদেশের দক্ষিণ অঞ্চলে উপস্থিতির পরিচয় পাওয়া যায় (মংক্য শোয়েনু ১৯৯৮)। ষষ্ঠ শতাব্দীতে দক্ষিণ ভারতের কৃষ্ণা ও গোদাবরী নদী অঞ্চলের লোকেরা বর্মীদের কাছে 'তলই' নামে পরিচিত ছিল এবং এদের রাজ্য ছিল হাইসাওয়াদী। ঐ রাজ্যের রাজধানীর নাম ছিল পেগু। 'সাহ্মালা' (সমল) ও 'রয়িমালা' (বিমল) নামক দু'জন তলইং রাজপুত্র তাদের নেতৃত্বে প্রায় ৫৭৩ খ্রিষ্টাব্দে ঐ পেগু নগর গড়ে তুলেছিলো। ঐ সময় নৌ পথে এরাই সর্বপ্রথম 'ম্রাইমা চা, বা 'মারমা জা' নামক বর্ণমালা বার্মার দক্ষিণ পূর্বাংশে ছড়িয়ে দিয়েছে। যেহেতু মারমা জনগোষ্ঠীর পূর্ব-পুরুষগণ এই প্রাচীন হস্তলিপির মাধ্যমে নিজেদের মনের ভাব প্রকাশ করে এবং নিজেদের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য এই হস্তাক্ষরের মাধ্যমে লিপিবদ্ধ করে এবং নিজ বংশ রক্ষা করে চলেছে, সেহেতু আজ এরা নিজ গোষ্ঠীসহ অপরাপর জনগোষ্ঠীর কাছে নিজেদেরকে 'মারমা' নামে পরিচয় দিয়ে থাকে (মংক্য শোয়েনু ১৯৯৮)।

ঐতিহ্যবাহী পোশাকে মারমা যুবতীরা

১৫৯৯ খ্রিষ্টাব্দে আরাকানের মহারাজা মাংরাজাগ্রী ও তংগু রাজ্যের গভর্নর রেঃসীহা'র মিলিত রণ-পরিকল্পনা অনুসারে যৌথ সামরিক অভিযানের ফলে হাইসাওয়াদী রাজ্যের পতন হয়। উল্লেখ্য যে, ঐ যুদ্ধে চট্টগ্রামের আরাকানি গভর্নর মহাপঞাগ্য নেতৃত্ব দেন এবং যুদ্ধে তিনি নিহত হন। প্রতিপক্ষ পেগুরাজ নাইন্দা বরাংও

যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হন। বিজয়ী আরাকানি মহারাজা মাংরাজাগ্রী পেগুর ধৃত সুন্দরী রাজকুমারী খাই মা হ্নাং ওরফে সাইং দ হ্নাংকে বিয়ে করে পেগুর ধৃত নাবালক রাজপুত্র মং চ প্যাইকে সঙ্গে নিয়ে তথায় বাজেয়াপ্ত স্বর্ণ, রৌপ্য ও একটি শ্বেতহস্তিসহ সসৈন্যে স্বদেশের রাজধানী ম্রকউ শহরে প্রত্যাবর্তন করেন। এসময় অন্যানোপায় হয়ে বিজিত পেগু রাজ্যের প্রজাগোষ্ঠী হতে তিন হাজার পরিবার উদ্বাস্তু হয়ে আরাকান রাজ্যে প্রবেশ করে। এভাবে হাইসাওয়াদী রাজ্যের পাগাইং রাজত্বের চিরতরে অবসান হয়।

১৬১৪ খ্রিষ্টাব্দে আরাকানরাজ মাংখমং পেগুর বন্দি যুবরাজ মং চন প্যাইকে আরাকানি গভর্নর হিসেবে চট্টগ্রামে নিযুক্ত করেন। যুবরাজ মং চ প্যাইকে অনুসরণ করে পেগুর উদ্বাস্তু পরিবারগুলো ম্রউক ত্যাগ করে চট্টগ্রামে প্রবেশ করে। ১৬২০ খ্রিষ্টাব্দে চট্টগ্রামের শাসনকর্তা মং চ প্যাই অতি সাহসিকতার সাথে পর্তুগিজদের আক্রমণকে প্রতিহত করে আরাকানি শাসনকে সুসংহত রাখেন। এতে আরাকানি রাজা মাংখমং সন্তুষ্ট হয়ে মং চ প্যাইকে "বোমাং" উপাধিতে ভূষিত করেন।

মারমা জনগোষ্ঠী ১৫টি গোত্রে বিভক্ত

১. রেগ্রেসা : এই গোত্রটি বান্দরবান জেলায় শঙ্খ নদীর তীরে বসবাস করে।

২. পেলেংসা : এই গোত্র হচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রামে আগত মারমাদের দ্বিতীয় দল যারা কোলাদাইং নদীতে পতিত হওয়া পেলেংখ্যাং নদীর তীরে বসবাস করতো এবং বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রামের উত্তরাঞ্চলে মং সার্কেলে বসবাস করে।

৩. মারোসা : এই গোত্রটি কোলাদাইং নদীর তীরে বসবাস করতো।

৪. সাবোকসা : শঙ্খ নদী উজানে সাবোকখ্যং, মাঝামাঝিতে রেগ্রেখ্যং ও ভাটিতে সাঙ্গু নামে পরিচিত। সাবোকখ্যং এলাকায় যারা বাস করে তারা সাবোকসা নামে পরিচিত।

৫. কক্‌দাইনসা : চট্টগ্রাম জেলার সাতকানিয়ার পশ্চিমে বাঁশখালীর নিকটস্থ পাহাড়গুলো কক্‌দাইন নামে পরিচিত। ঐ অঞ্চলে যারা বসবাস করতো তারা কক্‌দাইনসা নামে পরিচিত।

৬. ক্যকফ্যাসা : যে গোত্রটি কোলাদাইং নদীর আশপাশে বাস করতো তবে নদীর একেবারে নিকটবর্তী এলাকায় বাস করতো না, তারা ক্যকফ্যাসা নামে পরিচিত।

৭. লংগাদুসা : এই গোত্রটি কর্ণফুলির একটি শাখা নদী কাচালং নদীর অববাহিকায় বসবাস করতো। তারা লংগাদুসা নামে পরিচিত।

৮. কোয়াইঃচাঃরিসা : এই গোত্রটি রাজকীয় সুপারির কৌটা বহন করতো বলে কোয়াইঃচাঃরিসা নামে পরিচিত।

৯. কগদাসা : এরা মারমা জনগোষ্ঠীর একটি যাযাবর গোত্র ছিলো, যারা পুরাতন রাজার প্রতি অতি সামান্য আনুগত্য দেখাতো। এদের বসবাস হচ্ছে চন্দ্রঘোনা এলাকায়।

১০. পেলেংগ্রীসা : এই গোত্রটিও আরাকানে কোলাদাইন নদীর অববাহিকা থেকে এসেছে। ব্যতিক্রম হচ্ছে 'গ্রীঃ' শব্দটি 'বৃহৎ' অর্থে ব্যবহৃত হয়।

১১. কোলাসা : এই গোত্রটি মাতামুহুরী নদীর অববাহিকায় বসবাস করে।

১২. পালাউসা : মারমাদের এই গোত্রটিও মাতামুহুরী নদীর অববাহিকায় বসবাস করে থাকে।

১৩. তাইঃছিত্ সা

১৪. ক্যক্‌মাসা

১৫. মাহ্লাইংসা

মারমা সমাজে পরিবারই হচ্ছে চূড়ান্ত আর্থ-সামাজিক একক। পরিবারের প্রতিটি সদস্যের কার্যকলাপ সমাজের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় জীবনকে প্রভাবিত করে। মারমা জনগোষ্ঠীর গ্রামগুলোতে দুই প্রকারের পরিবার কাঠামো দেখা যায়। সেগুলো হলো : (১) একক পরিবার (২) যৌথ বা বর্ধিত পরিবার। মারমা সমাজ পিতৃসূত্রীয়, কিন্তু নারীর ভূমিকাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পরিবারে নারীর ভূমিকা অনস্বীকার্য এবং পরিবার প্রধানের মৃত্যুর পর স্ত্রীকেই পরিবার প্রধানের ভূমিকা পালন করতে হয়। পরিবারের উন্নতি এবং অর্থনৈতিক কাজের ক্ষেত্রে স্বামী ও স্ত্রী সমান অংশীদার রূপে বিবেচিত। সংসারে নারী যদি কোনো কিছু উপার্জন করে, তাহলে তা পরিবারের কল্যাণে ব্যবহারের জন্য স্বামীর হাতে তুলে দেয়। উপরন্তু পারিবারিক কাজে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের মতামত থাকে। মারমারা বৌদ্ধধর্মাবলম্বী।

ম্রো জাতি পরিচিতি

পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসকারী ১১টি আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মধ্যে ম্রো জনগোষ্ঠী অন্যতম। তিন পার্বত্য জেলার মধ্যে ম্রোরা শুধু বান্দরবান পার্বত্য জেলায় বসবাস করে। পূর্বে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলায় কাপ্তাই উপজেলার অন্তর্গত ভার্য্যাতলী মৌজায় কিছু ম্রো পরিবার ছিলো। সেখান থেকে তারা ১৯৮৫ সালে বান্দরবানে স্থানান্তরিত হয়েছে। বাংলাদেশ ছাড়াও মায়ানমারে আরাকান রাজ্যে বিপুল সংখ্যক ম্রো জনগোষ্ঠীর লোক বাস করে। বাংলাদেশে ম্রোদেরকে বাঙালি, চাকমা ও তঞ্চঙ্গ্যারা মুরুং বলে এবং মিয়ানমার আরাকানে 'মিয়ো' (Myu) নামে পরিচিত। বর্তমানে ম্রোদের জনসংখ্যা ৩৮০২২ (২০১১ সালের আদমশুমারি)।

নৃ-তাত্ত্বিক বিচারে ম্রোরা মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীর অন্তর্গত তিব্বতী-বার্মান (Tibote-Burman) দলের অন্তর্গত। তাদের মুখমণ্ডল গোলাকার, গায়ের রং হলদে-বাদামি, চোখের মণি কালো, চুলগুলো খাড়া, দাড়ি-গোঁফ কম। 'মুরুং' শব্দের উৎপত্তির পেছনেও একটি চমৎকার উদ্ধৃতি রয়েছে। আরকানে বর্মী ও আরাকানিদের মধ্যে সহিংসতা বাঁধলে উভয় পক্ষ নিজেদের শক্তি বৃদ্ধি করার লক্ষে ক্ষুদ্র ও মাঝারি জনগোষ্ঠীদের নিজেদের আয়ত্বে আনতে প্রচেষ্টা চালায়। আনুমানিক পনের'শ শতাব্দীর শেষার্ধে গোটা আরাকান প্রদেশ রাজনৈতিক চরম সংকটে পতিত হয়। ফলে সেখানে সৃষ্টি হয় গোষ্ঠীদাঙ্গা ও গৃহযুদ্ধ। এ সুযোগে দুর্বল ও ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর উপর শুরু হয় আক্রমণ ও সম্পত্তির লুটপাট। সে সময় ম্রোরা খুমী জনগোষ্ঠীর অত্যাচারের শিকার হয়। এটি আরাকান ইতিহাসে সাক্ষ্য মেলে। এসময় আরাকানে কালাডন নদীর তীরদেশে ম্রো ও খুমীদের এক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হয়। সেখানে ম্রোরা শোচনীয়ভাবে পরাজয়বরণ করলে একাংশ আরাকানের পশ্চিমে বর্তমান বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করে। সেখানে বুসিডং নামক পাহাড়ের পাদদেশে বাংলা ভাষাভাষী লোকদের সাথে তাদের দেখা হয়। ইতোপূর্বে কখনোই ম্রোরা বাঙালিদের দেখেনি।

আবার বাঙালিরাও কখনো ম্রোদের দেখেনি। যার ফলে একে অপরকে দেখে উভয়ে অত্যন্ত বিস্মিত হলো। একে অপরে দেখা হলে প্রথমে বাঙালিরা ম্রোদেরকে প্রশ্ন করে। তখন ম্রোরা বাংলা ভাষাতো দূরের কথা স্থানীয় আঞ্চলিক ভাষা 'চাঁটগাইয়া'-এর ভাষাও জানতো না। প্রশ্ন ছিলো- তোমরা কারা? উত্তরে ম্রোরা বললো- 'আঙ ইং সাদলত হনকা ওয়াং রুংমী ম্রো' অর্থাৎ আমরা সূর্যোদয়ের দেশ থেকে আগত মানুষ"। না বুঝে বাঙালিরা পুনরায় প্রশ্ন করলো। তখন ম্রোরা বাক্যটিকে আরও সংক্ষেপে বললো- 'আঙ ইং ম্রো রুং' অর্থাৎ আমরা উদিত মানুষ। তখন বাঙালিরা 'ম্রো রুং' বাক্যকে উচ্চারণগতভাবে শুদ্ধরূপে বলতে না পেরে উচ্চারণের সুবিধার্থে "মুরুং" বলে সম্বোধন করলো। (তথ্য : ইলং ম্রো কারবারি, ইলং পাড়া, নাইক্ষ্যংছড়ি, বান্দরবান)।

ম্রোদের সঠিক ইতিহাস আরাকানির ইতিহাস থেকে মোটামুটিভাবে জানা সম্ভব। মারায়ো রাজার রাজত্বকাল থেকে শুরু করে শেষ রাজা পর্যন্ত প্রায় দুই হাজার বছর ধরে ম্রো রাজাগণ আরাকান শাসন করছে বলে আরাকানের ইতিহাস থেকে জানা যায়। এ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট লেখক ও গবেষক জনাব আব্দুল হক চৌধুরী তাঁর 'প্রাচীন আরাকানে রোয়াইঙ্গা হিন্দু ও বড়ুয়া বৌদ্ধ অধিবাসী নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, "ব্রহ্ম দেশের 'রাজোয়াং' নামক কাহিনির সূত্রে জানা যায় যে, মারু (Mro) বংশীয় রাজাগণের সিংহাসন আরোহণকাল খ্রিষ্টপূর্ব ২৬৬৬ বছর পূর্বে। এই বংশের রাজাগণ বংশ পরম্পরায় ১৮৩০ বছরকাল আরাকানে রাজত্ব করেন। এ বংশের শেষ রাজার আমলে আরাকানের প্রজারা বিদ্রোহী হয়ে রাজাকে হত্যা করে। তখন রানি দুই কন্যাসহ 'কাউক পাণ্ডায়ূং' পর্বতমালায় আশ্রয় গ্রহণ করে"।

ম্রো বংশীয় রাজাদের সম্পর্কে বিশিষ্ট লেখক ও গবেষক জনাব আব্দুল মাবুদ খান তাঁর 'The Mogh A Buddhist Community in Bangladesh' গ্রন্থে উল্লেখ করেছে "রাজুয়াং অনুযায়ী, মারায়ু (মারু) কর্তৃক আরাকানে সর্বপ্রথম একটি স্বাধীন রাজ্য পত্তন করা হয়, যার রাজধানী গা-সা-বা নদী বর্তমান নাম কালাদন নদীর তীরবর্তী ধান্যাওয়াদী নামক স্থানে স্থাপন করে এবং এই রাজবংশকে ধান্যাওয়াদীর প্রথম রাজবংশ হিসেবে জানা যায়। এই রাজ্যের গোড়াপত্তন ২৬৬৬ খ্রিষ্টপূর্বে হয়েছিল বলে ধারণা করা হয় এবং এই বংশের রাজাগণ বংশপরম্পরায় ১৮০০ বছরকাল আরাকানে রাজত্ব করেন।

ডেঙ্গ্যাওয়াদীতে ম্রো রাজবংশ পতনের বহু বছর পর পুনরায় ৯৫৭ খ্রিষ্টাব্দ হতে ৯৬৪ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত ম্রো রাজাগণ আরাকানের শাসনভার গ্রহণ করেন। স্যার আর্থার ফেইরি তাঁর বিখ্যাত 'বার্মার ইতিহাস' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, "৯৫৭ খ্রিষ্টাব্দে মিয়ো ম্রো গোত্র প্রধান আম্যাথু সুলতইঙ্গচন্দ্রকে উৎখাত করে আরাকান সিংহাসন দখল করেন এবং তিনি ও তার ভ্রাতুষ্পুত্র পাই-পাইউ ৯৬৪ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। পাই-পাইউ'কে পদচ্যুত করে ৯৬৪ খ্রিষ্টাব্দের শেষার্ধে আরাকানের ভূতপূর্ব রাজা সুলতইঙ্গচন্দ্রের পুত্র নাগপিন্নগটন পুনরায় আরাকানের সিংহাসন দখল করেন।"

ম্রো আদিবাসী

ম্রোরা চতুর্দশ শতাব্দীতে আরাকানে সহিংসতা বাধলে পুনরায় পার্বত্য চট্টগ্রামে আসেন। আরাকানিদের ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, একসময় আরাকান রাজ্যের রাজা মৃত্যুবরণ করলে গোটা আরাকান রাজনৈতিক চরম সংকটে পতিত হয়। তখন দ্বিপক্ষীয় অবস্থান শক্তিশালী করার লক্ষে পার্শ্ববর্তী অন্যান্য ক্ষুদ্র-মাঝারি জনগোষ্ঠীদের ছলে-বলে-কৌশলে নিজেদের পক্ষে নিয়ে আসতে প্রচেষ্টা চালায়। পরিণামে গোষ্ঠীর দাঙ্গার সূত্রপাত ঘটে। এ সুযোগে সেন্দুজ, খুমী ও অন্যান্য শক্তিশালী জনগোষ্ঠীরা ক্ষুদ্র ও দুর্বল জনগোষ্ঠীদের উপর অত্যাচার ও সম্পত্তি লুটপাট করতে থাকে। তখন খুমী জনগোষ্ঠীরা ম্রোদের উপর অমানবিক অত্যাচার ও সম্পত্তির লুটপাট করতো বলে আরাকানী ইতিহাসে জানা যায়। আরাকানে কুলাডন নদীর অববাহিকায় ম্রো ও খুমীদের এক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হয়। এই রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের কাহিনি আরাকান ইতিহাসের এক বিরল ঘটনা। খুমীদের আক্রমণের কাহিনি নিয়ে ম্রো সমাজে বহু কিংবদন্তি ও লোককাহিনি রয়েছে।

ম্রোদের উপর খুমীদের আক্রমণের কাহিনি বিভিন্ন লেখক ও গবেষকদের গ্রন্থ থেকে পাওয়া যায়। ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টার-এর মতে "ম্রো (মুরুং) নামে একটি জনজাতি যারা পূর্বে আরাকান হিলস্-এ বাস করতো তারা প্রধানত এখন পার্বত্য চট্টগ্রামের সাঙ্গু নদীর পশ্চিমে এবং মাতামুহুরী নদী বরাবর বাস করে। তারা নিশ্চিত করে যে, খুমীরা তাদেরকে আরাকান থেকে বিতাড়িত করে। অনেক বছর আগে খুমীদের সাথে তাদের এক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হয়। ...মুরুংরা বর্তমানে বোমাং রাজার প্রজা।"

এ সম্পর্কে বিশিষ্ট লেখক ও গবেষক স্যার আর্থার ফেইরি তাঁর বিখ্যাত 'বার্মার ইতিহাস' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, "এটা একটি জনজাতি বর্তমানে তাদের প্রাচীন রাজ্য থেকে কমে গেছে। তারা এক সময় কোলদান নদী ও এর উপ-নদীতে বসবাস করতো, কিন্তু খুমী জনজাতি কর্তৃক ধীরে ধীরে বিতাড়িত হয়েছিল। তারা সেখান থেকে পশ্চিমে স্থানান্তর হয়েছিল এবং আরাকান ও চট্টগ্রাম সীমান্তবর্তী এলাকায় বসতি গড়ে তোলে।"

ভারতের মিজোরামের প্রখ্যাত লেখক মি. ভামসন-এর মতে, ম্রোরাই পার্বত্য অঞ্চলে সর্বপ্রথম আগমন করেছে। তিনি তাঁর বিখ্যাত 'জো ইতিহাস' নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, "মাসুরা (ম্রো) ছিল এই অঞ্চলগুলোতে আসা প্রথম জনগোষ্ঠী। তারা একাদশ শতাব্দীতে আরাকানের উত্তর ও জো রাজ্যের দক্ষিণাঞ্চলে বসতি স্থাপন করে। জনৈক মাসু চতুর্দশ শতাব্দীতে আরাকানের রাজা ছিল। তারা শক্তিশালী ছিল বলে জানা যায়। খুমীরাও সেখান থেকে আসে এবং দু'শত বছর ধরে কোলদান নদীর উপত্যকায় তারা মাসু জনগোষ্ঠীর সাথে একত্রে বাস করে। কালক্রমে মাসুরা দুর্বল হয়ে পড়ে এবং তাদের একটা অংশকে খুমীরা সেখান থেকে বিতাড়িত করে যারা আরাকানের পশ্চিমে চলে যায়।"

ম্রো সমাজে একক ও যৌথ পরিবার প্রথা রয়েছে। ম্রোদের সমাজব্যবস্থা পিতৃসূত্রীয়। তাই পরিবারের কর্তা সাধারণত পিতাই হয়ে থাকে। সংসারে সুখ-দুঃখ, কেনাকাটা, অসুখ-বিসুখ, আয়-ব্যয়, উৎসব-বিবাহ, পূজা-পার্বণ ইত্যাদি কাজে পিতাই মূল ভূমিকা পালন করে থাকে। আর কোনো পরিবারে যদি পিতা না থাকে তাহলে বড় ভাই বা বড় ছেলে কর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করে থাকে। পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় ম্রোদের বংশপরিচয় পিতৃধারায় নির্ধারিত হয়ে থাকে। কোনো তালাকপ্রাপ্ত বা বিধবা নারী পুনরায় বিবাহ করলে ও পূর্বের স্বামীর ঔরষজাত সন্তানরা তার সাথে থাকলে দ্বিতীয় স্বামীর গোত্র পরিচয়ে পরিচিতি লাভ করবে।

ম্রোদের অর্থনীতি প্রধানত আত্মপোষণমূলক অর্থনীতি। নিজেদের প্রয়োজন মেটানোর জন্য ফসলাদি উৎপাদন করে। তবুও আজকাল ম্রোরা ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যেও ফসল উৎপাদন করে। বিশেষ করে বিভিন্ন ফলমুল যেমন- কলা, আদা–হলুদ, তিল, কাঁঠাল, পেঁপে ইত্যাদি উৎপাদন করে বাজারে বিক্রি করে। ম্রোরা সাধারণত দুর্গম ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে বাস করে। দুর্গম ও বন্ধুর পথ পেরিয়ে বাজারে উৎপাদিত পণ্যসামগ্রী নিয়ে আসাও কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।

ম্রো জনগোষ্ঠীর জীবন-জীবিকার মূল ভিত্তি প্রধানত ঐতিহ্যবাহী জুমচাষ। ম্রোরা যেহেতু পাহাড়ি ভূমিতে বসবাস করে সেহেতু তাদের সমতল আবাদী জমি নেই বললেই চলে। স্বাভাবিকভাবে জুমচাষই তাদের জীবন-জীবিকার প্রধান অবলম্বন। নির্দিষ্ট ঋতুতে ও মৌসুমে জুমচাষ আরম্ভ করতে হয়। সময়ের তারতম্য ঘটলে আশানুরূপ ফসল ফলানো সম্ভব হয়ে ওঠে না।

ম্রোরা একটি নির্দিষ্ট সীমানার মধ্যে জুমচাষ করে। অনেক সময় গ্রাম হতে অনেক দূরে জুমচাষ করলে তখন সমস্ত পরিবার সাময়িককালের জন্য জুমক্ষেতে চলে যায়। ফসল উত্তোলন শেষ হলে পুনরায় গ্রামে ফিরে আসে। কেউ যদি একস্থান থেকে অন্যত্র চলে যায়, তাহলে গ্রামের লোকদের সাথে আলোচনা করে নির্ধারিত সীমানায় বসবাস করে। ভূমি বন্টনের ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা গ্রামের কারবারির। নতুন স্থানে নতুন বসতি স্থাপন করলে নতুনভাবে জুমভূমি বন্টন করতে হয়। পাড়ার কারবারি গ্রামের সবাইকে ডেকে একটি সভা আহ্বান করে সবার মতামত নিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সিদ্ধান্ত মোতাবেক গ্রামের সীমানার গণ্ডির মধ্যে জুমচাষযোগ্য ভূমি গ্রামের প্রত্যেক পরিবারকে

সমানভাবে বন্টন করে। এমনভাবে জুমভূমি বন্টন করা হয়, পর্যায়ক্রমে সকল পরিবার পাশাপাশি বছরের পর বছর, যুগের পর যুগ জুমচাষ করতে পারে।

ম্রো সমাজে এ পর্যন্ত ভূমি নিয়ে তেমন বড় ধরনের বিরোধ দেখা যায়নি। কারো দখলকৃত জায়গায় কেউ যদি জুমচাষ করতে ইচ্ছে করে, তাহলে এক বোতল মদ ও একটি মোরগ মালিককে উপঢৌকন দিয়ে অনুমতি নেয়ার রীতি রয়েছে। তখন অবশ্যই কারবারি ও সমাজপতিদের ডেকে সম্মতি নেয়া হয়। সাধারণত এক বছরের জন্য ভূমি ব্যবহারের অনুমোদন দেওয়া হয়। এসব চুক্তি সম্পাদিত হয় মৌখিকভাবে। আনীত উপঢৌকন সভায় উপস্থিত সবাই মিলে আহার ও পান করে। আর যদি অন্য কোনো গ্রামের সীমানার ভেতর জুমচাষ করতে ইচ্ছা হয়, তাহলে অনুরূপভাবে জুমভূমির মালিককে নিয়ে উপঢৌকনসহ ঐ গ্রামের কারবারির ঘরে গিয়ে অনুমতি নিতে হয়। গ্রামের কারবারি সামনে জুমের মালিক অনুমতি দিলে জুমচাষ করতে পারে। জুমচাষের জন্য প্রথমে চাষোপযোগী পাহাড়ের অংশ বেছে নেয়া হয়। জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ও মার্চ মাসে জুমচাষের জন্য জঙ্গল পরিষ্কারকরণ প্রক্রিয়া শুরু করে। গাছপালা, তৃণলতা-গুল্ম কেটে রোদে শুকানোর পর পুড়িয়ে ফেলা হয়। আগুনে পোড়ানোর ছাঁই সার হিসেবে কাজ করে।

জুমচাষে কোনো হালের প্রয়োজন হয় না। পুরোনো দা বা শাবল দ্বারা মাটিকে সামান্য আলগা করে ফসলের বীজ বপন করতে হয়। ধানের সাথে তুলো, বরবটি, তিল, যব, মিষ্টি কুমড়া, বেগুন, মরিচ, ঢেরস ও নানা রকমের শাকসবজির বীজ একসাথে মিশিয়ে বপন করা হয়। একবার জুমচাষ করার পর জমির উর্বরতা শক্তি বৃদ্ধির জন্য সেই পাহাড়কে কমপক্ষে ৫ থেকে ১০ বছর অনাবাদী অবস্থায় রাখতে হয়।

পতিত পাহাড়ের জমিতে চাষ করা হয় বলে জুমচাষে কোনো সার প্রয়োগ ও সেচের ব্যবস্থার প্রয়োজন হয় না। শুধু গজিয়ে ওঠা আগাছাগুলো নিড়ানি ও দা দিয়ে কেটে ফেলা হয়। বিভিন্ন ফসলের বীজ একসাথে বপন করা হলেও ফলন পাকে এককে সময় এবং তদনুসারে ফসল তুলতে হয়। কিন্তু বর্তমানে জনসংখ্যার চাপ, জুমচাষের ক্ষেত্র সংকুচিত হয়ে আসা, জুমচাষের মধ্যবর্তী বিরতিকাল হ্রাস পাওয়া ও সর্বোপরি জমির উর্বরতা শক্তি কমে যাওয়ার ফলে জুমচাষে আগের মতো ফলন পাওয়া যায় না। আগে যেখানে জুমচাষ করে সারা বছরের খোরাকি সংগ্রহ করা যেতো, এখন তা আর সম্ভব হয়ে ওঠে না। ফলে জুমচাষের মাধ্যমে জীবন-জীবিকা নির্বাহ করা ম্রোদের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়েছে।

ম্রো জনগোষ্ঠীর মধ্যে কেউ কেউ বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী, কেউ ক্রামা ধর্ম পালন করে, কেউ আবার সনাতন রীতিও অনুসরণ করে। কিছু কিছু ম্রো লোকজন ইতোমধ্যে খ্রিষ্টান ধর্মও গ্রহণ করেছে। ম্রো জনগোষ্ঠীর সাধক পুরুষ মেনলে ম্রোর ক্রামা ধর্ম প্রবর্তনের পর অধিকাংশ ম্রো ক্রামা ধর্ম পালন করে। মেনলে ম্রো গত শতাব্দীর আশির দশকে এই ধর্ম প্রচার করেন। তিনি ম্রো জনগোষ্ঠীর জন্য ম্রো বর্ণমালাও আবিষ্কার করেন। তবে বিভিন্ন গোষ্ঠী বিভিন্ন ধর্ম পালন করলেও ম্রোরা সকলেই এখনো প্রকৃতি পূজা

করে। বিশেষ করে জুমচাষকে কেন্দ্র করে প্রকৃতির সাথে সম্পর্কীয় দেবদেবীকে ম্রোরা এখনো পূজা করে থাকে।

ত্রিপুরা জাতি পরিচিতি

পার্বত্য চট্টগ্রামে ১০ ভাষাভাষী ১১টি জনগোষ্ঠীর মধ্যে ত্রিপুরা অন্যতম। এই জনগোষ্ঠীর মূল আবাসভূমিও ত্রিপুরা নামে পরিচিত। ত্রিপুরা জাতি ভারতীয় উপমহাদেশের এক প্রাচীন জাতি। পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন জেলা ব্যতীত ত্রিপুরারা সমতল এলাকার কুমিল্লা, সিলেট, চাঁদপুর, রাজবাড়ি, ফরিদপুর ইত্যাদি অঞ্চলেও বসবাস করে। ত্রিপুরা রাজ্য ছাড়াও ভারতের মিজোরাম, আসাম প্রভৃতি রাজ্যে ত্রিপুরা জনগোষ্ঠী বসবাস করে। বর্তমানে ত্রিপুরাদের অবস্থা প্রান্তিক হলেও এককালে তারা ভারতবর্ষে এক পরাক্রমশালী জাতি হিসেবে স্বাধীন সার্বভৌম ত্রিপুরা রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলো। এ জাতির ১৭৮ জন মহারাজা একটানা ১৩৬৪ বছর ত্রিপুরা রাজ্য শাসন করেছিলো। ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, ত্রিপুরা রাজাদের রাজত্বকাল ২০০০ বছরেরও অধিক সময়। এ জাতির ভাষা, শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি, ইতিহাস ও ঐতিহ্য সমৃদ্ধ।

ত্রিপুরারা সাধারণত পাহাড়, বন ও প্রকৃতিকে আপন করে বসবাস করে। জীবন জীবিকার তাগিদে, পেশাগত ও অন্যান্য কারণে ত্রিপুরারা দুর্গম পাহাড় অঞ্চলে বসবাস করে থাকে। পার্বত্য চট্টগ্রামের ত্রিপুরাদের বসতিও অধিকাংশই পাহাড় বনাঞ্চলের গহীন এলাকায়। গোমতি, চেঙ্গি, মাতামুহুরী, মাইনী, শংখ, কর্ণফুলি প্রভৃতি নদীর অববাহিকায় ত্রিপুরাদের বসতি রয়েছে। বাংলাদেশের অপরাপর অঞ্চল যেমন সিলেট, কুমিল্লা, চট্টগ্রামের বিভিন্ন উপজেলায় বসবাসরত ত্রিপুরা জনগোষ্ঠীর লোকও অধিকাংশ পাহাড়ের উপরে বসবাস করে। ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য, আসাম ও মিজোরামে বসবাসকারী ত্রিপুরা জনগোষ্ঠীরও অধিকাংশ পাহাড়ি অঞ্চলে। বর্তমানে ত্রিপুরা জনসংখ্যা প্রায় দুই লাখের কাছাকাছি।

জাতি হিসেবে 'ত্রিপুরা' নামের উৎপত্তি নিয়ে বেশ কয়েকটি মতবাদের প্রচলন আছে। অনেকে বলেন, 'তোয়প্রা' থেকে ত্রিপুরা নামের উৎপত্তি। 'তোয়' মানে পানি বা নদী আর 'প্রা' মানে সঙ্গমস্থল বা মোহনা। ধারণা করা হয় যে, ব্রহ্মপুত্র, শীতলক্ষা ও ধলেশ্বরী নদীর মোহনায় এক সময় ত্রিপুরা জনগোষ্ঠীর লোকেরা বসবাস করছিলো এবং রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলো। এই তিন নদীর মোহনা বা 'তোয়প্রা' অপভ্রংশ হয়ে পরবর্তীকালে 'ত্রিপুরা' নামটি জাতির নাম হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলো। ত্রিপুরা রাজন্যবর্গ ইতিহাস গ্রন্থ 'রাজমালা'তেও এর উল্লেখ আছে। মহারাজা বীরচন্দ্র মানিক্যের সমসাময়িক রাজমালা গ্রন্থের লেখক কৈলাস চন্দ্র সিংহ-এর মতে ত্রিপুরা নামের সাথে কক্‌বরক ভাষার দুটি শব্দ জড়িত রয়েছে। শব্দ দুটি হলো 'তোয়' ও 'প্রা'। কক্‌বরক ভাষায় তোয় অর্থ পানি আর প্রা অর্থ মোহনা বা নিকটে। তাঁর মতে কোনো এক সময়ে ত্রিপুরা রাজ্যের সীমানা সমুদ্রসীমা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিলো। সেজন্য এই রাজ্যের নাম ত্রিপুরা হয়েছে। রাজ্যের নামানুসারে পরবর্তীকালে জনগোষ্ঠীর নাম হয় ত্রিপুরা।

ত্রিপুরা আদিবাসী রমণী

ত্রিপুরা জনগোষ্ঠীর ইতিহাস অনুসন্ধানে জানা যায়, আনুমানিক ৬৫ খ্রিষ্টাব্দে দুই বংশের সময়কালে পশ্চিম চীনের ইয়াংসি ও হোয়াংহো নদীর উপত্যকা হচ্ছে ত্রিপুরাদের প্রাচীন আবাসস্থল। পরবর্তীকালে এই জনগোষ্ঠী ভারতের আসাম হয়ে বর্তমান বসতি অঞ্চলে আবাস গড়ে তোলে এবং রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে বলে ইতিহাস সূত্রে জানা যায়। আরাকান রাজ্যের প্রাচীন ইতিহাস 'রাজোয়াং' গ্রন্থে ত্রিপুরা রাজ্যকে 'ম্রুরতন' ও 'পাটিকারা' নামে অভিহিত করা হয়েছে। মনিপুরী রাজ্যের ইতিহাসে 'তকলেঙ' অভিহিত করা হয়েছে। ভারতের প্রাচীন ইতিহাস লেখকগণ ত্রিপুরা রাজ্যকে 'জাজিনগর' নামে আখ্যায়িত করেছিলেন। ইংরেজরা 'টিপেরা' এবং পর্তুগিজরা 'টিপোরা' নামে আখ্যায়িত করেছিলেন। ত্রিপুরারা হিন্দু ও খ্রিষ্টান ধর্মের অনুসারী। তারা পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় বিশ্বাসী।

বম জাতি পরিচিতি

জাতি বৈচিত্র্যের এক সমৃদ্ধ অঞ্চল আমাদের এই পার্বত্য চট্টগ্রাম। পার্বত্য চট্টগ্রামের রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান এই তিন জেলার বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীর নানা সংস্কৃতির এমন বৈচিত্র্যপূর্ণ সম্ভার আমাদের অহংকার। ভিন্ন ভাষাভাষী আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মধ্যে বম জনগোষ্ঠী একটি অন্যতম নৃগোষ্ঠী। বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম ছাড়াও ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে এবং মায়ানমারের চিন প্রদেশে বম জনগোষ্ঠীর বসবাস রয়েছে। ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চল রাজ্যগুলোর মধ্যে বম জনগোষ্ঠীর বসবাস রয়েছে মনিপুর ও মিজোরাম রাজ্যগুলোতে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের বান্দরবান পার্বত্য জেলার রুমা, থানচি, রোয়াংছড়ি ও বান্দরবান সদর উপজেলায় এবং রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার বিলাইছড়ি উপজেলায় ৭০টি গ্রামে বমরা বসবাস করে। সরকারি পরিসংখ্যানে বম জনগোষ্ঠীর পূর্ণাঙ্গ তথ্য পাওয়া যায় না। ১৯৯১ সালের আদমশুমারিতে বম জনগোষ্ঠীর মোট জনসংখ্যা ৬,৯৭৮ জন বলে উল্লেখ রয়েছে। তবে বমরা সরকারি পরিসংখ্যান যথাযথ নয় বলে মনে করে। ২০০৩ সালে বম সোশাল কাউন্সিল বাংলাদেশ কর্তৃক পরিচালিত জরিপ অনুসারে বম আদিবাসীর জনসংখ্যা ৯,৫০০।

বম আদিবাসী কুকি-চিন ভাষাভাষী মঙ্গোলীয় গোষ্ঠীভুক্ত। 'বম' শব্দের অর্থ বন্ধন, মিলন, পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত, একত্রীভুক্ত, এক করা বা হওয়া। আদিম প্রথার জীবন প্রণালি যেমন বন্যপ্রাণী শিকারের জন্য একস্থান হতে অন্যস্থানে পরিভ্রমণ, গোত্রীয় প্রাধান্যের লড়াই, উপগোত্রীয় দ্বন্দ্ব ও যুদ্ধ প্রভৃতির কারণে তারা বিভিন্ন কালে দলচ্যুত বা বিচ্ছিন্ন হয়ে গহীন অরণ্যে আর দূর-দুর্গম পাহাড়-পর্বতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়েছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্তির ফলে তারা খুবই দুর্বল হয়ে পড়েছিল। তাই ক্রমে ক্রমে দুর্বল ও সংখ্যায় কমতে থাকা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলকে একত্রীভুক্ত করা বা সংযুক্তকরণের ফলে 'বম' শব্দের প্রচলন। আচার-অনুষ্ঠান, রীতিনীতি, আহার-পানীয়, সংগীত-নৃত্য ও পূজা-পার্বণ ইত্যাদি প্রায়ই একরূপ সেই গোত্র বা গোষ্ঠী অখণ্ডভাবে বা একটি সমষ্টিগতভাবে এককরূপে নিজেদের আখ্যায়িত করার ফলে 'বম' শব্দের উৎপত্তি বলে ধারণা করা হয়।

ব্রিটিশ ও অন্যান্য লেখকেরা বমদের বিভিন্ন নামে অভিহিত করেছেন। যেমন- বনজো (বুকানন ১৭৯৮), বনযোগী (ম্যাক্রোয়া ১৮০১), বুনজোস (বারবে ১৮৪৫), বৌন-জুস এবং বৌনজিস (পিয়ারে ১৮৪৫)। আরও অনেকে যেমন- লুইন, ম্যাকেঞ্জি, ওয়ে, রিবেক, হাচিনসন, মিলস্‌, লেভি স্ট্রাউস, বাসানেত, বারনোটস প্রমুখ লেখকের মধ্যে বনযোগী বা বানযোগী (বার্বি), বম ও বম-জো (লোরেন ১৯৪০), বোম-লাইজো এবং বোম (বারনোটস), বোম-জৌ (লোফটার, ১৯৫৯), বনযোগী এবং বোম (সোফার, ১৯৬৪), বম (ওলফ্‌গং মে, ১৯৬০) আর বোম (প্রামাণিক) শব্দটি উল্লেখ করেছেন। Banjoogee, Banjoos, Bounjous, Bounjwes, Banjogis, Banjogies ইত্যাদির বহুরূপী ইংরেজি বানানের বাংলা 'বনযোগী'। এই বনযোগীই বমদের বেলায় সর্বাধিক ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। হাচিনসন (১৯০৬ : ১৫৯) এর ব্যাখ্যায় "The name Banjogi is derived from 'ban' a forest, and 'jogi' wanderer" তার অর্থ forest wandering tribe। 'বন' (Ban) এবং 'যোগী' (Jogi) শব্দ দুটির কোনটি বমদের নিজস্ব নয়। একটি নির্দিষ্ট সম্প্রদায়কে বিবিধ নামে অভিহিত করার ঐতিহাসিক কারণ হয়তো আছে তবে Bawm, Bom, Bom-Zo, Bawm-Zo, Zo, Lai, Laimi (বানানের প্রকারান্তরে) ছাড়া অন্য নামগুলো নিজেদের বেলায় কখনো ব্যবহার করেনি।

ঐতিহ্যবাহী পোশাকে বম আদিবাসী তরুণী

বমরা শুনথ্লা (Sunthla) এবং পাংহয় (Panghawi) এই দুটি গোত্রে বিভক্ত। এই দুই প্রধান প্রধান গোত্রের আবার অনেক উপদল ও গোত্র রয়েছে যেমন :

গোত্র	উপদল
শুনথ্লা (Sunthla)	জাহাও, জাথাং, চিনজা, লনচেও, চেওরেক, সিয়ারলন, সানদৌ, তেনু, বয়তে্লাং, থিলুম, ভানদির, লনসিং, লাইতাক, চেওলাই, দয়তে্লাং, হাওহেং, তৌনির, লালনাম, থেলয়াথাং, মিলাই, মারাম, থাংতু, রুয়াললেং, ক্ষেংলত, লেইহাং, আইনে, লাইকেং
পাংহয় (Panghawi)	সাইলুক, পালাং, রোখা, সাতেক, রুপিচাই, সাখং, তিপিলিং, সামথাং, থাংমিং, সাংলা, কমলাউ, সাহু, পংকেং, লেংতং, নাকো, আমলাই, থাংথিং, বুইতিং, ডেমরং, তালাকসা, মিলু, চারাং, খুয়ালরিং, সানথিং, রেমপেচে, মিত, ইচিয়া, কংতোয়া

ইদানীং বমরা তাদের নামের আগে বা পরে গোত্রের নাম লিখতে শুরব করেছেন যেমন– এস লনচেও, জির কুং সাহু, জুয়ামলিয়ান আমলাই ইত্যাদি। বিশিষ্ট দুই বম নেতা পার্দো এবং দৌলিয়ান তাদের নামের পূর্বে গোত্রীয় নাম লেখার প্রচলনের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। যেমন– পার্দো লেখেন-এস এল পার্দো, এস এল মানে সাইলুক আর দৌলিয়ান লেখেন– এল দৌলিয়ান। এল মানে লনচেও। নামের আগে গোত্রের নাম ব্যবহারের চেয়ে নামের পরে গোত্রের নাম ব্যবহার জনপ্রিয় হচ্ছে।

বম পরিবারের প্রধান ব্যক্তি হলেন পিতা। পিতার দিক থেকেই সন্তানদের বংশ গণনা করা হয়। বমদের একই গোত্রে বিয়ে হয় না। নিজেদের গোত্রের বাইরে বিয়ে করতে হয়। বিয়ের ব্যাপারে ছেলে মেয়েরা মা-বাবার সিদ্ধান্তই মেনে নেয়। তাদের মধ্যে বিধবা বিয়ের প্রচলন আছে। নারীরা সংসারের সকল কাজ করেও পুরুষদের কাজে সহায়তা করেন। জুমচাষ, কাঠকাটা ও কাঠ সংগ্রহেও তারা সহায়তা করেন। মেয়েদেরও হাট-বাজারে বেচা-কেনা করতে দেখা যায়।

বম সমাজের প্রাচীন রীতি-নীতি, প্রথা ও ঐতিহ্যের সমন্বয়ে বম সমাজের নেতৃবৃন্দ সর্বসম্মতভাবে ১৯৮৫ সালে বম সোস্যাল কাউন্সিল গঠন করে। নিজেদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ গ্রামেই সালিশের মাধ্যমে মীমাংসা করা হয়। সামাজিক বিচার-শালিসের জন্য 'বম ডান বু' নামে বম সমাজ একটি আইনের বই প্রকাশ করেছে। এই বইয়ের আইনী নিয়মনীতি তারা কঠোরভাবে মেনে চলে। বমরা স্বভাবে বিনম্র। তাদের মোলায়েম ভাষায় বিশ্রীরকম গালাগালের শব্দটি পর্যন্ত অনুপস্থিত। নিজেদের মধ্যে হাতাহাতি, চুলাচুলি বা মারামারির ঘটনা বিরল। তাদের সামাজিক ব্যবস্থার ভিত্তিও খুবই সুদৃঢ়। সামাজিক আচার-আচরণ, বিচার-শালিস এবং বিবাদ মীমাংসার জন্য যে সামাজিক অবকাঠামো রয়েছে তা অত্যন্ত প্রাণময়, নির্মল যা সামাজিক সংহতি রক্ষণে, ঐক্য ও কল্যাণ সাধনে বম সমাজকে সঞ্চারিত করে এবং সামগ্রিকভাবে সামাজিক আচরণ ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বম সমাজের কেউ এই যাবত নিজেদের মধ্যে সংঘটিত কোনো বিবাদ মীমাংসার জন্য কোর্ট বা অন্য কোনো সরকারি সংস্থার শরণাপন্ন হয়েছে বলে জানা নেই। সামাজিক আচার-আচারণ, বিচার-শালিসব্যবস্থা পরিচালন ও নিয়ন্ত্রণের জন্য বম সম্প্রদায় ১৯৪৮ সালে প্রথম Bawm Dan Bu (Bawm Customary Law) নামে একখানি পুস্তিকা প্রণয়ন করে। একে বম সম্প্রদায়ের নিজস্ব সংবিধান বলা চলে। যার নির্দেশ বিনা বাক্য ব্যয়ে আপামর বম সম্প্রদায় মেনে চলে। এই সংবিধানটি সর্বশেষ ১৯৯৫ সালে সংশোধনী আকারে মুদ্রিত হয়। একটি জনগোষ্ঠীর সকল কৃষ্টি-সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও মূল্যবোধের শিকড় হচ্ছে এই সামাজিক আইন। সুষ্ঠু সুন্দর ও সুশৃঙ্খল সমাজব্যবস্থার জন্য প্রথাগত সামাজিক আইন। স্মরণাতীতকাল থেকে বম আদিবাসী জনগোষ্ঠী তাদের নিজস্ব এ প্রথাগত সামাজিক আইন দিয়ে জীবনধারা পরিচালনা করে আসছে। কিন্তু কালের বিবর্তন ধারার সাথে সময়োপযোগী পরিবর্তন না হওয়ায় এ প্রথাগত সামাজিক আইনসমূহ প্রয়োগে বিভিন্ন সমস্যা, সংকট দেখা দিচ্ছে।

কেউকারাডং পাহাড়ে বম আদিবাসীর গ্রাম

বমরা অরণ্যকে ভালোবাসে। ভুল করে হোক বা অন্য কোনো কারণে, যেন অনেকটা বোকার মতো ভালোবাসে। এই পাহাড়, এই অরণ্য সত্যিই সুন্দর, এই অরণ্যকে ঘিরে যে সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে তা আরও সুন্দর, নির্মল, প্রাণবন্ত এবং বৈচিত্র্যময়। প্রেম, সখ্য, অনুরাগ আর আনন্দ-উল্লাসের প্রকাশ পাহাড় ঝর্ণার পানি-অরণ্যের আকাশ মাটিতে যেন মিশে আছে। বম সমাজে প্রচলিত পুরাণ কাহিনি, প্রবাদ-প্রবচন, ছড়া, গীতিকা, সৃষ্টি তত্ত্বকথা ইত্যাদি খুবই উপজীব্য, অত্যন্ত জীবনঘনিষ্ঠ।

আদিবাসী বম জনগোষ্ঠী এককালে জড়োপাসক ছিল। জড়োপাসক বম জনগোষ্ঠীর মধ্যে ভূতপ্রেত, ঝাঁড়-ফুঁক, মন্ত্রতন্ত্র, ওঝা-বৈদ্য, জ্যোতিষবিদ্যার প্রতি বিশ্বাস ছিল। বমরা খুজিং- পাথিয়ানকে বিধাতা পুরুষ মানে। তিনি স্রষ্টা, তিনি কখনো রুষ্ট হন না, তিনি সদা কল্যাণময়ী, তাই বমদের খুজিং বা পাথিয়ান-এর প্রতি পূজা, যজ্ঞ বলিদান, অর্ঘ্য নিবেদন কিছুই করতে হয় না। কেননা তিনি কারও অমঙ্গল করেন না। যত পূজা, যজ্ঞ, অর্ঘ্য নিবেদন সবই অপদেবতার উদ্দেশ্যে। কারণ যত অকল্যাণ, জ্বরা, ব্যাধি, মৃত্যু, ফসলহানি, খরা, অনাবৃষ্টি, প্লাবন, মহামারী সবই তাদের কীর্তি। তাদের তুষ্ট বিধানের জন্যই যত পূজা-অর্চনা, যজ্ঞ, বলিদান, অর্ঘ্য নিবেদন আবেদনের আয়োজন। তদুদ্দেশ্যে হরেক রকমের বিচিত্র নিয়মকানুনের মাধ্যমে যে পূজা-অর্চনা-বলিদান তারই নাম 'বলশান' (Bawlsan) সমস্ত বলশানের পৌরহিত্য করেন 'বলপু' (Bawlpu)। ১৯১৮ সাল হতে বম জনগোষ্ঠী পর্যায়ক্রমে খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত হওয়াতে বর্তমানে এদের ধর্মীয় বিশ্বাসে পরিবর্তনের পাশাপাশি সামাজিক রীতিনীতিতেও উল্লেযোগ্য পরিবর্তন এসেছে।

বম পরিবারের প্রধান ব্যক্তি হলেন পিতা। পিতার দিক থেকেই সন্তানদের বংশ গণনা করা হয়। আগে বমদের একক কোনো রাজা ছিলেন না। তাদের প্রত্যেক গ্রামে একজন করে গ্রামপ্রধান থাকতেন। গ্রামপ্রধানকে বলা হতো 'লাল'। আগে গ্রামপ্রধান বা লাল যুদ্ধে বা শান্তি স্থাপনে নেতৃত্ব দিতেন। এছাড়াও বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সভায় সভাপতিত্ব করতেন। বমরা জাতে শিকারি। বছরের বেশিরভাগ সময় গভীর বনে শিকারে তাদের সময় কাটে।

বম জনগোষ্ঠীর প্রধান পেশা হলো আদিম প্রথায় জুমচাষ। পাহাড়ের খাড়া ঢালে জুমচাষে এক সময় খুব ভালো ফসল হতো। ধান, মরিচ, কার্পাস, তুলা ও তিলের ফলন ছিল খুব বেশি। কিন্তু সমস্যা হলো পাহাড়ে পরপর জুমচাষ করা যায় না। এক চাষের পর কমপক্ষে ৩ বছর পাহাড়কে বিশ্রাম দিতে হয়। তাই দিনে দিনে জুমচাষের পাহাড় কমে যাচ্ছে। বর্তমানে জুমচাষের পরিবর্তে ফলমূল উৎপাদনে অনেকে মনোযোগ দিয়েছেন। এতে চাষ হয় কলা, আনারস, পেঁপে, আদা, কচু, কাজুবাদাম, আম, কাঁঠাল ইত্যাদি। আবার অনেকে পাহাড় থেকে কাঠ সংগ্রহ করেন।

বমদের দৈহিক গঠন মাঝারি, পেশিবহুল। সুন্দর ও সুগঠিত তাদের শরীর। আচরণে তারা খুবই নম্র ও ভদ্র। তাদের মধ্যে গালাগালি ও মারামারি নেই বললেই চলে। বমরা চুপচাপ, কম কথা বলা, শান্তিপ্রিয় ও গোটানো স্বভাবের। তারা সমতলে খুব কম আসে। সংসারের দরকারি জিনিসপত্র কেনার জন্য বাজারে যাওয়া ছাড়া, গ্রামেই কাজের মধ্যে দিন কাটায়।

গভীর বন ও দুর্গম পাহাড়-পর্বতের উপর বমরা তাদের বাসগৃহ তৈরি করেন। তারা গভীর বন ও দুর্গম উঁচু পাহাড়ে থাকতেই ভালোবাসেন। বমরা বাসগৃহ তৈরির জন্য খুঁটি পুঁতে তার উপর পাটাতন তৈরি করেন। আর পাটাতনের উপর তৈরি করেন ঘর। আগে গ্রামের চারদিকে পাহাড়ের ঢালু ঘেঁষে শক্ত গাছের খুঁটি দিয়ে বেড়া দেয়া হতো। এর কারণ ছিল বাইরের শত্রু যাতে আক্রমণ করতে না পারে। রাতে রাস্তায় বিষাক্ত কাঁটা ছড়িয়ে রাখা হতো, যাতে শত্রুরা আসতে না পারে। এছাড়াও পাহাড়ের উপর বড় বড় পাথর জমা করে রাখা হতো। যাতে শত্রুর উপর পাথর ছুঁড়ে ফেলা যায়। বমরা উঁচু পাহাড়-পর্বতের চূড়ায় বা গা ঘেঁষে তৈরি করা এসব বাসগৃহ থেকে সমতলে উঠানামা করেন সহজেই। পাহাড়ি খাড়া এসব সরু পথে উঠানামা করা অন্যদের জন্য খুবই কষ্টকর।

পাংখোয়া জাতি পরিচিতি

প্রকৃতপক্ষে বম, পাংখোয়া এবং লুসাই এক, একই জাতি, গোষ্ঠী বলে অনেক গবেষকই মনে করেন। Capt. Lewin (1869 : 95) এবং Mackenzi (1989 Reprinted : 331) এদেরকে এক করে দেখেছেন। তাদের সামাজিক রীতি-নীতি, প্রথা, বিবাহ, পোশাক-পরিচ্ছদ, খাওয়া-দাওয়া, ঘরদোর অভিন্ন। তাদের পৃথক করে চেনার উপায় একটি- পুরুষদের মাথায় চুল খোপা বাঁধা। বম পুরুষ লোকেরা খোপা বাঁধা কপাল বরাবর উপরে, আর পাংখোয়া পুরুষ লোকেরা খোপা বাঁধে পিছনে।

এতদবিষয়ে Capt. Lewin এর বিবরণ :

"These tribes state themselves to be of common origin, sprung from two brothers; and the great similarity in their customs, habit and language. The great distinction between the Pankho and Bunjugee tribe is the mode of wearing the hair. The Pankhos bind their hair in a knot in the back of the head but Bunjugees ..... tie up their hair in a knot on the top of the head over the forehead." Mackenzie'র (১৮৮৪) ভাষায় : "The Bunjogies and Pankhos are of common origin; but the former, with the Shindus and Kumis, knot their hair over the forehead and are with them classed as Poe ...."

Hutchinson এর ভাষায় (1908 : 158-159) : Banjogis and Pankhos : These two tribes are very closely allied; in fact the only difference noticeable to the ordinary person is that the Banjogi dresses his hair in a knot on the top of the head, while the Pankho dresses his in a knot at the back of the head. Prof. Bessaignet (1958) একই কথা বলেছেন : "Banjogis are almost the same as Pankhoos in customs, habits and religion. The difference in their dialect is almost negligible. The only two main differences are that menfolk bind their hair in front and do not shave their forehead. The second difference is that they do not observe fast when a relative dies. They and the Pankhoos were generally known as KuKis so far, but now they object to this term."

পাংখোয়া নামের উৎপত্তির বিবরণ এভাবে পাওয়া যায় : "কোনো একসময়ে পাংহয় এবং শুনথ্লা (বমদের দুই প্রধান গোত্র) গোত্রীয় কতিপয় পরিবার কোনো এক পাহাড়ে বসতি স্থাপন করে। সেই পাহাড়ে বিরাট শিমুলতুলা গাছ। তারা ভিন্ন এলাকার বা গ্রামের লোকদের কাছে নিজেদের পরিচয় দিত "আমরা পাংখোয়ার লোক" বলে। 'পাং' অর্থ শিমুল গাছ আর 'খোয়া' অর্থ গ্রাম বা পাড়া। পরবর্তীতে সে পাড়ার লোকেরা 'পাংখোয়া' নামে পরিচিতি লাভ করে। তাদের উপগোষ্ঠীর (Sub-clan) নামগুলো পাংহয় এবং শুনথ্লা এই দুই প্রধান গোত্রেরই হুবহু যা বমরা ব্যবহার করে।

পাংখোয়া আদিবাসী

বর্তমানে বান্দরবান পার্বত্য জেলায় পাংখোয়াদের পৃথক কোনো গ্রাম নেই। সংখ্যাগরিষ্ঠ বমদের সাথে মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছে। জাতিগোষ্ঠী গোত্র আদি ইতিহাস ঘাটাঘাটি ছাড়া তাদেরকে আলাদা গণ্য করা এক প্রকার আর সম্ভব নয়। পার্বত্য বান্দরবান জেলায় পাংখোয়াদের জনসংখ্যা আনুমানিক ৫০/৬০ জন।

বম, পাংখোয়া এবং লুসাই (Lushai) নামকরণের উৎপত্তি সম্পর্কে নানান ব্যাখ্যা বিদ্যমান। ইংরেজরা বাংলাদেশের শাসনভার কুক্ষিগত করার পর সমতল এলাকার বাঙালিদের মাধ্যমে ইংরেজরা লুসাইদের সংস্পর্শে আসে। বাঙালিরা পার্বত্য আদিম লোকদের 'কুকি' বলে পরিচয় দিত। 'কুকি' একটি vague term। পার্বত্য আদিম লোকদের সাথে যখন নিবিড় সম্পর্ক স্থাপন করে তখন জানতে পারে যে 'কুকি' এদের অপরিচিত শব্দ, নিজেদের বেলায় এই শব্দ কখনো ব্যবহার করেনি। সর্বপ্রথম ব্রিটিশরা Loosye term/শব্দ ব্যবহার করেন। পরবর্তীকালে 'LUSHAI' প্রচলন করেন। Lu অর্থ মাথা Shai অর্থ to shoot। এই অর্থে Lushai মানে দাঁড়ায় head hunter। অন্যত্র Sai মানে লম্বা। প্রকৃতপক্ষে Lusei বানানের প্রকারান্তরে Lushai রা মিজো অথবা জৌ (mizo/zo) জাতিগোষ্ঠীর এক উপদল বা গোত্র। মিজো হলো collective term। শাব্দিক বিশ্লেষণে Mi মানে মানুষ আর zo অর্থ পাহাড়। Liangkhaia (1951), Vanchhunga (1955) Ges Zatluanga প্রমুখরা মিজো (mizo) জাতিগোষ্ঠীকে ৬টি গোত্রে/দলে বিভক্ত করেছেন।

ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠার পূর্বে বর্তমান মিজোরাম সম্পর্কে লোকেরা খুব কমই জানতো। ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠার পরবর্তী সময় থেকে 'Lushai Hills' এর নাম বাইরের মানুষের কাছে পরিচিতি লাভ করে। বর্তমানের মিজোরাম আসামের একটি district যা 'Lushai Hill District' নামে পরিচিত ছিল। এই Lushai District নামকরণ নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি হয়। কেননা সেখানে শুধু Lushai-রা বসবাস করেনা, অন্যান্য আরও ethnic groups বসবাস করে যারা Lushai গোত্রের নয়। তার জন্য ১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দে এর নাম পরিবর্তন করে 'Mizo Hill District' করা হয়। পরবর্তীকালে ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দে Union territory মর্যাদা পায়, পরে ১৯৮৭ খ্রিষ্টাব্দে পূর্ণাঙ্গ অঙ্গরাজ্যের মর্যাদা লাভ করে। রাজ্যের নাম হয় মিজোরাম 'Mizoram' অন্যান্য গোত্রের উপর প্রাধান্য বিস্তারকারী শক্তিশালী গোত্র লুসাইরা ব্রিটিশদের উপর প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়। খ্রিষ্টধর্ম প্রচারকারী মিশনারিদের উপরও লুসাইদের প্রভাব লক্ষণীয়।

বম, লুসাই ও পাংখোয়াদের আদি উৎস (Roots and origin of the Bawm tribe) সম্বন্ধে হরেক প্রকারের কাহিনি প্রচলিত আছে। কথিত আছে, চীনের কোনো এক স্থানে অবস্থিত চিনলুং নামক স্থানের গুহা বম, পাংখোয়া ও লুসাইদের আদি উৎস স্থান। এই গুহা থেকেই তারা এসেছে। বান্দরবান জেলা শহর থেকে ৭ কি.মি. দূরের বমদের একটি গ্রামের নাম চিনলুং রেখেছে এ কাহিনি স্মরণার্থে হয়তো বা। শুধু বাংলাদেশে বসবাসরত বম, পাংখোয়া, লুসাই নয় ভারত ও মায়ানমারের 'জৌ' সকলেই চিনলুং নাম উচ্চারণ করে যারা নিজেদের চিনলুং গুহা থেকে আগত জাত বলে তারা সকলেই 'জৌ'/জো (Zo)।

এই চিনলুং পর্বতমালা থেকে দক্ষিণমুখে তাদের এই যাত্রা (Movement) হয়তো অনেক যুগ সময় লেগেছিলো। বার্মার (মিয়ানমার) দিকে যাত্রার পথে এরা দু'ভাগ হয়ে যায়। একদল সরাসরি দক্ষিণ দিকে গিয়ে Chindwin এবং Irrawaddy মধ্যবর্তী স্থানে আসে, অপর দলটি দক্ষিণে এসে পশ্চিমে অগ্রসর হয়ে বর্তমান মিজোরামে গিয়ে পৌঁছে Chindwin। বর্তমান স্থানে বমদের আগমন সপ্তদশ দশকে। Francis Buchanan তার দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় কুমিল্লা, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামে তার ভ্রমণ বৃত্তান্তে চমৎকার ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ করেছেন। তিনি ১৮ই এপ্রিল ১৭৯৮ খ্রিষ্টাব্দে বাজালিয়া (বোমাং হাট) নামক স্থানে তাবু খাটিয়ে অবস্থানকালে ৬ জন 'জৌ' নারী-পুরুষের দেখা পান। তিনি তাদের বেশ কয়েকটি ভাষা/শব্দ রেকর্ড করেন যার সবগুলি বম, পাংখোয়া বা লুসাইদের তথা 'জৌ' শব্দ।

প্রকৃতপক্ষে বম, পাংখোয়া এবং লুসাই এক, একই জাতি গোষ্ঠী। Capt.Lewin (1869 : 95) এবং Hutchinson (1908 : 158-159) এদেরকে এক করে দেখেছেন। তাদের সামাজিক রীতিনীতি, প্রথা, বিবাহ, পোশাক-পরিচছদ, খাওয়া-দাওয়া, ঘরদোর অভিন্ন।

লুসাই জাতি পরিচিতি

বান্দরবান পার্বত্য জেলায় এগারোটি জাতিসত্তার মধ্যে লুসাই অন্যতম। লুসাইরা বান্দরবান ও রাঙ্গামাটি জেলায় বসবাস করে। তবে ভারতে মিজোরাম নামে লুসাইদের একটি রাজ্য রয়েছে। এই রাজ্যটি ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠার পরবর্তী সময় থেকে Lushai Hills নামে বাইরের মানুষের কাছে পরিচিতি লাভ করে। বর্তমান মিজোরাম আসামের একটি district যা Lushai Hill District নামে পরিচিত ছিল। এই Lushai District এ শুধু লুসাইরা বসবাস করে না, অন্যান্য আরও অনেক আদিবাসী বসবাস করে, যারা লুসাই গোত্রের নয়। তারজন্য এর নামকরণ নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি হয়। ১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দে এর নাম পরিবর্তন করে Mizo Hill District করা হয়। পরবর্তীকালে ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দে union territory মর্যাদা পায়, পরে ১৯৮৭ খ্রিষ্টাব্দে পূর্ণাঙ্গ অঙ্গরাজ্যের মর্যাদা লাভ করে। রাজ্যের নাম হয় মিজোরাম (Mizoram)।

অন্যান্য গোত্রের উপর প্রাধান্য বিস্তারকারী শক্তিশালী গোত্র লুসাইরা ব্রিটিশদের উপর প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়। খ্রিষ্টধর্ম প্রচারকারী মিশনারিদের উপরও লুসাইদের প্রভাব লক্ষণীয়। L.H. Lorrain এবং F.W. Savidge মিশনারিদ্বয় সর্বপ্রথম Roman Script অনুসরণে মিজোদের জন্য বর্ণমালা প্রবর্তন করেন। তা দিয়ে বর্ণমালা পরিচিতি, Dictionary এবং ধর্মীয় পুস্তকাদি বের করেন। সেই ভাষার নামকরণ করা হয় লুসাই ভাষা (Lushai Language) যা Duhlian dialect নামে সমধিক পরিচিতি লাভ করে। পরবর্তীকালে এই Duhlian dialect মিজো ভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠা পায় যা সমস্ত মিজো বা জৌ জাতিগোষ্ঠীর lingua franca হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। এই ভাষা বাংলাদেশের বম, লুসাই, পাংখোয়া সকলেই ব্যবহার করে।

লুসাই আদিবাসী তরুণ-তরুণী

লুসাই নামকরণের উৎপত্তি সম্পর্কে নানান ব্যাখ্যা বিদ্যমান। বাঙালিরা পার্বত্য আদিম লোকদের 'কুকি' বলে পরিচয় দিত। 'কুকি' একটি vague term। কুকি পার্বত্য আদিম লোকদের শব্দ নয় বরং এর অর্থ অনেকটা অসভ্য বর্বর। ইংরেজরা যখন এসব লোকদের সাথে নিবিড় সম্পর্ক স্থাপন করে তখন জানতে পারে যে 'কুকি' এদের অপরিচিত শব্দ। তারা নিজেদের বেলায় এই শব্দ কখনো ব্যবহার করেনি। সর্বপ্রথম ব্রিটিশরা Loosye term শব্দ ব্যবহার করেন। পরবর্তীতে LUSHAI প্রচলন করেন। এ সম্পর্কে পূর্বে বলা হয়েছে।

এর ব্যাখ্যা দেওয়া খুব সহজ নয় বটে। লুসাইরা নিজেদেরকে মিজু বলে অভিহিত করেন। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে Mi মানে man, Z মানে hill, এর অর্থ hillman। সাধারণভাবে মিজো বলতে পাহাড়ি জনমানুষকে বুঝালেও চাকমা, মারমা, গারো বা অন্য জাতিগোষ্ঠী Mizo জাতিগোষ্ঠীর আওতায় পড়ে না। মিজোরামে বসবাসকারী চাকমা'রা Mizo নন। আবার মিজো বা জৌ জাতিগোষ্ঠীর যারা মায়ানমারের Haka, Falam Ges Matupi এলাকায় বসবাস বরে তারা নিজেদের LAI অথবা LAIMI বলে। বান্দরবান জেলাশহর থেকে পূর্বে ৭ কিলোমিটার দূরের একটি বম গ্রামের নাম লাইমিপাড়া। এই নামকরণ Haka বা Falam এর লোকদের সাথে পূর্ব সম্পৃক্ততার বা সংশ্লিষ্টতার কারণে। বান্দরবান পার্বত্য জেলায় লুসাইদের জনসংখ্যা আনুমানিক ৮০ জন। পাংখোয়াদের মতো লুসাইরাও সংখ্যাগরিষ্ঠ বম সমাজে একাকার হয়ে গিয়েছে, তাদের আলাদা কোনো গ্রাম বা পাড়াও নেই। লুসাইরা বান্দরবান পার্বত্য জেলার সবচেয়ে শিক্ষিত সম্প্রদায়। উচ্চশিক্ষা, সরকারি বা বেসরকারি সংস্থায় চাকুরি এবং শিক্ষকতাসহ নানান সামাজিক পেশায় এরা সুপ্রতিষ্ঠিত।

চাকমা জাতি পরিচিতি

পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসকারী বিভিন্ন ভাষভাষী জনগোষ্ঠীর মধ্যে চাকমা অন্যতম। রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ি জেলায় অধিকসংখ্যক চাকমাদের বসবাস রয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসকারী আদিবাসীদের মধ্যে চাকমারাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। শিক্ষাদীক্ষায় এবং সর্বক্ষেত্রে আদিবাসীদের মধ্যে তারাই সবচেয়ে এগিয়ে। নৃ-তাত্ত্বিক বিচারে চাকমারা মঙ্গোলীয় বংশভূত এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, মিয়ানমার, থাইল্যান্ড, কম্বোডিয়া, লাওশিয়ান ও ভিয়েতনামীদের সাথে চাকমাদের ঘনিষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে। বাংলায় তাদের 'চাকমা' বা ইংরেজিতে 'Chakma' বলা বা লেখা হলেও বাস্তবে তারা নিজেদেরকে 'চাঙমা' বলে। চট্টগ্রামের বাঙালিরা বলেন 'চামোয়া' বা 'চাম্মোয়া'। ভারতে ত্রিপুরারা 'চাঙমা' বা চাখুমা বলে (মজুমদার ১৯৯৭)। ১৮৬৭ সালে লিখিত একটি চিঠিতে তৎকালীন পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রশাসক ক্যাপ্টেন টি.এইচ. লুইন লিখেছিলেন, 'Chakma' অর্থাৎ 'চাকমা' বা 'চুকমা'। ম্রোরা বলে 'আছাক'। তবে বর্তমানে 'চাকমা' বা 'চাঙমা' পরিচয়টিই সুপ্রতিষ্ঠিত। ১৯৯১ সালের আদমশুমারিতে চাকমা জনসংখ্যা ২,৩৯,৪১৭।

চাকমা কিংবদন্তি অনুযায়ী অতীতে চাকমারা চম্পক নামে একটি রাজ্যে বসবাস করতো। একসময় সেই রাজ্যের সাধেংগিরি নামে এক রাজার বিজয়গিরি ও সমরগিরি নামে দুই ছেলে ছিলো। বড়ো ছেলে বিজয়গিরি পিতার জীবদ্দশায় দক্ষিণ দিকে অভিযান চালিয়ে চট্টগ্রাম ও আরাকান জয় করেন। তারপর ফেরার পথে তিনি যখন চট্টগ্রামে পৌঁছান তখন শুনতে পেলেন যে, তাঁর অবর্তমানে তাঁর বৃদ্ধ পিতার মৃত্যু হয়েছে এবং ছোটো ভাই চম্পক নগরের রাজা হয়েছেন। এ সংবাদে তিনি খুবই মর্মাহত হলেন এবং চম্পকনগরে আর ফিরবে না বলে মনস্থির করলেন এবং নতুন বিজিত রাজ্যের রাজত্ব শুরু করলেন। তিনি সৈন্যদের নিয়ে চট্টগ্রাম ত্যাগ করে দক্ষিণে সাপ্রেইকুলে চলে যান এবং তার অনুগত সৈন্যদেরকে স্থানীয় নারীর সাথে বিবাহ করার অনুমতি প্রদান করেন। কালক্রমে তাদের সাথে চম্পকনগরের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায় এবং চম্পকনগর ও তার বাসিন্দারা কালের অন্ধকারে হারিয়ে যায়। এখানে উল্লেখ্য যে, দিগ্বিজয়ের রাজা বিজয়গিরির প্রধান সেনাপতি ছিলেন রাধামন ও কুঞ্জধন। রাজার অনুমতি নিয়ে পরে সেনাপতি রাধামন তাঁর নববিবাহিত স্ত্রী ধনপুদি ও পরিবারের টানে চম্পকনগরে ফিরে যান। আজকের চাকমাদের একান্ত বিশ্বাস তারা বিজয়গিরির চট্টগ্রাম ও আরাকান বিজয়ী সেসব সৈন্যদেরই বংশধর। আরাকানিদের ইতিহাসেও চাকমাদের উল্লেখিত জনপ্রিয় কিংবদন্তির কাহিনি পাওয়া যায়। আরাকানিরা চাকমাদেরকে 'সাক' (Sak) বা 'থেগ' (Thek) বলে।

চাকমাদের মধ্যে অনেক 'গঝা' ও 'গুথি' রয়েছে। চাকমা ভাষায় গোষ্ঠী ও গোত্রকে যথাক্রমে 'গঝা' বা 'গুথি' বলে। প্রত্যেক 'গঝা' বা গোষ্ঠীর কয়েকটি 'গুথি' বা গোত্র নিয়ে গঠিত। এইচ.এইচ. রিজলি লিখেছেন, 'সম্ভবত গ্রিক ও রোমানদের মতো চাকমাদেরও তাদের ইতিহাসের শুরুতে দলগুলি সংগঠনে একক হিসেবে নির্দিষ্ট জনস্বার্থে ভূমিকা পালন করছিলো।' চাকমা সমাজের গঝার সংখ্যা ত্রিশাধিক। অপরদিকে গুথির সংখ্যা প্রায় অর্ধশত। সতীশ চন্দ্র ঘোষ 'গঝা'কে গোষ্ঠী হিসেবে উল্লেখ করেছেন। অপরদিকে অশোক কুমার দেওয়ানের মত হলো, আরাকানি শব্দ

মাথা (সর্দার বা দলনেতা) অর্থে 'গং' এবং সন্তান বা মানুষ অর্থে 'ছা' যুক্ত হয়ে 'গং'+ 'ছা' ='গংছা'> 'গঝা' শব্দটি উদ্ভূত হয়েছে। ধারণা করা হয় অতীতে প্রথমে দলপতিদেরকে কেন্দ্র করে গঝাগুলি গঠিত হয়েছিল। পরে বসতি অঞ্চল বা নদীর নামানুসারে আরও গঝা গঠিত হয়। অতীতে পদবিবাচক গঝাগুলো হলো, 'ধাবেং' (গভর্নর), 'বোর্বুয়া' (তিন সহস্র সেনার অধিনায়ক), 'চেগে' (সেনা অফিসার), 'বরচেগে', 'খ্যংচেগে', 'দুখ্যাচেগে', 'লচ্চর' (লস্কর), 'নারান' (কুরকুত্যা), 'রয়াংঝা' ইত্যাদি। স্থানের নামানুসারে গঠিত 'গঝা' হলো, 'তৈন্যা' (তৈনছড়ি নিবাসী), 'মুরিমা গঝা' (মুরিমা/মাতামুহুরী তীরবাসী), 'বুং 'গঝা' (বমু খালের তীরবাসী), 'ফাকসা গঝা' (ফাস্যাখালী নদীর তীরবাসী) ইত্যাদি।

চাকমা আদিবাসী

চাকমা সমাজ পিতৃতান্ত্রিক সমাজ। চাকমা পরিবারে সাধারণত পিতার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। পিতার পরে মাতা, মাতার পরে বয়োজ্যেষ্ঠতা অনুসারে পুত্রদের মতামত স্থান পেয়ে থাকে। তবে সাধারণভাবে পিতৃতান্ত্রিক হলেও অনেক ক্ষেত্রে নারীদের মতামতও যথেষ্ট গুরুত্ব পেয়ে থাকে। অর্থাৎ পিতা বা স্বামী পরিবারের প্রধান কর্তা হলেও তৎপরে জ্যেষ্ঠতা অনুসারে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের মতামতেরই গুরুত্ব থাকে। তবে সম্পত্তির উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে পুরুষরাই প্রাধান্য পায়।

চাকমাদের বংশপরিচয় পিতৃসূত্রীয়। পিতার সূত্র ধরেই সন্তানদের 'গঝা' ও 'গুথি' নির্ণয় করা হয়। সমাজে সকল অবস্থাতেই একজন পুরুষের বংশপরিচয় অপরিবর্তিত থাকে। বিবাহের পরে নারীরা স্বামীর পরিবারের লোক বলে গণ্য হয়। পূর্বে চাকমা সমাজে যৌথ পরিবারের অস্তিত্ব থাকলেও বর্তমানে যৌথ পরিবারের অস্তিত্ব নেই বললেই চলে। বর্তমানে পরিবারগুলি এককভাবে পরিচালিত। প্রায় ক্ষেত্রেই পুত্ররা বিবাহ করার পরপরই মূল পরিবার থেকে আলাদা হয়ে যায়। তবে বৃদ্ধ পিতা-মাতারা সাধারণত পুত্রের ঘরেই বার্ধক্য জীবন অতিবাহিত করেন।

আগের নিয়ম অনুযায়ী গর্ভবতী মহিলাকে নিজের স্বামীর ঘরে বা স্বামীর গোষ্ঠীর ঘরে সন্তান প্রসব করতে হয়। স্বামীর ঘরে বা স্বামীর গোষ্ঠীর ঘরে যদি সন্তান প্রসব করা সম্ভব না হয় তাহলে সন্তান প্রসব করার জন্য একটি পৃথক ঘর তৈরি করে দিতে হয়। পূর্বে 'ওঝা'রাই (এক ধরনের ধাত্রী) কোনো গর্ভবতী মহিলার সন্তান প্রসব করাতেন। এখনও গ্রামাঞ্চলে এই ব্যবস্থা চালু আছে। তবে বর্তমানে শহরাঞ্চলে বা শিক্ষিত সমাজে কোনো গর্ভবতী মহিলাকে হাসপাতালে বা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গিয়ে কোনো ডাক্তারের তত্ত্বাবধানে আধুনিক পদ্ধতিতে সন্তান প্রসব করানো হয়। কোনো পরিবারে শিশু জন্ম হওয়ার সাথে সাথে তার মুখে মধু দেওয়া হয়, যাতে ভবিষ্যতে তার জীবন মধুময় হয়ে ওঠে।

আদিতে চাকমা সমাজ ছিল কৃষিনির্ভর সমাজ। বলা বাহুল্য, মাত্র কয়েক দশক আগেও চাকমা সমাজ পুরোপুরি কৃষিনির্ভর সমাজ ছিলো। অপরদিকে বর্তমানে এই কৃষিভিত্তিক সমাজে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। তারপরও এখনও সিংহভাগ চাকমার পেশাই কৃষি। জুমচাষ, সমতল জমিতে চাষ ও বাগান চাষ নিয়েই চাকমাদের কৃষি। অতীতে চাকমারা জুমচাষ করতো কেবল নিজেদের ভোগের জন্য। উৎপাদিত কোনো ফসল বাজারজাত করতো না। অথবা বাজারজাত করলেও অতিরিক্ত ফসলই কিছু কিছু বাজারে নিয়ে আসতো। বস্তুত তখন চাকমাদের বাজার থেকে কোনো ধান/চাল বা শাকসবজি ক্রয় করতে হতো না। বাজারে তারা কেবল শুঁটকি, লবণ, তেল ও ধাতব সরঞ্জাম কিনতে যেতো। কিন্তু বর্তমানে ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে। বর্তমানে তারা ধান/চাল নিজেদের জন্য রেখে দিলেও অন্যান্য অধিকাংশ ফসল সুবিধা অনুযায়ী বাজারজাত করতে নিয়ে আসে। চাকমারা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী।

খুমী জাতি পরিচিতি

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বে মায়ানমারের আরাকান রাজ্য ও ভারতের মিজুরাম রাজ্যের সীমান্তে বান্দরবান জেলা অবস্থিত। জেলার পূর্বপ্রান্তে রুমা উপজেলায় বাংলাদেশের সর্বোচ্চ পাহাড়ের চূড়া তহজিংডং পর্বত অবস্থিত। তিন পার্বত্য জেলার মধ্যে বান্দরবানে ১১টি আদিবাসী বসবাস করে : খুমী, চাক, খেয়াং, লুসাই, পাংখোয়া, বম, তঞ্চঙ্গ্যা, ম্রো, ত্রিপুরা, মারমা ও চাকমা। এদের মধ্যে খুমীরা সবচেয়ে অবহেলিত ও পিছিয়ে পড়া আদিবাসী। 'খু' শব্দের অর্থ গভীর অরণ্য, আর 'মী' শব্দের অর্থ মানুষ। 'খুমী' শব্দের অর্থ গভীর অরণ্যের মানুষ। এই গভীর অরণ্যের মানুষেরা বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামে শুধু বান্দরবান জেলায় বসবাস করে। এদেশের অন্যান্য আদিবাসীর চেয়ে এদের জনসংখ্যা কম। বর্তমানে এদের জনসংখ্যা ২০০০-এর মতো। বাংলাদেশে এদের জনসংখ্যা কম হলেও মায়ানমারের আরাকানে সংখ্যাগরিষ্ঠ আদিবাসীদের মধ্যে অন্যতম।

আরাকানি ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, পার্বত্য চট্টগ্রামে আগমনের পূর্বেই খুমীরা উত্তর আরাকানের নদীগুলোর কিনারায় বসতি স্থাপন করেছিলো। পার্বত্য চট্টগ্রামে খুমীদের আগমন সম্পর্কে স্যার আর্থার ফারের উক্তি প্রনিধানযোগ্য কোলাডন নদীর

উপত্যকার দক্ষিণতম প্রান্তে বসবাসকরী খুমী উপজাতির লোকেরা প্রতিবছরই আরও দক্ষিণে সরে যাচ্ছে। এর কারণ মনে হয় খুমীদের চেয়েও হিংস্র উপজাতিদের ক্রমবর্ধমান অনুপ্রবেশ। হজসন (Hodgson)-এর মতে খুমী, ম্রো ও খেয়াংরা আরাকানের আদি জনগণের মধ্যে অন্যতম।

ঐতিহ্যবাহী পোশাকে খুমী যুবতী

১৮৫৩ সালে তিনি খুমীদের সম্পর্কে লিখেছেন– 'The race of people, of which there are two divisions called by themselves kumi vel kimi and kumi, and by Arakanese respectively Aara kami and Aphya kumi, inhabits the hills bordering, the river which is named by Arakanese kuladan...It is probable that the kamis and kumis have not been settled in their *present* seat fore more than five or six generations. They gradually expelled there from a tribe called Mro or Myu. The kumi clans are now themselves being disturbed in their possessions by more powerful tribes, and are being driven west ward and south ward. They state that they once dwelt on the hill now possessed by the khyengs, and position of the tribe have been driven out by the latter within the memory of man. হজসনের মতে– 'বিগত শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে কোলাডন নদীর উপত্যকায় খুমীরা বসবাস করতো। তারা তিন থেকে ছয় প্রজন্ম ওখানেই বসবাস করছিলো। কোলাডন নদীর উর্ধ্বতর উপত্যকায় (Upper Koladan) যেখানে খুমীরা বাস করতো তাদের ঐ অঞ্চল থেকে উৎখাত করে চিন ও লাখেররা। খুমীরা তখন চিন ও লাখেরদের তাড়া খেয়ে দক্ষিণে ও পশ্চিমে সরে যায়। এভাবে আনুমানিক চৌদ্দশত এর গোড়ার দিকে খুমীরা পার্বত্য অঞ্চলে অনুপ্রবেশ করে।

জনশ্রুতি থেকে জানা যায় যে, আরাকানে এককালে খুমীরা কুকি রাজার শাসনের অন্তর্ভুক্ত ছিলো। তখন কুকিরা খুমীদের উপর অমানবিক অত্যাচার চালাতো। কথিত আছে যে, কোনো খুমী যদি বেশি ফসল পেতো তাহলে রাজা এসে ধানের গোলায় লাঠি ঢুকিয়ে দিতেন আর ঐ লাঠি গোলার যতো নীচ পর্যন্ত পৌঁছতো, সে পর্যন্ত ধান হতো রাজার জন্য। আর বাকিটুকু খুমী গার্হস্থ্য পেতো। কোনো খুমী গৃহে যদি গরু-ছাগল, হাঁস-মুরগি অর্থাৎ পশুপাখি দুটি থাকতো তাহলে রাজার জন্য বাধ্য হয়ে একটি দিতে হতো। আর যদি কোনো খুমী পাড়ায় কোনো সুন্দরী মেয়ে থাকতো তাহলে রাজার কামতৃষ্ণা থেকে সে রেহাই পেতো না। তখন সুন্দরী মেয়ে হওয়া যেনো অভিশাপ। খুমীদের এ করুণ অবস্থা দেখে এক কুকি মন্ত্রীর খুমীদের প্রতি দয়া ও মমতা জন্মালো। একদিন মন্ত্রী সংগোপনে এসে খুমীদের পরামর্শ দিলো যে, তারা যেনো তাড়াতাড়ি অন্যত্র পালিয়ে যায়। তা-না হলে রাজা সব খুমীকে টুকরো টুকরো করে কেটে মেরে ফেলবেন। আর পালিয়ে যাবার পূর্বে যেনো রান্না করা চুলোয় মল ত্যাগ করে যায়। আর সেই মলে যেনো মুলিগুঁড়া (মদ তৈরির উপকরণ) ছিটিয়ে যায় এবং একটি লাউয়ের বীজ চুলায় বপন করে। কারণ, মুলি মেশালে মল তাড়াতাড়ি শুকোয় এবং মল ও ছাইয়ের সংমিশ্রণে উর্বর হয়ে লাউ-এর চারা তাড়াতাড়ি গজাবে। এরপর খুমীরা মন্ত্রীর পরামর্শ মতো সবকিছু সম্পন্ন করে ঘর-বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে গেলো।

এদিকে কয়েকদিন অতিক্রান্ত হওয়ার পর কুকি রাজা সৈন্যসামন্ত নিয়ে খুমী নিধনের জন্য খুমীদের এলাকায় আসে। ততক্ষণে খুমীরা অনেক দূরে চলে গেছে। তখন রাজা খুমীদের তাড়া করে ধরার জন্য সেনাপতিকে নির্দেশ দিলেন। মন্ত্রী রাজাকে যুক্তি দেখিয়ে বললেন– 'তাদেরকে তাড়া করে আর কোনো লাভ হবে না মহারাজ। দেখুন না, চুলোয় বহুদিনের পরিত্যক্ত মল। সব মল শুকিয়ে গেছে আর অতি বাড়ন্ত লাউয়ের লতা দেখেই বুঝা যায় যে, বহুদিন আগেই তারা এলাকা ছেড়ে পালিয়েছে।

বর্তমানে খুমীদের মূল অংশ মায়ানমারে বসবাস করে। বাংলাদেশের বাইরে এদের লোক সংখ্যা ৭০-৮০ হাজার হবে বলে খুমীদের ধারণা। বাংলাদেশ, মিয়ানমার ছাড়াও থাইল্যান্ড ও ভারতেও কিছু খুমী বসবাস করে। খুমীরা পার্বত্য চট্টগ্রামে চৌদ্দশতকের গোড়ায় আগমন করেছে বলে জানা যায়। ১৯৯১ সালের সরকারি হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশে খুমীর জনসংখ্যা ১,২৪১ জন। খুমীদের মতে, সঠিকভাবে তাদের আদমশুমারি করা হয়নি। যারজন্য প্রকৃত সংখ্যার সাথে প্রাপ্ত সংখ্যার মিল নেই। ১৯৯৯-২০০০ সালে খুমী সোস্যাল কাউন্সিলের জরিপ অনুযায়ী খুমীদের জনসংখ্যা ১,৭৩৪ জন এবং পরিবারের সংখ্যা ৪৫১টি। খুমী কুহ্ং হয় না লাং (খুমী কুহ্ং) ২০০৭ এর ফেব্রুয়ারি মাসে পরিচালিত জরিপের তথ্য অনুসারে খুমী জনসংখ্যা ২০৯৪ জন।

খুমী আদিবাসীদের সামাজিক প্রথা অত্যন্ত প্রাচীন। প্রথা বহির্ভূত কোনো কার্যকলাপের সাথে তারা কখনো জড়িত নয়। প্রথা তারা অত্যন্ত সম্মানের সাথে মেনে চলে।

খুমীরা নতুন কোনো খাদ্যদ্রব্য খেলে খাবার আগমুহূর্তে এবং ঘরের বাইরে খেতে গেলেও খাওয়ার মুহূর্তে ভাত, তরকারি বা যে কোনো খাদ্যদ্রব্য কিছু অংশ নিয়ে নাভিতে ঘষে ফুঁ দিয়ে খায়। যাতে কোনো অশুভশক্তি আক্রমণ করতে না পারে। অতঃপর খাদ্য গ্রহণ করে। এমনকি জুম, বাজার বা অন্য যে কোনো স্থান থেকে কোনো খাদ্যদ্রব্য নিয়ে এসে বাচ্চাদের খাওয়ালেও এরূপ নিয়ম পালন করতে হয়।

যদি অন্য কোনো জায়গায় যেতে হয় তাহলে যাওয়ার পূর্বে মা-বাবার কাছে প্রার্থনা করে আশীর্বাদ নিতে হয় যাতে যাত্রা শুভ, সফল ও মঙ্গলময় হয় এবং সুস্থ ও স্বাভাবিকভাবে যাতে ফিরে আসতে পারে। তখন মা-বাবাও সন্তানের মঙ্গল কামনায় প্রার্থনার জবাবে আশীর্বাদ করে থাকেন। আর যদি বাবা-মা না থাকে তাহলে যে ঝিড়ি থেকে খাবার পানি সংগ্রহ করা হয় সেই ঝিড়িতে উজানের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে অনুরূপভাবে প্রার্থনা করতে হয়।

খুমীদের ঐতিহ্য ও মূল্যবোধ অত্যন্ত প্রাচীন ও ঐতিহ্যপূর্ণ। খুমীদের বাড়িঘর পার্বত্য অঞ্চলের অন্যান্য জাতিদের মতো হলেও কিছুটা ভিন্ন। তাদের বাড়ি দোচালা এবং দোচালা বরাবর বাঁশের বেড়া দিয়ে দু'ভাগ করা হয়ে থাকে। একভাগকে বলা হয় অন্দরকক্ষ আর অপরভাগকে বলা হয় বহির্অংশ। অন্দরকক্ষে সব বিবাহিত পুরুষ স্ব-স্ব পরিবার নিয়ে বসবাস করে। তবে মেয়ে হলে সেও অন্দরকক্ষের একটা অংশে স্থান পায়। অন্দরকক্ষে ঢুকার জন্য কেউ এক দরজা, কেউ দু'দরজা তৈরি করে থাকে। যে কেউ ইচ্ছা করলে বিনা অনুমতিতে অন্দরকক্ষে প্রবেশ করতে পারে না। বিনা অনুমতিতে অন্দরকক্ষে প্রবেশ করলে সামাজিক রীতি মোতাবেক তাকে জরিমানা বা দণ্ড দিতে হয়। পাড়ার কোনো বাড়ির লোকজন সবাই কাজে বেরিয়ে গেলে বাড়িটি জনশূন্য হয়ে যায়, তখন জনশূন্যের বাড়িতে কেউ প্রবেশ করলে সামাজিকভাবে তাকে দোষী সাব্যস্ত করে অর্থদণ্ড বা অন্য কিছু জরিমানা করা হয়।

কোনো যুবতী নারী কোনো যুবকের ঘরে একা বেড়াতে যাওয়াকে খুমী সমাজে সমাজিকভাবে অপরাধ বলে গণ্য করা হয়। তখন ঐ যুবতীকে শালীনতা বর্জিত নারী হিসেবে গণ্য করা হয়। তবে যে কোনো যুবক যে কোনো তরুণীর বাড়িতে বেড়াতে যেতে পারে। খুমী সমাজে আরেকটি মহৎ মূল্যবোধ হিসেবে গণ্য করা যায় তা হলো যৌথ পরিবারে যতোজন বিবাহিত দম্পতি থাকে, তাদের প্রত্যেকের কক্ষে একটি করে রান্নার চুলা থাকে। সকাল-সন্ধ্যা সব বিবাহিত স্ত্রীরা স্ব-স্ব চুলায় সমানভাবে রান্না করে। রান্নার শেষে একস্থানে বসে পরিবারের সবাই একত্রে খাওয়া দাওয়া সম্পন্ন করে।

কোনো পরিবার যদি জুমের কাজ শেষ করতে না পারে, তাহলে তাকে গ্রামবাসীরা সকলে মিলে কমপক্ষে একদিন জুমের কাজে সাহায্য করে থাকে। যাকে খুমী ভাষায় 'আসহরুনা' বলে। ঘরে পিঠা তৈরি করলে অথবা কোনো ব্যক্তি শিকার পেলে শিকারের মাংস সম্মান হিসেবে সমাজপতিকে প্রথম দেওয়া হয়। আবার শিকারের মাংস বিতরণের ক্ষেত্রে সিনার (বুকের মাংস) অংশটি শ্বশুর বাড়িতে পাঠাতে হয়। আর যদি শ্বশুর বাড়ি দূরে হয় তাহলে মাংস শুকিয়ে পরে পাঠাতে হয়। তাছাড়া কোনো পরিবারের উপার্জনকারী ব্যক্তি উপার্জন অক্ষম হলে এলাকাবাসী সকলে মিলে তাকে

সাহায্য করে। কেউ ধান, কেউ চাল, কেউ ডাল, কেউ টাকা-পয়সা আবার অনেকে রান্না করা খাবারও দিয়ে আসে।

কেউ খুমীদের ঘরে উঠলে ঘরে বাইরের অংশের ঘরের বেড়া ঘেষে বসতে হয়। পার্টিশন দেয়ালের বেড়া ঘেষে বসা সমাজে নিষিদ্ধ। পার্টিশন বেড়া ঘেষে একমাত্র পরিবারের কর্তারাই বসতে পারে অথবা গ্রামের কারবারি বা সমাজপতিরা বসতে পারে। খুমীদের গ্রামে কোনো অতিথি গেলে পাড়ায় প্রত্যেক পরিবারে খেতে নিমন্ত্রণ জানায়। গ্রামে প্রত্যেক পরিবারে যতবার খাবার হয় ততবার অতিথিকে নিমন্ত্রণ খেতে হয়। অতিথি যে বাড়িতে অবস্থান করবেন সে বাড়িতে তাকে অবশ্যই খেতে হয়। উল্লেখ্য যে, খুমী সমাজে কারও বাড়িতে কোনো অতিথি আগমন করলে সবার আগে অতিথিকে খাওয়াতে হয়। অতঃপর পরিবারের সদস্যরা একসাথে খেতে বসে। খুমীরা পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় বিশ্বাসী। তারা মূলত বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। বর্তমানে অনেকেই খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করেছে।

খিয়াং জাতি পরিচিতি

পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসকারী ১১টি জনগোষ্ঠীর মধ্যে খিয়াং অন্যতম। রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার রাজস্থলি, কাপ্তাই এবং বান্দরবান পার্বত্য জেলার বান্দরবান সদর, রুমা, থানছি ও রোয়াংছড়ি উপজেলায় খিয়াং জনগোষ্ঠীর বসবাস। ১৯৯১ সালের আদমশুমারিতে খিয়াং জনসংখ্যা ১৯৫০। খিয়াং শব্দের অর্থ আরাকানিদের মতে 'ইচ্ছে'। তাদের ইচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে স্থায়ী নিবাস গড়ে তোলা। ইচ্ছাকে লালন করতে গিয়ে তারা আবহমানকাল থেকে পার্বত্য জনপদে বসতি করে আসছে। খিয়াংরা নিজেদেরকে 'হাউ' বলে পরিচয় দেয়।

খিয়াংদের মঙ্গোলীয় জাতির অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করা হলেও তাদের উৎপত্তি সম্বন্ধে সুনির্দিষ্ট কোনো লেখ্য দালিলিক প্রমাণ কিংবা তথ্য-উপাত্ত আজও অনাবিস্কৃত রয়ে গেছে। তবে পৌরাণিক কাহিনি আকারে তাদের উৎপত্তি সম্বন্ধে খিয়াংদের কাছে সুন্দর দুটি জনশ্রুতি রয়েছে। এককালে খিয়াংদের রাজা ছিলো, ছিল রাজ্যেও। তখন এক যুদ্ধে রাজার সৈনিকের তরবারির আঘাতে নিজ গোত্রের এক আন্তঃসত্ত্বা গৃহবধূ প্রাণ হারালে যুদ্ধের সমর রীতির 'সত্যপন' রবখেলাপ হয়। এতে খিয়াংদের রাজা যুদ্ধে তার পরাজয়ের আলামত খুঁজে পান। সেজন্য তিনি যুদ্ধ অসমাপ্ত রেখে কোনো এক দেশে পালিয়ে যান। যাওয়ার সময় সৈন্যসামন্তসহ রাজ্যবাসীও রাজার সঙ্গী হয়। কিন্তু রাজার সাথে এত লোকসংখ্যা হয়ে গেলো যে, লোকসংখ্যা কমানোর প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। তাই পলায়নরত রাজা পালানোর সময় পথিমধ্যে এক সেতুতে এসে এক বুদ্ধি বের করলেন। তিনি প্রয়োজন সংখ্যক লোকজন পার করে সেতুর মাঝখানের অংশ কেটে ফেললেন। এভাবে রাজা খিয়াংদের একটা অংশকে অসহায় করে রেখে যান। ভাগ্যকে সহায় করে থেকে যাওয়া খিয়াংরাই বর্তমানের খিয়াং জাতির পূর্বপুরুষ বলে খিয়াংরা মনে করে।

খিয়াং আদিবাসী মেয়ে

অন্য কাহিনিটি হলো— বহু বছর আগে তাদের রাজা নিজের দেশ থেকে সৈন্যসামন্ত এবং ছোটো রানিকে নিয়ে জাহাজে করে দেশ ভ্রমণে বেরিয়ে পড়েন। দিন যায়, মাস যায়, বছর যায়। একদিন রাজা যখন এদেশে প্রবেশ করলেন তখন দূর থেকে রানি একটি শুকনো পাতা দেখে রাজাকে বললেন, 'দেখুন মহারাজ, ঐ দূরে একটি হরিণ দেখা যাচ্ছে।' রাজা রানির ডাকে সাড়া দিয়ে এসে দেখেন, দূরে জঙ্গলের ধারে একটি শুকনো গাছের ডালে পাতা দেখা যাচ্ছে। রাজা রানিকে বললেন, 'তুমি ভুল দেখেছো। তুমি একটি শুকনো পাতাকে হরিণ মনে করেছো। আসলে সেটা হরিণ নয়।' রাজার কথা শুনে রানি বল্‌লেন, 'না মহারাজ, আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি হরিণই দেখা যাচ্ছে।' রাজা আবার বললেন, 'না সেটা হরিণ নয়, একটি শুকনো পাতাকে মনে হচ্ছে হরিণের মতো।' এভাবে এক পর্যায়ে রাজা-রানি তুমুল তর্কে জড়িয়ে পড়েন। একে অপরের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলেন। চ্যালেঞ্জটি হচ্ছে, রাজার কথা সত্য হলে রাজা দেশে ফিরে যাবেন নতুবা তাকে এ গহীন বনজঙ্গলে নির্বাসিত হতে হবে। ঠিক তেমনি রানির কথা যদি সত্য হয়, তাহলে রানি দেশে ফিরে যাবেন। যদি মিথ্যা হয় তাহলে রানিকেও এখানে নির্বাসিত হতে হবে। রাজা-রানির শর্ত মোতাবেক দু'জনের মধ্যে হার-জিতের লড়াই শুরু হলো। অবশেষে জাহাজটি যতই তীরের কাছাকাছি এলো, ততই দু'জনের মধ্যে জয়-পরাজয়ের ভাগ্য কার হবে, সেটা নিয়ে দু'জনে অপেক্ষায় রইলেন। একসময় জাহাজটি ঠিক তীরে এসে ভিড়লো। দু'জনই এসে দেখলেন, ওটি শুকনো পাতা ছাড়া আর কিছুই নয়। এতে রানি হেরে গেলেন। যেমন শর্ত তেমন

কাজ। রানিকে নির্বাসিত করা হলো। রানি যখন নির্বাসিত হলেন তখন রানি ছিলেন অন্তঃসত্ত্বা। অন্তঃসত্ত্বা দেখে তাকে দেখাশোনার জন্য রাজা রানির সাথে কিছু নারী-পুরুষ ও সৈন্যসামন্ত রেখে যান। রাজা যাদেরকে রানির সাথে রেখে যান তারাই এদেশে রয়ে গেছে এবং এরাই এদেশের বর্তমানের খিয়াং জাতি। এ খিয়াংদের বলা হয় 'মু-য়ু খিয়াং' অর্থাৎ না নেওয়ার ইচ্ছা। মু-য়ু অর্থ 'নেব না'।

ঐতিহাসিকরা কেউ কেউ মনে করেন, দক্ষিণে টেম-চিন বা উত্তরের ওয়াইল্ড চিন নামক মায়ানমারের আরাকান ইয়োমা উপত্যকার অববাহিকায় খিয়াংদের আদিনিবাস ছিলো। মানব জাতির ক্রমবিকাশের ধারায় বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনায় জীবন-জীবিকা ও যুদ্ধবিগ্রহের কারণে সেখান থেকে ধীরে ধীরে বিভিন্ন স্থানে খিয়াংরা ছড়িয়ে পড়ে এ সম্পর্কে অনেক মতবাদ বা তথ্য প্রমাণ মেলে। তার মধ্যে বিশেষ বিশেষ কয়েকটি মতবাদ উপস্থাপন করা হলো।

প্রথম মতবাদ হচ্ছে— খিয়াংরা আরাকানের উত্তর ও দক্ষিণের ইয়োমা পর্বত হতে জীবন-জীবিকা আরম্ভ করে। মায়ানমারের আকিয়াব, ক্যক্পু এবং সান্ডোয়ে জেলার পশ্চিমে তাদের বসবাস রয়েছে বলে জানা যায়। এছাড়া মিনবু, দেয়েতমোয়া, প্রোম এবং হেনজাদা জেলার পূর্বে তাদের বসবাস রয়েছে বলে তথ্য পাওয়া যায়। হুডসনের মতে— খিয়াং, খুমী ও ম্রোরা এদেশের আদি অধিবাসী।

দ্বিতীয় মতবাদ হচ্ছে— বার্মার চীন হিলসের অধিবাসীদের খিয়াং বলা হয়। বার্মিজরা এদের 'চিনস' আর আরাকানিরা খিয়াং বলে ডাকে। কালের আবর্তে চীন হিলসের এসব জনগোষ্ঠীর মধ্যে একটি অংশ জীবন-জীবিকার তাগিদে বা গোষ্ঠী প্রধানের অনুচর হয়ে বর্তমান পার্বত্যাঞ্চলের দিকে ধাবিত হয়। কালের আবর্তে তাদের ভাষা, সংস্কৃতি, রীতিনীতি পরিবর্তন হলেও মূল ভিত্তি এখনো অটুট রয়েছে বলা যায়।

খিয়াংরা বাঁশ, গাছ দিয়ে মাচাং ঘর তৈরি করে। সাধারণত পাহাড়ের উপর খোলামেলা জায়গায় তাদের গ্রাম গড়ে ওঠে। পাহাড়ের কাছাকাছি খাল ও ঝরনার নিকটে তারা আবাস ভূমি সৃষ্টি করে। তারা বংশ পরম্পরায় জুমচাষের উপর নির্ভরশীল। তারা ধান, মিষ্টি আলু, তুলা, তরমুজ, তৈলবীজ, বাজ্ঞি, আদা, হলুদ প্রভৃতি চাষ করে।

খিয়াংরা বেশিরভাগই বৌদ্ধধর্মাবলম্বী। তবে অনেকে খ্রিষ্টান ধর্মের অনুসারী হয়েছে। অন্যান্য আদিবাসীর মতো খিয়াংদের মধ্যেও বিভিন্ন গোত্র রয়েছে। তাদের মধ্যেও একজন প্রধান কারবারি থাকেন। কারবারিরাই সমাজ পরিচালনা করেন। পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা খিয়াংদের সমাজে দৃশ্যমান। পিতাই পরিবারের কর্তা। তার মৃত্যুতে বড়ো ও ছোটো ছেলে পিতৃ সম্পত্তির অধিকারী হয়।

বিভিন্ন প্রাকৃতিক জড় পদার্থের নামানুসারে খিয়াংদের গোত্রের নামকরণ করা হয়। যেমন— হোকচ্, খাংচ্, ছোম চ্, পে চ্, ছে চ্, মং চ্, মালম স, ক্ষেপ চ্, চুমচে সং, ম্রচ ইত্যাদি। খিয়াংদের গোত্রের উৎপত্তির পেছনে অনেক ইতিহাস রয়েছে। নিম্নে কয়েকটি গোত্রের ইতিহাস তুলে ধরা হলো :

১. যে গোত্র রাজার ছেলে তত্ত্বাবধান করে তাদেরকে বংশানুক্রমে 'মংচ' গোত্র বলে।

২. খিয়াংদের দেশে এক অঞ্চলের লোকেরা খুবই বিশৃঙ্খলা ও অন্যায় অত্যাচারে অতিষ্ঠ হতো, এমনকি রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার সম্ভাবনা দেখা দিলে এমন সময় তাদেরকে দমন করার জন্য যে লোককে নিয়োজিত করা হয় তাদের গোত্রকে 'ক্ষেপ চ্' বলে।

৩. রাজার চলার পথ পরিষ্কার করার জন্য যাদেরকে নিয়োগ করা হয় তাদেরকে 'মংলম স' বলা হয়। তাদের কাজ শুধু রাজা যেদিকে যাবে সেদিকে রাস্তা পরিষ্কার করবে।

৪. এককালে খিয়াং রাজ্যে বানরের উৎপাতে রাজ্যের লোকজন অতিষ্ঠ হয়ে পড়ে। তাই রাজা বানর তাড়ানোর জন্য এক দল লোক নিয়োগ করলেন। তারাই 'য়োংচ' গোত্র।

৫. কোনো এক সময় একজন খিয়াং নারী এক মারমার ছেলেকে বিয়ে করে। বিয়ের পর তারা বংশ পরম্পরায় খিয়াং সমাজে বসবাস করে খিয়াং হয়ে যায়। পরবর্তীকালে এই গোত্রকে 'লাইব্রে স্' গোত্র বলে ডাকে।

৬. রাজার সৈনিক হিসেবে যারা বর্শা দিয়ে সারাক্ষণ রাজাকে পাহারা দিয়ে রক্ষা করে তাদেরকে 'স্বে চ্, গোত্র বলে।

চাক জাতি পরিচিতি

বাংলাদেশের বৃহত্তর পার্বত্য অঞ্চল তথা রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান পার্বত্য জেলায় ১১টি আদিবাসী বসবাস করে। তার মধ্যে চাক অন্যতম। শুধুমাত্র বান্দরবান জেলার নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার বাইশারী, নাইক্ষ্যংছড়ি, কামিছড়া, ক্রোক্ষ্যং, বাঁকখালী প্রভৃতি এলাকায় চাকরা বসবাস করে। চাকরা নিজেদেরকে 'আচাক' বলে পরিচয় দিয়ে থাকে। চাকরা নিজেদের নামের শেষে 'চাক' লিখলেও আরাকানিরা চাকদেরকে 'সাক' (Sak) এবং কখনো কখনো 'মিঙসাক' বলে অভিহিত করে। চাকদের মধ্যে প্রধানত দুটি গোত্র (১) আন্দো এবং (২) আরেক। এই দুটি প্রধান গোত্র আরও কতগুলি উপগোত্রে বিভক্ত। আন্দো গোত্রের উপগোত্র আরা আন্দো, আনাং আন্দো, তাবাংদেং ও পেমু। আরেক গোত্রের উপগোত্র উপবা, উতালু, উচিছা, কেংকাজি, কেংকাবেং ইত্যাদি। চাকদের একই গোত্রের ছেলেমেয়েদের মধ্যে বিয়ে নিষিদ্ধ, অর্থাৎ একজন আন্দো ছেলে আন্দো গোত্রের কোনো মেয়েকে বিয়ে করতে পারবে না। তাকে বিয়ে করতে হবে আরেক গোত্র থেকে। সেইজন্য চাক আদিবাসীদের স্বগোত্রের মধ্যে বেয়াই- বেয়ান ও মামা-ভাগিনা নেই।

প্রাচীন চীনা ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, চাকরা ওনেন প্রদেশের পশ্চিম অঞ্চলে ছিলো। তারা কোনো বড় জাতি নামে পরিচিত ছিল না। চাকদের অর্ধেক গ্রুপ সাক-কডো ঐ সময় হ্নীখৌ ও ইরাবতি নদী অনুসরণ করে মায়ানমারের মূল ভূখণ্ডতে ঢুকে পড়ে। হুগোং পর্বতমালা থেকে তাগোহ্, উরু নদী ইত্যাদি অঞ্চল বড় কান দেশ বা সাক দেশ হিসেবে চীনাদের কাছে তখন পরিচিত ছিলো। অন্য এক গোত্র 'টাই' ওনেন প্রদেশের পশ্চিমাঞ্চলে হুগোং পার্বত্য এলাকা থেকে আসামের দিকে সরে যায় বলে গবেষক ও ইতিহাসবিদগণ মনে করেন।

লেখক, গবেষক ও ইতিহাসবিদদের লেখা থেকে ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, সাকরা যেখান থেকে হোক, যে পথ ধরে হোক পুগেন যুগের আগে মায়ানমারের ভূ-খণ্ডে সর্বপ্রথম পদার্পণ করে। কালের আবর্তে মায়ানমারের পুগেন, ক্যকছে, সারাক

ইত্যাদি স্থানে এসে পৌঁছে। পরবর্তীকালে মায়ানমারের ধ্যান প্রদেশে অবস্থানকালে তারা খেয়াং ও নাগাদের মুখোমুখি হলে সাকরা আবারো দু'গ্রুপে বিভক্ত হয়ে যায়। এক গ্রুপ পশ্চিম দিকে বাংলাদেশে এবং অপর গ্রুপ দক্ষিণ দিকে সরে পড়ে।

চাক আদিবাসী

চাকরা কোন সালে, কবে, কার নেতৃত্বে কিভাবে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের বর্তমান জায়গায় এসেছে তা নিরূপণ করা কঠিন। কারণ লিখিত কোনো বই-পুস্তক না থাকায় মানুষের সীমিত স্মরণ শক্তি দ্বারা এতদিনকার ঘটনাবলি মনে রাখা সম্ভব নয়। জনশ্রুতি থেকে জানা যায় যে, বাংলাদেশের চাকরা যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে নিরাপদ জায়গায় আশ্রয় নেয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রাকালে "লাল ইছা (লাল চিংড়ি) রান্না করতে তারা রয়ে যায়।" চাকদের প্রবাদ বাক্যে এখনো বলে থাকে যে, এক নেতা অথবা "ঈছিক শাহ্‌হ্রং গক কিয়াইং দাক কা'। চাকদের আরও জনশ্রুতি আছে যে, এক নেতা অথবা সেনাপতির নেতৃত্বে এক অংশ চাক তাদের আগের মায়ানমারের আরাকান রাজ্য থেকে উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম দিকে চলে আসে। ঐ দলকে অনুসরণ করে আসতে আসতে চাকরা পার্বত্য চট্টগ্রামে এসে পৌঁছে।

চাকরা মায়ানমারের বর্তমান রাখাইন প্রদেশের উত্তরাঞ্চলের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত কোলাডন নদীর পশ্চিম পাড়ে অবস্থিত চেওদাং পর্বত অতিক্রম করে প্রথমে লামা, ওছা (বর্তমান লামা ইয়াংছা বাজার) ইত্যাদি জায়গায় বসবাস করে। ওছাকে কেন্দ্র করে হৃদয়বিদারক এক করুণ কাহিনী নিয়ে একটি কিংবদন্তি আছে। কাহিনির সারবস্তু হলো– "বর্ষা মৌসুমে প্রবল বৃষ্টির দিনে ওছা নামে এক মহিলা জুম থেকে ঘরে ফিরছিলো। পথে একটা 'মরং' অর্থাৎ ছড়া। বৃষ্টির পানিতে ছড়াটি প্লাবনে থৈ থৈ ছিলো। বাঁশের ভেলা

তৈরি করে মহিলাটি ছড়া পার হচ্ছিলো। পানির স্রোতে ভেলাটি ভেসে যায়। তাকে রক্ষা করতে গিয়ে মহিলার সমস্ত পরিবারের লোক পানিতে ডুবে প্রাণ হারায়।"

চাক আদিবাসীরা সাধারণত জুমচাষের উপর নির্ভশীল হলেও বর্তমানে প্রায় লোকই সমতলভূমিতে চাষাবাদ করে। তারা ঋতুভেদে ধান, তুলা, তিল, তামাক, মরিচ, আদা, হলুদ, সরিষা, ভুট্টা ইত্যাদি চাষ করে থাকে।

চাক সমাজে নারীরা কোনো পিতা-মাতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হতে পারে না। পুরুষরাই পিতা-মাতার সম্পত্তি উত্তরাধিকারী লাভ করবে। এমনকি কোনো নারী পিতা-মাতার সম্পত্তির উত্তরাধিকার দাবিও করতে পারবে না। যদি পিতা-মাতা জীবিত থাকা অবস্থায় সম্পত্তি দান করে যায় তখনই নারীরা সম্পত্তি পাবে।

চাকরা নদীর তীরে বসবাস করতে পছন্দ করে। তাদের গ্রামগুলি সাধারণত নদীর তীরে সমতল ভূমির উপর। চাকরা পূর্ব হতে অদ্যাবধি খুঁটির উপর তৈরি মাচাং ঘরে বাস করে। তাদের ভাষায় বাড়ি বা ঘরকে 'কিং' আর গ্রামকে 'ঠিং' বলে। ঘরগুলি সাধারণত মাটি থেকে প্রায় ৫/৬ ফুট উঁচুতে হয়ে থাকে। তাদের প্রত্যেক বাড়ির পেছনে বাঁশের নির্মিত মাচাং বা 'কাবাগ' থাকে। ঐ স্থানকে তারা 'ই-কিং' (জলঘর) হিসেবে ব্যবহার করে থাকে। এছাড়া বাড়ির সামনে 'মংরুং' বা ঢেঁকিশালা তৈরি করা হয়। চাকরা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী এবং তাদের সমাজব্যবস্থা পিতৃতান্ত্রিক।

তঞ্চঙ্গ্যা জাতি পরিচিতি

পার্বত্য চট্টগ্রামের ১১টি আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মধ্যে তঞ্চঙ্গ্যা অন্যতম বস্তুত তঞ্চঙ্গ্যা ও দৈনাক নামে পাহাড়ে বসবাসকারী এই দুটি জনগোষ্ঠীকে আলাদা জনগোষ্ঠী হিসেবে মনে করা হলেও তারা একই জনগোষ্ঠীর লোক। তারা তিবেতো-বর্মন ভাষাভাষী নৃ-গোষ্ঠীর লোক। বাংলাদেশের রাঙ্গামাটি ও বান্দরবান জেলা তঞ্চঙ্গ্যাদের প্রধান বাসস্থান। এছাড়া চট্টগ্রাম জেলার রাঙ্গুনিয়া থানার উত্তর-পূর্বাংশে এবং কক্সবাজার জেলার উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলায় তাদের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বসতি রয়েছে। ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ত্রিপুরা রাজ্যের দক্ষিণ অঞ্চল এবং মিজোরামে চাকমা স্বশাসিত জেলা পরিষদ (সিএডিসি) অঞ্চলে রয়েছে তাদের প্রধান প্রধান বসতি। মায়ানমারেই তঞ্চঙ্গ্যাদের মূল বসতি ছিলো। বর্তমানে আকিয়াবে সিত্তুয়ে জামপুই হিলের দক্ষিণে কোলাডন নদীমুখ অবধি তাদের বসতি বিস্তৃত। তঞ্চঙ্গ্যা আদিবাসীদের ইতিহাস সূত্রে আলীকদম একটি ঐতিহাসিক অঞ্চল। অতীতে আরাকানিদের দ্বারা দৈনাংরা (তঞ্চঙ্গ্যা) অত্যাচারিত হয়ে পড়লে ১৪১৮ খ্রিষ্টাব্দে মৈসাং রাজপুত্র 'মারেক্যা' ও তৈন সুরেশ্বরীর নেতৃত্বে তঞ্চঙ্গ্যারা আরাকান থেকে দুর্গম গিরি পথ অতিক্রম করে পার্বত্য আলীকদম অঞ্চলে পালিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করে। জ্যেষ্ঠভ্রাতা 'মারেক্যা' মৃত্যুবরণ করলে তার ভাই 'তৈন সুরেশ্বরী' রাজ্যভার গ্রহণ করেন। তৈন সুরেশ্বরীর নামানুসারে এই নদীটির নামকরণ করা হয় তৈন খাল। এই খালটি মাতামুহুরী নদীর একটি সংযোগ খাল। পরবর্তীকালে চট্টগ্রাম অঞ্চলের তৎকালীন শাসনকর্তা মোঃ জালাল উদ্দিনের অনুমতি নিয়ে ১২ খানি গ্রাম নিয়ে তৈন সুরেশ্বরী একটি ক্ষুদ্র চাকমা রাজ্য গঠন করে। এই গ্রামকে বলা হতো '১২ তালুক'। এই '১২ তালুক' আলীকদম অঞ্চলের তৈন খাল

ও মাতামুহুরী নদীর অ্যাংখ্যাং নামক স্থানে অবস্থিত ছিলো। কথিত আছে বাঁশ-বেতের নির্মিত সিংহাসনে বসে তৈন সুরেশ্বরী রাজ্য পরিচালনা করতেন।

ঐতিহ্যবাহী পোশাকে তঞ্চঙ্গ্যা নারী

আরাকানিদের দ্বারা লাঞ্ছিত ও অত্যাচারিত তঞ্চঙ্গ্যাদের একটি ইতিহাসখ্যাত গাঁথা এখনো সবার মুখে মুখে ফিরছে :

"যে-যে বাপ্ ভাই যে-যে-যে
চম্পক নগরত ফিরে যে।
এলে মৈসাং লালস নাই
ন-এলে মৈসাং কেলেস নাই।
ঘরত্ গেলে মগে পায়
ঝাড়ত্ গেলে বাঘে খায়।
মগে ন-পেলে বাঘে খায়
বাঘে ন-পেলে মগে পায়।

অর্থাৎ

চল বাপ-ভাই চল যাই
চম্পক নগরে ফিরে যাই।
আসলে মৈসাং ললসা নাই
না আসলে মৈসাং ক্লেশ নাই।
ঘরে থাকলে মগে পায়
জঙ্গলে বাঘে খায়।
মগে না পেলে বাঘে খায়
বাঘে না পেলে মগে পায়।

চাকমা ও তঞ্চঙ্গ্যারা আরাকানিদেরকে মগ বলে সম্বোধন করে। কথিত আছে, আরাকানিরা তৎকালে খাজনা আদায় করার নামে চাকমা ও তঞ্চঙ্গ্যাদের গ্রামে গিয়ে পুরুষদের পিছমোড়া বেঁধে সারারাত গৃহ প্রাঙ্গণে ফেলে রাখা হতো আর মহিলাদের দিয়ে মদ তৈরি করিয়ে মদ পান করতো। তারা স্ত্রীলোকদের উপর অমানবিক অত্যাচার চালাতো। বান্দরবানে তঞ্চঙ্গ্যাদের বর্তমানে জনসংখ্যা ১৫,০১০।

তঞ্চঙ্গ্যাদের বংশ পরিচয় পিতৃসূত্রীয়। তঞ্চঙ্গ্যাদের বারোটি গোত্র রয়েছে। তঞ্চঙ্গ্যাদের ভাষায় গোত্রকে 'গসা' বলা হয়। এই হিসেবে মোট বারোটি গসা হচ্ছে : ১. মঅ গসা, ২. কারওয়া গসা, ৩. ধন্যা গসা, ৪. লাং গসা, ৫. মেলং গসা, ৬. এংলা গসা, ৭. অঙ্য গসা, ৮. তাস্‌সি গসা, ৯. রাঙ্যা গসা, ১০. লাপোস্যা গসা, ১১. মুলিমা গস্য ও ১২. ওয়াহ্‌ গসা। তঞ্চঙ্গ্যা জনগোষ্ঠীর মধ্যে একক ও যৌথ পরিবার লক্ষ করা যায়। তবে যুগ পরিবর্তনের সাথে যৌথ পরিবার এখন প্রায় নেই বললেই চলে।

তঞ্চঙ্গ্যাদের ঐতিহ্যবাহী বাসগৃহ সাধারণত বাঁশের তৈরি মাচাং ঘর। এ ঘরের ছাউনি শন, বাঁশপাতা অথবা কুরুক পাতা দিয়ে তৈরি করা হয়। তবে ঘরের খুঁটিগুলি শক্ত কাঠের হয়ে থাকে। তঞ্চঙ্গ্যারা সাধারণত কড়ই, গামার, গোদা, গুটগুটিয়া ইত্যাদি শক্ত গাছ বেছে বেছে ঘরের খুঁটি জোগাড় করে থাকে। তঞ্চঙ্গ্যাদের ঘরের একটি নির্দিষ্ট ডিজাইন আছে যা প্রত্যেক গৃহস্থ অবশ্যই অনুসরণ করে থাকে। তাই তঞ্চঙ্গ্যাদের ঘর দেখলেই চেনা যায়। মূল ঘর, চা-না, ইচর ও ইচরের পাশে সরঞ্জামাদি রাখার জন্য একটি ঘর এবং ইচরের শেষ মাথায় ইচর থেকে কিঞ্চিত উচ্চতায় টংঘর। এই টংঘর অভ্যাগতদের থাকার জন্য করা হয়। ঘরের কোনো জানালা রাখা হয় না। তবে ছোটো ছোটো খুপড়ি রাখা হয়। যেগুলি গ্রীষ্মকালে সুশীতল বাতাস চলাচলে সাহায্য করে। তঞ্চঙ্গ্যারা বৌদ্ধ ধর্মে বিশ্বাসী এবং পিতৃতান্ত্রিক।

ঞ. নদ-নদী ও খাল-বিল

নদীমাতৃক দেশ বাংলাদেশ। বাংলাদেশের সমতল অঞ্চলে অনেক বিখ্যাত নদ-নদী থাকলেও দেশের পাহাড়ি অঞ্চলেও উল্লেখযোগ্য নদ-নদী রয়েছে। বান্দরবান পার্বত্য জেলায় যেসব নদ-নদী আছে তার সবকটিরই উৎপত্তিস্থল পাহাড় ও পর্বতে। বান্দরবানের প্রায় নদ-নদীরই উৎপত্তি হয়েছে মায়ানমারের পর্বতমালা থেকে। বান্দরবানের নদ-নদীগুলো এখানকার চাষাবাদে যেমন বিশেষ ভূমিকা রাখছে, তেমনি বান্দরবানবাসীর মাছের চাহিদা পূরণেও নদ নদীগুলোর ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বান্দরবানের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বর্ধনেও নদ-নদীগুলোর যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে। বান্দরবানের নদ-নদীগুলো সৌন্দর্য পিপাসু পর্যটকদের প্রবলভাবে আকৃষ্ট করে। তাই বান্দরবানের পর্যটন শিল্পের উন্নতি ও পর্যটন শিল্প প্রসারে বান্দরবানের নদ-নদীগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

শঙ্খ নদী

শঙ্খ নদীর মোট দৈর্ঘ্য প্রায় ২৭০ কিলোমিটার। শঙ্খ নদী অনেক উঁচু উঁচু দুর্গম পাহাড়, গহিন বনাঞ্চল ও অসংখ্য পাহাড়ি জনপদ ছুঁয়ে এঁকেবেঁকে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে

চট্টগ্রাম জেলার সীমানা ঘেঁষে প্রবাহিত হয়ে মিশেছে বঙ্গোপসাগরে। বান্দরবান জেলা সদর থেকে নদীর উজানে রোয়াংছড়ি, রুমা ও থানছি উপজেলা পর্যন্ত শঙ্খ নদীর দু'পাড়ে বসবাসকারী ৯০ শতাংশই মারমা আদিবাসী। তাদের অধিকাংশের পেশা জুমচাষ। নদীটির নাম 'শঙ্খ' কেন তার কোনো ঐতিহাসিক তথ্যসূত্র পাওয়া যায়নি। ধারণা করা যায়, ব্রিটিশ আমলে বাঙালি আমলারা গেজেটিয়ার করার সময় এটিকে 'শঙ্খ নদী' হিসেবে নথিভুক্ত করে। যদিও 'শঙ্খ' বলতে এক ধরনের সামুদ্রিক শামুকের নাম বুঝায়।

১৮৬০ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম গেজেটিয়ার প্রকাশকালে ব্রিটিশ শাসকেরা ইংরেজিতে এ নদীকে 'Sangu' নদী হিসেবে চিহ্নিত করেন। তবে মারমা আদিবাসীরা তাদের ভাষায় শঙ্খ নদীকে 'রিগ্রাই ক্ষ্যং' অর্থাৎ 'স্বচ্ছ নদী' নামে অভিহিত করে। এই নদী বাংলাদেশ ও মায়ানমারের আরকানের সীমান্তবর্তী পাহাড় থেকে সৃষ্ট হয়ে বান্দরবান জেলার থানছি উপজেলায় প্রবেশ করেছে। পাহাড়ি এলাকায় অসংখ্য ছোটো-বড়ো ঝরনা থেকে সৃষ্টি হওয়া ছোটো ছোটো পাহাড়ি নদী বা ছড়া এসে মিশেছে শঙ্খ নদীতে। এরমধ্যে থানচি উপজেলার দুলুছড়ি, পানছড়ি, লিকগ্রে, ছোটো মদক, বড়ো মদক, সিংভাফা; রুমা উপজেলার রেমাক্রি ছড়া, তিনদু, পরদা, দোলা খাল, চেমা ছড়া, পানতলাছড়া, রুমা খাল, পলিছড়া, মরগছড়া; রোয়াংছড়ি উপজেলার; ঘেরাও ছড়া, বেতছড়া, তারাছা ছড়া; বান্দরবান সদরে পাইনছড়া, সুয়ালক ছড়া ও বান্দরবান-চন্দনাইশ সীমান্তের ধোপাছড়ি অন্যতম।

শঙ্খ নদী (সাঙ্গু)

চার দশক আগেও শঙ্খ নদীর দু'পাশে ছিল প্রচুর ঘন প্রাকৃতিক বনাঞ্চল। এরমধ্যে বিভিন্ন প্রজাতির নাম না জানা অসংখ্য বড়ো বড়ো গাছপালা এবং বাঁশ ও

বেতের নিবিড় ঘনবন ছিল অন্যতম। এই বনে বড়ো বড়ো হাতি, বাঘ, কালো ও লালচে ভাল্লুক, বন্যশূকর, সাম্বার হরিণ, দেশি লাল হরিণ, জংগলি গয়াল, বনমোরগ, মথুরা, ময়ূর, হনুমান, উল্লুক, কয়েক প্রজাতির বানর, কয়েক ধরনের বনবেড়াল, অজগর সাপসহ প্রচুর বন্যপ্রাণীর প্রাচুর্য ছিলো। বর্ষাকালে শঙ্খ নদীর রূপ ছিল ভয়ঙ্কর। প্রচুর বৃষ্টিপাত হলে পাহাড়ি নদীটি উঠতো ফুলে-ফেঁপে; তখন এর স্রোতধারা হতো ভিন্ন। কোথাও দেখা দিতো পাহাড়ি ঢল। অনেক উঁচু থেকে এর পানি গড়িয়ে বিনা বাঁধায় নীচের দিকে প্রবাহিত হতো। সে সময় দু'পাশের জনবসতি ও বনাঞ্চলের তেমন কোনো ক্ষতি হতো না। আবার বিস্ময়করভাবে বৃষ্টিপাত শেষ হওয়ার সাথে সাথে স্বাভাবিক হয়ে আসতো এর স্রোতধারা। আর সে সময় পাহাড়ি ঢলের কারণে নদীর দু'কূলে পড়তো প্রচুর পরিমাণে পলিমাটি। কোনো ধরনের সার প্রয়োগ ছাড়াই সেখানে অনায়াসে চাষ করা যেতো বিভিন্ন মৌসুমে ধান, ডাল, শাকসবজি, বাদাম ও দেশি তামাকপাতা। আবার শুকনো মৌসুমে হ্রাস পেতো শঙ্খ নদীর গভীরতা। তখন কোথাও গলা পরিমাণ পানি, আবার কোথাও কোমর বা হাঁটু পানি থাকতো এ নদীতে। নদীর তলদেশে বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক পাথুরে কুমের দেখা মিলতো। এ কুমগুলোর গভীরতা ২০ থেকে ৫০ ফুট হওয়াও বিচিত্র নয়। সেখানে পাওয়া যেতো ছোটো বড়ো বিভিন্ন ধরনের মাছ। এ ছাড়া শুকনো মৌসুমে নদীতে অনায়াসে শিকার করা যেতো রুই, কাতলা, কালিঘোন্যা, বোয়াল, বাইল্যা, রাখল মাছ, গলদা চিংড়ি, শোল, মাগুর, সিং, মৃগেল ইত্যাদি।

এক সময় শঙ্খ নদীতে চলাচল করতো ছোটো-বড়ো ইঞ্জিন বিহীন কাঠের নৌকা। এই নৌকা যোগাযোগই ছিল পুরো বান্দরবানে যোগাযোগ ও মালামাল পরিবহনের অন্যতম মাধ্যম। অন্যদিকে এ নদীতে দিনে বা রাতে চলাচলের ক্ষেত্রে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ছিল খুবই শান্তিপূর্ণ ও সৌহার্দ্যময়। কিন্তু বর্তমানে শঙ্খ নদী যেমন তার রূপ পাল্টিয়েছে, তেমনি আমূল বদলে গেছে এর চারপাশের পরিবেশ ও প্রতিবেশ। একই সঙ্গে বদলে গেছে জনজীবনযাত্রা।

এছাড়া বিভিন্ন টোবাকো কোম্পানি শঙ্খ নদীর অববাহিকায় জুমচাষীদের তামাক চাষে উৎসাহিত করায় ফসল চাষের বদলে বেড়েছে তামাক চাষ। উৎপাদিত তামাক পাতা নদীতে ধোয়ার ফলে মাইলের পর মাইল নদীর পানি হচ্ছে দূষিত। আর বৃষ্টির পানিতে ধূয়ে এসব তামাক চাষের জমির রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের বিষ মিশছে গিয়ে শঙ্খ নদীতে। এছাড়া পানিতে বিষ মিশিয়ে মাছ শিকারের ফলেও বাড়ছে নদীর দূষণ। এমন বৈরি পরিস্থিতিতে এ নদীকে ঘিরে গড়ে ওঠা হাজার বছরের পাহাড়ি জনপদ বর্ষা ও শুষ্ক মৌসুমে জীবনের ঝুঁকি নিয়েই এ নদীর পানি ব্যবহার করছে। এরফলে কত মাইল এলাকা জুড়ে কত জনসংখ্যা এখন স্বাস্থ্য ঝুঁকির মধ্যে দিন কাটাচ্ছে, প্রাণ-বৈচিত্র্যের উপরেই বা এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া কি মাত্রায় পড়ছে, তার কোনো সঠিক পরিসংখ্যানও নেই।

সাঙ্গু নদীর গুরুত্ব

১. নিত্যদিনের ব্যবহারের পানির উৎস হিসেবে কাজ করে।
২. খাবার পানির উৎস হিসেবে কাজ করে।
৩. পাহাড়ি জনপদে যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে কাজ করে।
৪. উৎপাদিত পণ্য পরিবহনের ক্ষেত্রে যোগাযোগের পথ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
৫. পাহাড়ি জনপদের সকল সংস্কৃতির ধারক ও বাহক এই নদী।

মাতামুহুরী

বান্দরবান জেলার আলীকদম উপজেলা সদরের মধ্য দিয়ে বয়ে চলে গেছে মাতামুহুরী নদী। এই নদীটি আরাকানের আদ্রিমালা পর্বত হতে নির্গত হয়ে আলীকদম, লামা ও কক্সবাজারের চকরিয়া উপজেলার মধ্য দিয়ে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে। এর দৈর্ঘ্য ২৮৭ কিলোমিটার। এই নদী এ জেলার জনসাধারণের বিশেষ করে নদীর ধারে বসবাসকারী মানুষের জন্য নিত্যদিনের ব্যবহারের পানির উৎস হিসেবে এবং দুর্গম পাহাড়ি জনপদে যাতায়াত ও উৎপাদিত পণ্য পরিবহনের ক্ষেত্রে যোগাযোগের পথ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। পাহাড়ি জনপদের সকল সংস্কৃতির ধারক এবং বাহক এ মাতামুহুরী নদী।

এককালে মাতামুহুরী নদীর ঘাটে ভিড়ত মিয়ানমার ও ভারতের পণ্যবাহী বড় বড় ট্রলার ও নৌকা। নৌপথে যাতায়াত করা যেত দেশের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে। যা এখন শুধুই স্মৃতি। এ স্রোতস্বিনী খরস্রোতা মাতামুহুরী বান্দরবানের লামা-আলীকদম ও কক্সবাজারের চকরিয়া-পেকুয়ার বুক চিরে প্রবাহিত হয়েছে। এ নদীকে ঘিরে এ অঞ্চলের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও মানুষের জীবনধারা সৃষ্টি হয়েছে। আর নদীর চরের পলি পড়া উর্বর জমিতে শুষ্ক মৌসুমে সবজি ও বোরোক্ষেত করে এখানকার কৃষকরা সোনার ফসল ফলায়। এক সময় এ নদীতে জেলেরা জাল ফেলে বিভিন্ন প্রজাতির মাছ এমনকি ইলিশসহ বিভিন্ন সামুদ্রিক মাছও ধরতো।

মাতামুহুরী নদীর উজানে ছবি

গত ১৫-১৬ বছর ধরে নদীর দৈন্যদশা শুরু হয়েছে। এখন এ নদী শুষ্ক মৌসুমে মরা, বর্ষায় বেপরোয়া হয়ে ওঠে। এ নদীকে ঘিরে এ অঞ্চলের ইতিহস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও মানুষের জীবনধারার সৃষ্টি হয়েছে। আর নদীর তীরে চরের পলি পড়া উর্বর জমিতে শুষ্ক মৌসুমে সবজি ও বোরোক্ষেত করে এখানকার কৃষকরা সোনার ফসল ঘরে তোলে।

আঠারো শতকে পার্বত্য চট্টগ্রামের শাসনকর্তা টিএইচ লুইনের বর্ণনায় আদিকালের মাতামুহুরী নদীর সম্পর্কে জানা যায় যে, মাতামুহুরী বা মুরিখ্যং নদী অগভীর। নদীর গতিটা নিজেই এক ঘেঁয়ে, তথাপি এর কয়েকটা শাখা নদী উজানে বিশেষত পাহাড়ে অবস্থিত। এগুলো উৎসস্থলের কাছাকাছি এলাকায় দৃশ্যটা অবিমিশ্রভাবে সুন্দর হয়েছে। মাতামুহুরী নদীতে জলপ্রপাত না থাকলেও অসংখ্য শাখা নদী বা ছড়া রয়েছে। নদীটা একটা সংকীর্ণ নুড়িপাথরে পরিপূর্ণ খাদ বেয়ে উচ্ছলগতিতে প্রবাহিত হয়েছে। নদীর তীর প্রায় খাঁড়াভাবে এতই উপর থেকে উঠেছে যে, সূর্যটা কেবলই ঝলকিয়ে ঝলকিয়ে এখানে সেখানে নজরে আসে। প্রচুর পূর্ণাঙ্গ বৃক্ষ আমাদের মাথার প্রায় ৫০ ফুট উপরে ঝুলছে। একই সাথে গর্জন বৃক্ষের সোজা কাণ্ডগুলো ডালপালা ছাড়া একটা মন্দিরের সাদা স্তম্ভের মতো উপরে উঠে গেছে। পান্নার স্বচ্ছ ঝুলানো প্রশস্ত পত্রবৎ উপাঙ্গযুক্ত বটবৃক্ষগুলো পশ্চাদ্ভাগের উচ্চ জঙ্গলের কালো সবুজ দেয়ালের এক ঘেঁয়ে অবস্থান ভেঙে দিয়েছে এবং বাঁকানো লতাগুলো কোনো পুরাতন বিশাল বৃক্ষের দেহগ্রন্থি বেয়ে নদীর এপাড় থেকে ওপাড়ে আড়াআড়িভাবে প্রকৃতির নিজস্ব ধাঁচে একটা সেতু রচনা করেছে।

মাঝেমধ্যে আমরা সবুজ গাছপালায় আচ্ছাদিত নদীতীরে নির্জন স্থানে এসে যাই। সেখানে পর্দার পেছনে একটা জলপ্রপাতের টুংটাং শব্দ শোনা যায়। সেখানে নদীর প্রবেশ পথে রয়েছে গোলাকার পাথর এবং বিশালখণ্ডের একটা বিরাট ধূসর স্তূপ। নীলবর্ণের আঁকা-বাঁকা ডোরা বন্দনীযুক্ত রূপালি মাছগুলো আমার নৌকা বেয়ে যাওয়ার সময় আলোর ঝলকানির মতো করে আমাদের সমানেই স্রোতের উজানে চলে যাচ্ছে।

বর্তমান অবস্থা

মাতামুহুরী নদীর নীচের দিকে চকরিয়া ও পেকুয়া উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় নদীর তীরে জেগে ওঠা চরে অবাধে বাঁধ দিয়ে ঘের তৈরি করা হয়েছে। এতে নদী সংকুচিত হয়ে স্বাভাবিক চলাচলে বাঁধাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। এছাড়া নদীর সংযোগ খালগুলোও মানুষের অবৈধ দখলে চলে গেছে। ফলে পানি চলাচল বিঘ্নিত হয়ে নদী ভরাট হয়ে নাব্যতা হারিয়েছে। সংশ্লিষ্ট লোকজনের সাথে আলাপে জানা গেছে, মাতামুহুরী নদী আট জায়গায় ১০-১২ বছরের মধ্যে অন্তত আটটি বড় সেতু নির্মাণ করা হয়েছে। বর্তমানে দুটি রাবার ড্যাম নির্মাণাধীন রয়েছে। এসব অপরিকল্পিত স্থাপনাও নদী ভরাট হওয়ার অন্যতম কারণ বলে চিহ্নিত করা হচ্ছে। বর্তমানে মাতামুহুরী নদী শুষ্ক মৌসুমে আশীর্বাদ হলেও বর্ষায় মানুষের জন্য অভিশাপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রতিবছর বন্যা ও ভাঙনে সর্বস্বান্ত হচ্ছে অগণিত মানুষ।

তৈন খাল

এ খালটি চিম্বুক পাহাড়ের পশ্চিম প্রান্তে উৎপত্তি হয়ে আলীকদম উপজেলা সদরের পূর্বপার্শ্বে সেনা জোন সদরের নিকটবর্তী স্থানে মাতামুহুরী নদীর মোহনায় মিলিত হয়েছে। এই খালটি আলীকদম উপজেলার তৈন মৌজার জনসাধারণের নিত্যদিনের ব্যবহারের পানির উৎস হিসেবে এবং দুর্গম পাহাড়ি জনপদে যাতায়াত ও উৎপাদিত পণ্য পরিবহনের ক্ষেত্রে যোগাযোগের পথ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। অতীতে আরাকানিদের দ্বারা দনাংরা (তঞ্চঙ্গ্যা) অত্যাচারিত হয়ে বিতাড়িত হলে ১৪১৮ খ্রিষ্টাব্দে মৈসাং রাজপুত্র 'মারেক্যা' ও তৈন সুরেশ্বরীর নেতৃত্বে আরাকান থেকে দুর্গম গিরিপথ অতিক্রম করে দৈনাংরা পার্বত্য আলীকদম অঞ্চলে পালিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করে। তারা তৈন খালের পার্শ্ববর্তী স্থানে বসতি স্থাপন করে। জ্যেষ্ঠভ্রাতা 'মারেক্যা' মৃত্যুবরণ করলে তার ভাই 'তৈন সুরেশ্বরী' রাজ্যভার গ্রহণ করে। তৈন সুরেশ্বরীর নামানুসারে এই খালটির নামকরণ করা হয় তৈন খাল।

ট. গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান

বান্দরবান সরকারি কলেজ

বান্দরবান সরকারি কলেজ বান্দরবানের একটি ঐতিহ্যবাহী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। বান্দরবান জেলার কেন্দ্রস্থলে প্রাকৃতিক মনোরম পরিবেশে এ কলেজের অবস্থান। কোলাহলমুক্ত নৈসর্গিক পরিবেশ কলেজটির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। পাহাড়ের পাদদেশে প্রাকৃতিক এক নয়নমুগ্ধ পরিবেশে একাডেমিক ও প্রশাসনিক ভবনের দৃষ্টিনন্দন স্থাপত্য সৌকর্যে গড়ে উঠেছে কলেজের ক্যাম্পাস। বিজ্ঞান ভবন, ছাত্রাবাস, মসজিদ, শহিদ মিনার, খেলার মাঠ কলেজটির বহিরাঙ্গন দৃশ্যপটে সৌন্দর্যের এক অনুপম মাত্রা যোগ করেছে।

১৯৭৫ সালে কলেজটি প্রতিষ্ঠা করেন প্রয়াত বোমাং রাজা মংশৈপ্রু চৌধুরী। ১৯৮০ সালে মার্চ মাসে কলেজটিকে জাতীয়করণ করা হয়। উচ্চ মাধ্যমিক কলেজ হিসেবে যাত্রা শুরু করে পরবর্তীকালে স্নাতক (কলা), ১৯৯৬ সালে স্নাতক (ব্যবসা শিক্ষা) এবং ১৯৯৮ সালে স্নাতক (বিজ্ঞান) কোর্স চালুর মাধ্যমে কলেজটি পূর্ণাঙ্গ ডিগ্রি কলেজের মর্যাদা লাভ করে। শিক্ষা সম্প্রসারণে এ কলেজে ২০০১ সালে ৩টি বিষয়ে অনার্স কোর্স প্রবর্তন করা হয়। বর্তমানে ব্যবস্থাপনা, অর্থনীতি ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়ে অনার্স কোর্স চালু রয়েছে। আরও কয়েকটি বিষয় প্রর্বতনের প্রস্তাব সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তর ও মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন আছে। বর্তমান বিশ্বের তথ্য-প্রযুক্তির অগ্রগতি ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার অঙ্গীকারের সাথে সংগতি রেখে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে কম্পিউটার কোর্স চালু করা হয়েছে। এছাড়া একটি সুদৃশ্য অত্যাধুনিক কম্পিউটারে ল্যাব রয়েছে যার মাধ্যমে কলেজের শিক্ষার্থী ছাড়াও অত্র অঞ্চলের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কম্পিউটার প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে।

শিক্ষাক্ষেত্রে বান্দরবান সরকারি কলেজের প্রশংসনীয় ভূমিকার স্বীকৃতিস্বরূপ অত্র কলেজ জেলা পর্যায়ে একাধিকবার শ্রেষ্ঠ কলেজের গৌরব অর্জন করেছে। ১৯৮৯, ১৯৯০, ১৯৯৭ ও ২০০০ সালে এ কলেজ জেলার শ্রেষ্ঠ কলেজ হিসেবে বিবেচিত হয়।

১৯৯১ সালে এ কলেজ থেকে রোভার স্কাউটে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করে। ২০১২ সালে জাতীয় গণসংগীত প্রতিযোগিতায় বান্দরবান সরকারি কলেজ থেকে জাতীয়ভাবে 'গ' গ্রুপে ১ম স্থান অধিকার করে।

বান্দরবান সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়

বান্দরবানে বান্দরবান সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের রাজনৈতিক ও সামাজিক অঙ্গনে বিশেষভাবে ভূমিকা রয়েছে। এটি এলাকার একটি ঐতিহ্যবাহী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। এ স্কুলের অনেক ছাত্রছাত্রী বর্তমানে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনের উজ্জ্বল নক্ষত্র। সমকালীন বাংলা সাহিত্যের প্রবাদ পুরুষ ও নন্দিত কথাসাহিত্যিক হুমায়ুন আহমেদ, বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী দীপঙ্কর তালুকদার এমপি, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান বীর বাহাদুর (উশৈসিং) এমপি, শাহজালাল প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ও বিশিষ্ট লেখক ও গবেষক ড. মোহম্মদ জাফর ইকবাল, আব্দুল ওয়াহাব (যুগ্ম সচিব), প্রসন্ন কান্তি তঞ্চঙ্গ্যা (বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ), সুকৃতি রঞ্জন চাকমা (অতিরিক্ত সচিব), এককালের বিটিভি সংবাদ পাঠিকা শামীমা নাসরিন– তাঁরা সবাই এই বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেছিলেন। বিদ্যালয়টি বান্দরবান শহরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত। এক নয়নমুগ্ধ পরিবেশে একাডেমিক ও প্রশাসনিক ভবনের দৃষ্টিনন্দন স্থাপত্যে গড়ে উঠেছে এই বিদ্যালয়টি।

ঐতিহ্যবাহী এই বিদ্যালয়টি ১৯৫০ সালে নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয় হিসেবে স্থাপিত হলেও ১৯৬২ সালে এই বিদ্যালয়কে জাতীয়করণ করা হয় এবং ১৯৬৪ সালে ৯ম শ্রেণি খোলার মাধ্যমে উচ্চ বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়। এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে প্রয়াত বোমাং রাজা মং শৈ প্রু চৌধুরী ও প্রয়াত বোমাং রাজা অং শৈ প্রু চৌধুরীর বিশেষ ভূমিকা রয়েছে।

ডনবস্কো উচ্চ বিদ্যালয়

এই বিদ্যালয়টি বান্দরবান পার্বত্য জেলার একটি ঐতিহ্যবাহী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। প্রাকৃতিক মনোরম ও এক নয়নমুগ্ধ পরিবেশে এ বিদ্যালয়টি গড়ে উঠেছে। ১৯৫৮ সালের ১৮ জানুয়ারি দু'জন শিক্ষক ও ৩০ জন ছাত্রছাত্রী নিয়ে এই ঐতিহ্যবাহী বিদ্যালয়টির যাত্রা শুরু। ছাত্রছাত্রীদের আবাসন অসুবিধার কারণে প্রত্যন্ত এলাকার অভিভাবকদের দাবির কারণে বিদ্যালয়ের মালখানা হিসেবে ব্যবহৃত কক্ষটিকে খালি করে ছাত্রাবাস করা হয়। খ্রিষ্টান মিশনারিদের পৃষ্ঠপোষকতায় এই বিদ্যালয়ের কার্যক্রম পরিচালিত হয় বলেই ১৯৫৮ সালের ১৫ মার্চ বিদ্যালয়টি মিশন স্কুল হিসেবে এলাকায় পরিচিতি ও জনপ্রিয়তা লাভ করে। ডনবস্কো ছাত্রাবাস ও ডনবস্কো স্কুল নামকরণের স্বার্থকতা হলো, ইটালীয় এক ক্যাথলিক ধর্মযাজক ও শিক্ষাদরদি ডনবস্কোকে স্মরণীয়-বরণীয় ও অম্লান করে রাখার জন্য তাঁরই নামানুসারে এই মিশন স্কুলের নামকরণ করা হয়। এই মিশন স্কুল ও মিশন বোর্ডিং–এর সুনাম দ্রুত এতদ্অঞ্চলের জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়লে ক্যাথলিক মিশন কর্তৃক ডনবস্কো স্কুলকে প্রাথমিক শিক্ষার গণ্ডিতে আবদ্ধ না রেখে জনগণের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে স্কুলটিকে ক্রমান্বয়ে নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উন্নীত করা হয়। এই স্কুলের শৃঙ্খলা, নীতি-নৈতিকতা এবং গুণগত শিক্ষাদানের নিশ্চয়তার জন্য

তৎকালীন বান্দরবান মহকুমা প্রশাসক, সার্কেল অফিসার ও অন্যান্য সরকারি কর্মকর্তাদের ছেলে মেয়েদেরকে এই স্কুলে ভর্তি করতে আগ্রহী হন।

এই স্কুলটি ১ জানুয়ারি ১৯৭৬ সালে ৯ম শ্রেণি চালু করার মাধ্যমে ডনবস্কো উচ্চ বিদ্যালয়ের কার্যকারিতা শুরু হয়ে যায় এবং ১৯৭৮ সালে কুমিল্লা শিক্ষাবোর্ডের অধীনে ডনবস্কো উচ্চ বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির ছাত্রছাত্রীগণ প্রথম এসএসসি পরীক্ষায় অংশ-গ্রহণের সুযোগ পায়। বর্তমানে এই বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীগণের মধ্যে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, ব্যাংকার, সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রশাসক, শিক্ষক, উকিল, ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বার ও চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান, পৌর মেয়র, কাউন্সিলর, বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান, পুলিশ, বিজিবি এবং সেনাবাহিনীতে উচ্চ পদে কর্মরত আছেন।

ঠ. ঐতিহাসিক স্থাপনা

বোমাং রাজপ্রাসাদ (রাজবাড়ি)

এই বোমাং রাজপ্রাসাদটি বান্দরবান জেলা শহরের মধ্যমপাড়া ও উজানীপাড়ার মধ্যবর্তীস্থানে অবস্থিত। উত্তরে শঙ্খ নদী, দক্ষিণে বান্দরবান বাজার, পূর্বে বান্দরবানের ক্যাথলিক মিশনের ঐতিহ্যবাহী ডনবস্কো উচ্চ বিদ্যালয় ও উজানী পাড়া। প্রাসাদটি এক একর সমতল ভূমির উপর নির্মিত। ইহার দৈর্ঘ্য ১১০ ফুট এবং প্রস্থ ৬০ ফুট। তিনতলা বিশিষ্ট এই প্রাসাদটি পোড়ামাটি (ইট) ও সাদা চুনে নির্মিত। সে সময়ে সুদূর চট্টগ্রাম থেকে এসব প্রাসাদ নির্মাণ সামগ্রী আনা হয়েছে এবং মায়ানমারের আরাকান থেকে দক্ষ নির্মাণ শ্রমিক এনে এই রাজপ্রাসাদটি নির্মাণ করা হয়েছে। ইহার নক্সা বর্গাকার এবং প্রাসাদের প্রাচীর গড়পরতা পরিমিতি ৬০ ফুটের মতো। প্রাসাদের ছাদ নির্মাণে কাঠ ও লোহার ব্যবহার লক্ষ করা যায়।

বোমাং রাজবাড়ি

প্রাসাদের পূর্বপাশে একটি দিঘি অবস্থিত। প্রাসাদের মধ্যভাগে উপর ও নীচু তলায় খোলা স্থান রাখা হয়েছে। এই ফাঁকাস্থান প্রাসাদে প্রবেশ ও বাহির পথ হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এই স্থান দিয়ে উপরে ওঠার কাঠের সিঁড়ি আছে। প্রাসাদটির সম্মুখভাগে আটটি দরজা ও বারোটি জানালা রয়েছে এবং পূর্বপ্রান্তে আটটি জানালা ও একটি দরজা রাখা হয়েছে। প্রাসাদের তোরণই রাজ প্রাসাদের ঢোকার একমাত্র পথ। প্রবেশ তোরণের নিকটবর্তী অঙ্গন উন্মুক্ত। উন্মুক্ত অঙ্গনের পাশেই প্রাসাদটির মূল অংশ। মধ্যবর্তী অংশ হলো হলকক্ষ এবং হলকক্ষ হয়েই ভিতরে প্রবেশ করতে হয়।

১৯৩৪ সালে তৎকালীন বোমাং রাজা বোমাংগ্রী ক্য জ সান এই প্রাসাদটি নির্মাণ করেন। সামনে বারান্দার স্তম্ভগুলো চতুষ্কোণী এবং প্রশস্ত। কক্ষসমূহকে রঙিন প্রস্তর খণ্ড দিয়ে অলংকরণ করা হয়েছে। আর স্তম্ভগুলোতে নানা ধরনের নক্সা খোদাই করা হয়েছে। এই নক্সাসমূহের কেন্দ্রস্থল বিভিন্ন আকৃতির পুষ্পপত্র বা লতাপাতার নক্সায় অঙ্কিত করা হয়েছে। নক্সাগুলোতে আরাকানিদের স্থাপত্যের নিদর্শনের ছাপ বিদ্যমান। যার কারণে প্রাসাদটি বিশেষ মর্যাদার অধিকারী হয়েছে। ইহা বান্দরবান জেলার ঐতিহাসিক স্থাপত্য হিসেবে বিবেচিত।

এই প্রাসাদে বসে তৎকালীন বোমাং রাজারা শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। প্রাসাদের দ্বিতীয় তলায় উত্তর পাশে ক্ষুদ্রাকারে দুটি সংযুক্ত কক্ষ নির্মাণ করা হয়েছে। এই বিশেষ কক্ষে বোমাং রাজা ব্যতিত কেউ প্রবেশাধিকার রাখে না। বোমাং রাজা ক্য জ সান এই বিশেষ কক্ষে বসে শঙ্খ নদীর স্রোতস্বিনী ও প্রকৃতির অপরূপ দৃশ্য অবলোকন করতে করতে বিশ্রাম নিতেন।

ঙ. রাজনৈতিক ঐতিহ্য ও ব্যক্তি

বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির উজ্জ্বল উদাহরণ হলো বান্দরবান পার্বত্য জেলা। এই জেলায় পাহাড়ি ও বাঙালি উভয়ে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিকে সুদৃঢ় করেছে। যুগ যুগ ধরে পাহাড়ি ও বাঙালিরা এখানে শান্তি ও সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে বসবাস করে আসছে। এই শান্তি, সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির পরিবেশ সৃষ্টির পেছনে এখানকার রাজনৈতিক ও সুশীল সমাজের যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে। এ জেলায় জাতীয় ও আঞ্চলিক বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠন থাকলেও তাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব, সংঘাত নেই বললেই চলে। যে কোনো সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদিতে তাদের মধ্যে এক সাথে স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ দেখা যায়। এটিই বান্দরবান পার্বত্য জেলার রাজনৈতিক ঐতিহ্য।

মং শৈ প্রু চৌধুরী (১৪তম বোমাং রাজা)

মং শৈ প্রু চৌধুরী ১৯১৫ সালে বান্দরবান বোমাং রাজ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম বোমাংগ্রি ক্য জাইন প্রু। মাতার নাম রানি হ্নং হ্লা প্রু। দু'ভাই দু'বোনের মধ্যে তিনি জ্যেষ্ঠ। তিনি ১৯৩৫ সালে চট্টগ্রাম সেন্ট প্লাসিডস্ হাই স্কুল থেকে কৃতিত্বের সাথে মেট্রিক পাশ করেন। উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য তিনি কলকাতায় স্কটিশ চার্চ কলেজে ভর্তি হন। সেখান থেকে কৃতিত্বের সাথে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করার পর চট্টগ্রামে চলে

এসে চট্টগ্রাম সরকারি কলেজে স্নাতক শ্রেণিতে ভর্তি হন। ঠিক চূড়ান্ত পরীক্ষার পরে জাপানীরা চট্টগ্রামে বোমাবর্ষণ করে এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়। তখন তিনি নিজ বাড়ি বান্দরবানে চলে আসেন এবং ব্রিটিশ সরকারকে সহযোগিতা প্রদান করেন।

১৯৪৮ সালে তিনি ২২তম পি.এন.জি (পাকিস্তান ন্যাশনাল গার্ড) ব্যাটালিয়ানে পূর্ণ লেফটেন্যান্ট পদে নিয়োগ পান। সে পদে তিনি দীর্ঘ আড়াই বছর দায়িত্ব পালন করেন। তিনি পাকিস্তান মিলিটারি সদরদপ্তর রাওয়ালপিন্ডি থেকে কমিশনপ্রাপ্ত হয়ে পরবর্তীতে 'ডি' কোম্পানির কমান্ডার হিসেবে নিয়োগ লাভ করেন. পরবর্তীকালে তিনি ওয়েলফেয়ার অফিসার হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন এবং মেজিস্ট্রেটের সমমর্যাদায় ১৫ বছর কাজ করেন।

১৯৬৫ সালে পাকিস্তান মুসলিম লীগের প্রার্থী হিসেবে তিনি পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক পরিষদে বিপুল ভোটে প্রাদেশিক সদস্য নির্বাচিত হন। অতপর তিনি মন্ত্রী হিসেবে স্বাস্থ্য, শ্রম ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের দায়িতৃপ্রাপ্ত হন এবং পরবর্তীকালে গণপূর্ত, বিদ্যুৎ ও সেচ মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি গভর্নর আজম খানের উপদেষ্টা পরিষদের অন্যতম সদস্য ছিলেন। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর কাজের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে ও মানুষের প্রতি আন্তরিক ভালোবাসা দেখে ১৯৭৫ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের জেলা গভর্নর পদে নিয়োগ করেন। ১৯৮৬ সালে ৭ মে তৃতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিপুল ভোটে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন।

বোমাং রাজা মং শৈ প্রু চৌধুরী

১৯৮৮ সালে ৩ মার্চ অনুষ্ঠিত নির্বাচনে বিপুল ভোটে বান্দরবানের বোমাং রাজা মং শৈ প্রু চৌধুরী পুনরায় জাতীয় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। তৎকালীন বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট সদস্যমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য ছিলেন। ডাক ও টেলিফোন মন্ত্রণালয়ের সংসদীয় কমিটির সদস্য ছিলেন। শিক্ষাদীক্ষায় ও আর্থ-

সামাজিকভাবে পিছিয়ে পড়া বান্দরবান অধিবাসীদের সুশিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে দেশের একজন সুনাগরিক হয়ে ওঠার জন্য তিনি বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি রাজার মাঠ সংলগ্ন ৫ শতক জায়গা বান্দরবান সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের নামে দান করেন। তিনি বান্দরবান সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপনের জন্যও অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। তিনি বান্দরবান সরকারি কলেজের প্রতিষ্ঠাতা এবং সচিব ছিলেন। সে সময় তিনি কলেজ স্থাপনসহ এইচ.এস.সি পরীক্ষা কেন্দ্র আনয়ন এবং বান্দরবান কলেজকে পূর্ণ ডিগ্রি কলেজে রূপান্তরিতকরণে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন।

তিনি মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালনের সময় ১৯৬৮ সালে চন্দ্রঘোনা হাসপাতালের হীরক জয়ন্তী উৎসবে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ত, বিদ্যুৎ ও সেচ মন্ত্রী হিসেবে উদ্বোধন ও ভিত্তি স্থাপন করেন। ১৯৬৭ সালে ঢাকা মতিঝিলে অবস্থিত পলওয়েল শপিং সেন্টারে 'বুলবুল সেন্টার'-এর উদ্বোধন করেন। ঢাকা শহর বিস্তৃতির সাথে সাথে আবাসিক এলাকায় এ ধরনের শপিং সেন্টার গড়ে ওঠার প্রয়োজনীয়তা এবং গুরুত্ব সম্পর্কে তিনি আলোকপাত করেন। ১৯৬৭ সালে ১৮ জানুয়ারি গাইবান্ধা জেলার চান্দিপুরে কৃষি, স্বাস্থ্য ও শিক্ষাবিষয়ক প্রদর্শনী উদ্বোধন করেন। ১৯৬৫ সালে স্বাস্থ্য মন্ত্রী হিসেবে নরসিংদি স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স উদ্বোধন করেন এবং ১৯৬৭ সালে ১৫ নভেম্বর সিরাজগঞ্জে পূর্ব পাকিস্তান পানি ও বিদ্যুৎ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের সাব স্টেশন শুভ উদ্বোধন করেন। ১৯৫৯ সালে তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা উ ক্য জ সাইন পরলোক গমন করলে তিনি ১৪ তম বোমাং রাজা হিসেবে সিংহাসনে আরোহণ করেন। ১৯৯৬ সালের ১৬ জুন তিনি পরলোগ গমন করেন।

অং শৈ প্রু চৌধুরী (১৫তম বোমাং রাজা)

অং শৈ প্রু চৌধুরী ১৯১৫ সালে বান্দরবানে বোমাং রাজবাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা প্রয়াত রাজকুমার থুই অং প্রু নবম বোমাংগ্রি সাক হ্নাই গ্রো এর পঞ্চম পুত্র। মাতার নাম স্বর্গীয় রাজকুমারী হ্লা মো সাং। অং শৈ প্রু চৌধুরী চট্টগ্রামের সেন্ট প্লাসিড বিদ্যালয়ে ইংলিশ মিডিয়ামে লেখাপড়া শুরু করেন। স্কুলজীবন শেষে কলকাতায় স্কটিশ চার্চ কলেজে অধ্যয়ন করেন। সে সময়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণে কলেজ জীবন অসমাপ্ত হয়ে যায়।

১৯৪১ সালে চট্টগ্রাম ফ্রন্টিয়ার পুলিশ ফোর্সে সাব ইন্সপেক্টর পদে যোগদান করেন। তিনি দীর্ঘদিন এ পদে কর্মকালীন অবস্থায় প্রত্যন্ত পার্বত্য অঞ্চলে বিভিন্ন এলাকায় আবাসিক স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৫০ সালে দ্বিতীয় শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট (সম্মানসূচক) হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি বান্দরবান সদরে প্রথম নির্বাচিত ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা কাউন্সিলের প্রথম নির্বাচিত ভাইস চেয়ারম্যান। জনসেবা কাজে সফল নেতৃত্বের জন্য তিনি ১৯৬২ সালে শ্রেষ্ঠ সমবায়ী হিসেবে পুরস্কার লাভ করেন এবং ১৯৬৮ সালে তদান্তিন সরকার কর্তৃক টি.কে খেতাবে ভূষিত হন।

বোমাং রাজা অং শৈ প্রু

১৯৭০ সালের ১৭ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে পার্বত্য চট্টগ্রামের দুটি আসনের মধ্যে বান্দরবান থেকে অং শৈ প্রু চৌধুরী স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য পদে নির্বাচিত হন। নির্বাচিত হওয়ার পর তিনি মন্ত্রী হিসেবে সংখ্যালঘু, সমবায়, প্রাণিসম্পদ বিভাগ, বন ও পরিবেশ এবং মৎস মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭৯ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে তিনি পুনরায় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রতিমন্ত্রী হিসেবে খাদ্য, জনশক্তি, সিভিল এভিয়েশন, পর্যটন, ডাক ও টেলিযোগাযোগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পালন করেন।

তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামে সমবায় আন্দোলনেরও অগ্রদূত। এ সমবায় সংগঠনের মাধ্যমে এলাকার সাধারণ মানুষকে সুদব্যবসায়ী মহাজনদের শোষণ থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার ব্যাপারে অনন্য অবদান রাখেন। স্বাধীনতা উত্তর সময়েও জাতীয় সংসদের সদস্য ও মন্ত্রী পদে অধিষ্ঠিত হয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রভূত উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের সূচনা করেন। বান্দরবানে সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, গার্লস হাই স্কুল, বান্দরবান সরকারি কলেজসহ বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠায় অবদান রাখেন। তাছাড়া ক্যাডেট কলেজ, কারিগরি ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের সকল উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পার্বত্যবাসীদের জন্য ভর্তির সংরক্ষিত আসনব্যবস্থা, টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা, ফায়ার ব্রিগেড স্থাপন ও বান্দরবানকে জেলা পর্যায়ে উন্নীতকরণে তাঁর অগ্রণী ভূমিকা রয়েছে। তিনি ১৯ নভেম্বর ১৯৯৮ সালে বোমাং সার্কেলের ১৫তম বোমাং রাজপদে অধিষ্ঠিত হন। ২০১২ খ্রিষ্টাব্দে ১ আগস্ট তাঁর মহাপ্রয়াণ ঘটে।

বীর বাহাদুর (উশৈসিং) এমপি

বীর বাহাদুর উশৈসিং এমপি ১০ জানুয়ারি ১৯৬০ সালে বান্দরবান জেলা শহরে এক সাধারণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম লালমোহন বাহাদুর। প্রাইমারি শিক্ষা শেষে বান্দরবান সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে তাঁর শিক্ষাজীবন শুরু হয়। বান্দরবান সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ১৯৭৬ সালে এসএসসি পাশ করেন। এরপর তিনি প্রথমে চট্টগ্রাম সরকারি কলেজে ভর্তি হন এবং পরে বান্দরবান সরকারি কলেজ থেকে এইচএসসি পাশ করেন। ১৮৮৩ সালে তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে এম.এ পাশ করেন।

১৯৮৯ সালে বান্দরবান স্থানীয় সরকার পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন এবং ১৯৯১ থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রার্থী হিসেবে এ পর্যন্ত টানা চার চারবার সাংসদ নির্বাচিত হয়ে আসছেন। ১৯৮৬ সালে আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি সংলাপ কমিটির অন্যতম সদস্য ছিলেন। ১৯৯৮ সাল থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের সিনিয়র সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ ফুটবল রেফারি সমিতির চেয়ারম্যান ও ১৯৯৮ সালে উপমন্ত্রীর পদমর্যাদায় পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন।

১৯৯৭ সালে ফিফা বিশ্বকাপ ফুটবল কোয়ালিফাই রাউন্ডে অংশগ্রহণের লক্ষ্যে মালয়েশিয়া সফর করেন এবং বাংলাদেশ ফুটবল দলের টিম লিডার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। অস্ট্রেলিয়ায় অনুষ্ঠিত অলিম্পিক ২০০০-এ বাংলাদেশ দলের চিফ দা মিশন হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এক সময়ে তিনি বান্দরবানের ফুটবল টুর্নামেন্টে খেলা পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেন।

· তিনি ছাত্রজীবনে বান্দরবান জেলা ছাত্রলীগের দপ্তর সম্পাদক, বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির প্রেসিডিয়াম সদস্য, ১৯৯২ সালে বান্দরবান জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং বান্দরবান জেলা স্কাউটের কমিশনারের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ২০০২ সালে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক এবং জাতীয় সংসদে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সংসদীয় দলের হুইপ নির্বাচিত হন।

বীর বাহাদুর উশৈসিং এমপি বান্দরবান প্রেসক্লাব এবং রেডক্রিসেন্ট ইউনিটের আজীবন সদস্য। তিনি বৃক্ষরোপণে বিশেষ অবদানের জন্য পুরস্কৃত হন। পার্বত্য চট্টগ্রাম মন্ত্রণালয়ের অধীনে মিয়ানমার, থাইল্যান্ড, ফিলিপাইন ও চীন সফর করেন। বাংলাদেশ বিমানের লন্ডন-নিউইয়র্ক ফ্লাইট উদ্বোধনের জন্য তিনি আমেরিকা সফর করেন। জাতিসংঘের সাধারণ সভায় তিনি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সফরসঙ্গী ছিলেন। ইউনেস্কো শান্তি পুরস্কার গ্রহণের জন্য প্রধানমন্ত্রীর সফরসঙ্গী হিসেবে তিনি ফ্রান্স সফর করেন। ২০০৬ সালে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির আমন্ত্রণে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রতিনিধি দলের সদস্য হিসেবে তিনি চীন সফর করেন। ২০০৮ সালে সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী হিসেবে তিনি বিপুল ভোটে নির্বাচিত হন এবং দ্বিতীয় বারের মতো তিনি পুনরায় প্রতিমন্ত্রী পদমর্যাদায় পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডেও চেয়ারম্যান

হিসেবে দায়িত্ব পান। ২০১২ সালের ২৩ জুলাই দ্বিতীয় বারের মতো বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদকের দায়িত্ব পান।

ঢ. বিখ্যাত গায়ক, শিল্পী ও কবিয়ালের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

অরুণ সারকী

বান্দরবান জেলার সংগীতাঙ্গনে অরুণ সারকী এক উজ্জ্বল নক্ষত্রের নাম। এ জেলার সাংস্কৃতিক ইতিহাস রচনা করতে হলে এই গুণী শিল্পী অরুণ সারকীর নাম প্রথমেই উল্লেখ করতে হয়। এই গুণী শিল্পী ১৯৬১ সালের ১৮ জুন তারিখে বান্দরবানে শ্রী চন্দ্রকুমার সারকী ও শ্রীমতি ধীরমতি ত্রিপুরার সংসারে জন্মগ্রহণ করেন। পাঁচ ভাই ও তিন বোনের মধ্যে তিনি সপ্তম সন্তান। এই গুণী শিল্পী সত্তর দশকে আলোড়ন সৃষ্টিকারী ও অত্যন্ত জনপ্রিয় এবং বিখ্যাত মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র 'মেঘের অনেক রং' এর নায়িকা রিনা সারকী (মাথিন) এর ছোটো ভাই।

অরুণ সারকী

অরুণ সারকী শুধু গানে নয়, তিনি সুদক্ষ গিটারিস্ট, কিবোর্ডিস্ট ও তবলা বাদক ছিলেন। বান্দরবানে এমন এক সময় ছিলো, অরুণ সারকী না থাকলে কোনো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পূর্ণতা হতো না। অরুণ সারকী ১৯৭৮ সালে এসএসসি পাশ করেন এবং ১৯৮১ সালে বিজ্ঞান বিভাগে বান্দরবান সরকারি কলেজ থেকে কৃতিত্বের সাথে এইচএসসি পাশ করেন।

১৯৮৬ সালে ৩০ অক্টোবরে বান্দরবান জেলা প্রশাসক কার্যালয়ে চাকুরিতে যোগদান করেন। চাকুরি জীবনেও তিনি সকলের প্রশংসার পাত্র ছিলেন। অফিসের কাজের ফাঁকে ফাঁকে তিনি সংগীত চর্চায় মগ্ন থাকতেন। ১৯৮১ সালে 'স্বরলিপি' শিল্পীগোষ্ঠী প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তিনি বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। তিনি 'স্বরলিপি শিল্পীগোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম একজন। স্বরলিপির প্রশিক্ষক হিসেবে তিনি

নিরলসভাবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ২৭ নভেম্বর ২০১১ সালে সকল শুভাকাঙ্ক্ষী, শুভানুধ্যায়ী ও ভক্তদের ছেড়ে পরলোকে চলে যান।

থায়াইচিং প্রু নিলু

থোয়াইচিং প্রু নিলু বান্দরবান পার্বত্য জেলার একজন বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী। ১৯৬১ সালে জন্ম নেয়া থোয়াইচিং প্রু নিলুর পিতার নাম মৃত মংহ্লা অং। মা বাবার সংসারে চারভাই ও এক বোনের মধ্যে নিলু পঞ্চম সন্তান। বড় ভাই শৈচিংপ্রু আর ছোটো বোন ডসাংপ্রুও বান্দরবানের সুপরিচিত সংগীত শিল্পী। সাংস্কৃতিক পরিবারে সাংস্কৃতিক পরিবেশে বেড়ে ওঠা নিলু ছোটোকাল থেকেই সংগীতের প্রতি প্রচণ্ড আগ্রহী ছিলেন। শৈশবেই বড়ো ভাই শৈ চিং প্রুর নিকট সংগীতে হাতে খড়ি নেন। পরে বান্দরবান পার্বত্য জেলার প্রথম সুশৃঙ্খল সাংস্কৃতিক সংগঠন 'মারমা রয়েল শিল্পী গোষ্ঠীর' অন্যতম সদস্য ছিলেন। বান্দরবানের যে কোনো অনুষ্ঠানের একজন অপরিহার্য শিল্পী হিসেবে থোয়াইচিং প্রু নিলুর বেশ কদর রয়েছে। বান্দরবান ছাড়াও দেশের জাতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে নিলু বহুবার অংশগ্রহণ করেছেন। মারমা ও বাংলা উভয় ভাষায় স্বাচ্ছন্দ্যভাবে গান গাইতে পারেন। মারমা ও বাংলা আধুনিক গানের বাংলাদেশ বেতার ও বাংলাদেশ টেলিভিশনের তিনি তালিকাভুক্ত শিল্পী। গান গাওয়া ছাড়াও তিনি তবলা, গিটার, কিবোর্ড, মেন্ডোলিনসহ আরও অনেক ধরনের বাদ্যযন্ত্র বাজাতে পারেন। ব্যক্তি জীবনে নিলু একজন ব্যাংকার। তিনি মারমা ও বাংলা অনেক গানের সুরারোপ করেছেন। তাঁর সুর করা গান প্রচুর জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে।

থোয়াইচিং প্রু নিলু

চথুইফ্রু

পাহাড়ের সকলের প্রিয় শিল্পী, গীতিকার, সুরকার ও নাচের কোরিওগ্রাফার চথুইফ্রু মারমা। তিনি ৬ জানুয়ারি ১৯৬৫ সালে বোমাং রাজ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ছোটোবেলায় বড়ো দিদি (বড়বোন) হ্লা হ্লা চিং এবং দাদা (বড় ভাই) উচহ্লা মারমার

কাছে তার গান শেখার হাতেখড়ি সেই ১৯৭৬ সালে। প্রথম জীবনে ছোটোবেলায় রবীন্দ্র সংগীত দিয়ে শিল্পীজীবন শুরু করলেও পরবর্তীকালে তিনি উচ্চাঙ্গ সংগীত, আধুনিক গানও করেছেন। প্রথম জীবনে দিদি ও দাদার কাছে গান শিখলেও বড়ো হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াকালীন গান শেখেন ওস্তাদ শান্তিময় চক্রবর্তীর কাছে। ১৯৮৫ ও ১৯৯৩ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত সাফ গেমসে বান্দরবান দলের সংগীত ও নৃত্য পরিচালনা করেন। ২০০৮ সালে বাংলাদেশ মারমা স্টুডেন্টস কাউন্সিল কর্তৃক সংস্কৃতিতে বিশেষ অবদান রাখার জন্য সম্মাননা লাভ করেন।

চথুইফ্রু মারমা

৫ ডিসেম্বর ২০১১ সালে ঢাকায় ওসমানী মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত Diversity Festival-2011 উদ্বোধন অনুষ্ঠানে ১১টি নৃ-গোষ্ঠী ও বাঙালি শিল্পীদের সমন্বয়ে Diversity Dance কোরিওগ্রাফি ও পরিচালনা করার কৃতিত্ব অর্জন করেন। তিনি মারমা শিল্পীগোষ্ঠী নামে একটি সাংস্কৃতিক সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা। বর্তমানে তিনি এই সংগঠনের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তার প্রযোজনা ও পরিচালনায় মারমা শিল্পীগোষ্ঠী থেকে ৬টি অডিও এবং ২টি ভিডিও অ্যালবাম প্রকাশিত হয়। তিনি বাংলাদেশ বেতার-এর মারমা ও বাংলা আধুনিক গানের তালিকাভুক্ত শিল্পী এবং বিটিভি, একুশে টিভি, এনটিভি ও সিটিভি-তে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সংগীতে অংশ নেন। তাঁর কোরিওগ্রাফি করা নৃত্যের মধ্যে মারমাদের পাখা নৃত্য, থালা নৃত্য, ছাতা নৃত্য, ময়ূর নৃত্য, সাংগ্রাইং নৃত্য, মাছ ধরা নৃত্য, পরী নৃত্য, চাক আদিবাসী নৃত্য, ম্রো আদিবাসীদের চাংক্রান প্লাই (সাংগ্রাইং নৃত্য), খেয়াং নৃত্য এবং Diversity Dance ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এর পাশাপাশি তিনি অসংখ্য মারমা গান ও বাংলা গান রচনা ও সুরারোপ করেছেন। এছাড়াও তিনি ভালো উপস্থাপক, ফ্যাশন ডিজাইনার এবং একজন ভালো ফটোগ্রাফার হিসেবে সকলের কাছে পরিচিত।

তথ্যদাতা : (উপজেলার সংক্ষিপ্ত পরিচিত)

১. ড ম্যা উ চাক, ১ম বর্ষ বিবিএ, প্রিমিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়,চট্টগ্রাম
২. চিং চাগ্য চাক, নূতন চাক পাড়া, বাইশারী, নাইক্ষ্যংছড়ি
৩. রাজু কর্মকার, পিতা : মৃত নরেন্দ্র কর্মকার, বান্দরবান বাজার, বান্দরবান
৪. প্রফুল্ল কর্মকার, রুমা বাজার, রুমা উপজেলা, বান্দরবান
৫. রতন কর্মকার, লামা বাজার, লামা উপজেলা, বান্দরবান
৬. অধীর কর্মকার, লামা বাজার, বান্দরবান
৭. নিরঞ্জন কর্মকার, লামা, বান্দরবান
৮. সুধীর কর্মকার, আলীকদম উপজেলা, বান্দরবান
৯. সত্যহা পানজি ত্রিপুরা, অবসরপ্রাপ্ত সরকারি শিক্ষক, কালাঘাটা ত্রিপুরা পাড়া, বান্দরবান
১০. কানসুর ম্রো, নোয়া পাড়া, চিম্বুক, বান্দরবান
১১. এয়ামতুই ম্রো, হেডম্যান, ৩১৫নং রেনিক্ষ্যং মৌজা, বান্দরবান
১২. তাই ইন ম্রো, রেংলে পাড়া, রেনিক্ষ্য, বান্দরবান
১৩. কাতং ম্রো, পোড়া পাড়া, চিম্বুক, বান্দরবান
১৪. ইলং ম্রো, কারবারি, ইলং পাড়া, নাইক্ষ্যংছড়ি, বান্দরবান
১৫. মেনও ম্রো, ওঝা, চিউনি পাড়া, আলীকদম, বান্দরবান
১৬. মাংখাই ম্রো, কারবারি, মাংখাইক পাড়া, আলীকদম, বান্দরবান
১৭. অংসা ম্রো, আলদ পাড়া, লামা, বান্দরবান
১৮. হাবরু ম্রো, হেডম্যান, থানছি, বান্দরবান
১৯. মংক্য চিং চাক (ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান), নাইক্ষ্যংছড়ির সদর ইউনিয়ন পরিষদ, নাইক্ষ্যংছড়ি, বান্দরবান
২০. মনিরুল হক মনু, চেয়ারম্যান, বাইশারী ইউনিয়ন পরিষদ, নাইক্ষ্যংছড়ি, বান্দরবান
২১. দীপক বড়ুয়া, চেয়ারম্যান, ঘুমধুম ইউনিয়ন পরিষদ, নাইক্ষ্যংছড়ি, বান্দরবান
২২. রশীদ আহম্মদ, চেয়ারম্যান, দোছড়ি ইউনিয়ন পরিষদ, নাইক্ষ্যংছড়ি, বান্দরবান
২৩. জিংমুন লিয়ান বম, রুমা উপজেলা, বান্দরবান
২৪. জিংপারময় বম, রুমা উপজেলা, বান্দরবান
২৫. লালচুংনং নাকো, উজানী পাড়া, বান্দরবান
২৬. রোজপার বম, লাইমি পাড়া, বান্দরবান সদর উপজেলা, বান্দরবান
২৭. নাংঅং খুমী, মংয়ো পাড়া, রোয়াংছড়ি, বান্দরবান
২৮. সাংকিং খুমী, সাংকিং কারবারি পাড়া, বান্দরবান
২৯. তাই অং খুমী, মংয়ো পাড়া, রোয়াংছড়ি, বান্দরবান
৩০. কাইথাং খুমী, কুঅং পাড়া, থানছি, বান্দরবান
৩১. বাছা খিয়াং, গুংগুরু মুখ পাড়া, বান্দরবান
৩১. মংহ্লাপ্রু খিয়াং, গুংগুরু মধ্যম পাড়া, বান্দরবান
৩৩. মিনুচিং খিয়াং, গুংগুরুমুখ পাড়া, বান্দরবান
৩৪. হ্লাক্রয় প্রু খিয়াং, গুংগুরুমুখ পাড়া, বান্দরবান
৩৫. লালছোয়াক লিয়ানা পাংখোয়া, বিলাইছড়ি, রাঙ্গামাটি

৩৬. উচ্চতমনি তঞ্চঙ্গ্যা, আলীকদম, বান্দরবান
৩৭. যুদ্ধমনি তঞ্চঙ্গ্যা, আলীকদম, বান্দরবান
৩৮. জনি লুসাই, লুসাই বাড়ি, হাফেজঘোনা, বান্দরবান
৩৯. লালছানি লুসাই, হাফেজঘোনা, বান্দরবান
৪০. লংঙান ম্রো, লোকসংগীত শিল্পী, কুরাং পাড়া, চিম্বুক পাহাড়, বান্দরবান
৪১. পাইথুই চাক রক্তিম, নাইক্ষ্যংছড়ি, বান্দরবান
৪২. ক্যশৈপ্রু খোকা, শিক্ষক, ডনবস্কো উচ্চ বিদ্যালয়, বান্দরবান
৪৩. মংক্যশোয়েনু নেভী, মধ্যম পাড়া, বান্দরবান সদর
৪৪. চাই সুই হ্লা মারমা, বালাঘাটা, বান্দরবান
৪৫. আবুল কালাম আজাদ, কবিরাজ পাড়া, বান্দরবান
৪৬. মিলন কুমার তঞ্চঙ্গ্যা, কবিরাজ, বালাঘাটা, বান্দরবান
৪৭. ক্যবা মারমা, রোয়াংছড়ি উপজেলা, বান্দরবান
৪৮. প্রিয়দর্শী বড়ুয়া, লামা উপজেলা, বান্দরবান
৪৯. মোঃ রুহুল আমিন, লামা উপজেলা, বান্দরবান
৫০. মমতাজ উদ্দিন আহমদ, আলীকদম, বান্দরবান
৫১. অংশৈ থোয়াইং মারমা, থোয়াইংগ্য পাড়া, বান্দরবান
৫২. কাঞ্চনজয় তঞ্চঙ্গ্যা, রোয়াংছড়ি, বান্দরবান
৫৩. অংশৈমং মারমা, প্রাক্তন চেয়ারম্যান, রোয়াংছড়ি সদর ইউপি
৫৪. অংথোয়াইচিং মারমা, উপজেলা চেয়ারম্যান, রুমা উপজেলা, বান্দরবান
৫৫. অনুপম মারমা, সাংবাদিক, থানছি, বান্দরবান
৫৬. মাংসার ম্রো, হেডম্যান ও ইউপি চেয়ারম্যান, থানছি
৫৭. অংসুই থুই মারমা, হেডম্যান পাড়া, থানছি, বান্দরবান

স্থান/গ্রামের নাম

চিম্বুক পাড়া

চিম্বুক পাড়াটি বাংলাদেশের দার্জিলিং হিসেবে খ্যাত চিম্বুক পাহাড়ে অবস্থিত। এই পাড়াটি ম্রো আদিবাসীদের ঐতিহ্যবাহী একটি পাড়া। এই পাড়াটির গোড়াপত্তন সম্পর্কে এখনও কেউ ভালো করে বলতে পারে না। পাড়ার প্রাচীন আম, কাঁঠাল ও তেঁতুল গাছ দেখে অনুমান করা যায় যে, পাড়াটি শত বছরের। বর্তমানে মাটি ক্ষয়ের ফলে ঐ গাছগুলোর শিকড় মাটি থেকে ৫-৬ ফুট উপরে দাঁড়িয়ে আছে। বৃহৎ এই গাছগুলো উঁচু প্রায় ৪০-৫০ ফুটের মতো। স্থূল শাখা-প্রশাখা ছড়িয়ে গাছগুলো প্রায় ফুট শতেকের মতো স্থান দখল করে রেখেছে। এই পাড়ার গোড়াপত্তনের কথা কেউ বলতে না পারলেও এই পাড়ার নামের উৎপত্তির পেছনে একটি কিংবদন্তি পাওয়া যায়। এই পাহাড়টিকে ম্রো আদিবাসীরা "ইয়াংবং হুং" নামে অভিহিত করেন। এর অর্থ হলো দণ্ডায়মান পর্বত। চিম্বুক পাহাড়ের বৈশিষ্ট্যও অন্যান্য পাহাড় থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এই পাহাড়টি একই শিরায় বান্দরবান জেলা সদরদপ্তর থেকে শুরু হয়ে রুমা উপজেলা, লামা উপজেলা, থানছি উপজেলা ও আলীকদম উপজেলার সীমানা অতিক্রম করে মিয়ানমার আরাকান রাজ্যের বুসিডং ও নীল পর্বতের সাথে মিশে গেছে। এই পাহাড়টি দূর থেকে দেখলে একটি শুকর যেভাবে শুয়ে আছে ঠিক সেইভাবে দেখায়। এই পাহাড়ে আদিকাল থেকেই শুধু ম্রো আদিবাসীরা বসবাস করে আসছে। সর্বপ্রথমে চিম্বক নামে একজন ম্রো প্রধান এই পাহাড়ের চূড়ায় একটি পাড়া প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীকালে এই পাড়াটির নাম হয় চিম্বুক পাড়া। আনুমানিক ১৯৩০ সালে একদিন তৎকালীন বান্দরবানের বোমাং রাজা ক্য জ সাইং ঐ এলাকায় হরিণ শিকারে গেলে তিনি চিম্বুক পাড়ায় অবস্থান ও রাত্রিযাপন করেন। তখন চিম্বুক ম্রো বোমাংগ্রি ক্য জ সাইংকে ম্রো সামাজিক প্রথামতো সম্মান প্রদর্শন ও গয়াল জবাই করে রাজকীয়ভাবে আপ্যায়নের ব্যবস্থা করেন। চিম্বুকের আতিথিয়েতা দেখে বোমাংগ্রি ক্য জ সাইং চিম্বুক ম্রোকে ৩০৯ নং দক্ষিণ হাঙ্গর মৌজার হেডম্যান নিয়োগ করেন। চিম্বুক ম্রো-এর নামানুসারে পাহাড়টি 'চিম্বুক পাড়া' নামে পরিচিতি লাভ করে। এই পাড়াটি সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে প্রায় তিন হাজার ফুট উপরে এবং বান্দরবান শহর থেকে ২৫ কিলোমিটার দূরে বান্দরবান সদর উপজেলার ৫নং টংকাবতী ইউনিয়নে বান্দরবান-থানছি সড়কে চিম্বুক পাহাড়ে অবস্থিত। এই পাড়ায় ৫৪টি পরিবার রয়েছে। পাড়ার মোট লোকসংখ্যা ৫২৫ জন। পাড়ায় একটি কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়, একটি কমিউনিটি ক্লিনিক, একটি ক্রামা ধর্মালয় ও ১০টি দোকান রয়েছে।

পাড়াবাসীদের মূল আয়ের উৎস হলো জুমচাষ। পাড়াবাসীরা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও ফলজ বাগান, মসলা চাষ ইত্যাদিও করে । এই পাড়ায় ক্ষুদ্রাকারের একটি হাট আছে।

হাটের মাঝখানে ও দক্ষিণপ্রান্তে বৃহৎ দুটি বটবৃক্ষ রয়েছে। এই বটবৃক্ষের ছায়াতলে প্রতি রবিবার হাট বসে। হাটে শুঁটকি, মাছ, গরুর ভুঁড়ি, নাপ্পি, জামা-কাপড়, মহিলাদের ব্লাউজ, মরিচ, বিভিন্ন জাতের ফল ও জুমে উৎপাদিত বিভিন্ন পণ্য বেচা কেনা হয়। হাটের পশ্চিম কোণে একটি কাঁচামালের আড়ত আছে। প্রতি রবিবার চট্টগ্রাম ও সাতকানিয়া থেকে কাঁচামালের ব্যবসায়ীরা এই ছোট্ট আড়ত থেকে স্থানীয় উৎপাদিত পেঁপে, কলা, আনারস, জাম্বুরা, কমলা, লেবু, আম, জাম, কাঁঠাল, আদা, হলুদ ইত্যাদি স্থানীয় উৎপাদিত পণ্য ক্রয় করে দেশের বিভিন্ন স্থানে নিয়ে যায়।

উঁচু পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থিত হওয়ায় এই চিম্বুক পাড়াটির বৈশিষ্ট্য অন্যান্য পাড়া থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। বছরের ছয় ঋতুতে এই পাড়া ছয়বার রূপ পরিবর্তন করে। শীতকালে সারারাত ধরে শুষ্ক বাতাস বয়ে যায়। এই শীতের রাতে চলে ম্রো আদিবাসীদের ঐতিহ্যবাহী গো-হত্যা অনুষ্ঠান। বিভিন্ন পাড়া থেকে লোকজন এসে গো-হত্যা উৎসব উপভোগ করে। এই পাড়ার আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো, পাড়াটি সারাদিন সূর্যের আলো পায়, আর সারারাত এই পাড়াতে চাঁদের জ্যোৎস্না উপভোগ করা যায়। এই পাড়ায় প্রতিদিনি ভোরে লাল সূর্যোদয় আর সন্ধ্যার সময় লাল সূর্যাস্তও উপভোগ করা যায়। শীতকালে চলে ম্রোদের বিবাহ অনুষ্ঠান। শীতকালই হলো ম্রো আদিবাসীদের বিবাহের সময়। শীতকাল শেষ হওয়ার সাথে সাথে চলে আসে কাজের সময়। তখন তারা আর বিয়ে করে না। অর্থাৎ যতসব সামাজিকতা শেষ করতে হয় শীতকালে, যখন কাজ থাকে না। ম্রোরা শীতকালে বিবাহ ও আত্মীয়স্বজনের কাছে বেড়ানোসহ সকল পারিবারিক ও সামাজিক কাজ সম্পন্ন করে।

বর্ষাকাল যখন আসে তখন এই পাড়া আরেক ধরনের রূপ আর আকার ধারণ করে। তখন এই পাড়া সারাক্ষণ সমস্ত মেঘে ঢাকা থাকে। সমতল এলাকাবাসীরা যে মেঘকে আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখেন, সেই মেঘের সাথে এই পাড়াবাসীরা সারাক্ষণ মিতালি করে। গ্রীষ্মকালেও এই পাড়ায় গরম অনুভূত হয়না। তখন সারাক্ষণ দক্ষিণা বাতাস বইতে থাকে। তাই এই পাড়ার জনসাধারণের রোগব্যাধি অন্যান্য পাড়ার তুলনায় অনেক কম।

কুহালং পাড়া

বান্দরবানের অন্যতম নদী শংখ নদীর কূল ঘেষে এক অপূর্ব প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমণ্ডিত পাহাড়ি জনপদ কুহালং পাড়া। গ্রামপ্রধান বাংলাদেশের সমতল অঞ্চলের জনবসতিকে সাধারণভাবে গ্রাম বলা হলেও পার্বত্য চট্টগ্রামে গ্রাম শব্দটির ব্যবহার বা প্রচলন নেই বললেই চলে। পাহাড়ি অঞ্চলে গ্রামের মতো জনবসতিকে বলা হয় পাড়া। পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে এক একটি পাড়া ৩০-৪০ বাড়ি বা পরিবার থেকে শুরু করে ২০০-৩০০টি বাড়ি বা পরিবার নিয়েও গঠিত হতে পারে। পাহাড়ি অঞ্চলের ঐতিহ্যিক ধারাবাহিকতায় পাড়ায় একজন পাড়াপ্রধান থাকেন। তাঁকে বলা হয় পাড়ার কারবারি। পাড়ার কারবারিই পাড়ার প্রধান হিসেবে পাড়ার বিচার-আচার থেকে শুরু করে ভালো-মন্দ সমস্ত কিছুরই দেখাশোনা করে থাকেন। পাড়ার সমস্ত লোকজন কারবারিকে মান্যগণ্য করে চলে। কুহালং পাড়া বান্দরবান সদর উপজেলায় অবস্থিত হলেও চট্টগ্রাম

জেলার সীমন্ত ঘেষা একটি পাহাড়ি জনপদ। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এই কুহালং পাড়া। মূলত মারমা ও বড়ুয়া সম্প্রদায় নিয়ে এই পাড়া গঠিত হলেও অপরাপর বাঙালি জনগোষ্ঠীর মুসলিম ও হিন্দু সম্প্রদায়ের অবস্থানও রয়েছে এই পাড়ার আশেপাশেই। কুহালং পাড়া চট্টগ্রাম জেলার এবং বান্দরবান পার্বত্য জেলার সীমান্তবর্তী হওয়ায় উভয় সীমান্তেই পাহাড়ি ও বাঙালি জনগোষ্ঠীর বসবাস রয়েছে, রয়েছে তাদের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান। সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্প্রীতির মেলবন্ধনে আবদ্ধ উভয় জনগোষ্ঠীর মানুষজন। শংখ কূলের উর্বর মাটিতে এই পাড়ার শ্রমজীবী মানুষেরা ফলায় তাদের চাহিদার ফসল। ফসলের ফলনও হয় খুব ভালো। এই পাড়ার লোকজন মূলত কৃষিজীবী হলেও চাকুরিজীবী মানুষ আর অন্যান্য পেশার লোকজনও রয়েছে। এই পাড়ায় স্কুল, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসহ চিকিৎসা সেবাকেন্দ্রও আছে। শংখ নদীর কূলকূল ধ্বনি আর প্রকৃতির নিবিড় ছায়ায় নির্মল প্রাকৃতিক পরিবেশে সুখে-শান্তিতে বসবাস করছে এইখানকার মানুষ। এই পাড়া প্রাকৃতিক নৈসর্গিক সৌন্দর্য আর সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এক উৎকৃষ্ট প্রতীক।

বলিবাজার

বলিবাজারের পূর্বের নাম ছিল বলিপাড়া। এখানে আদিকালে একটি মারমা আদিবাসী গ্রাম ছিলো। সাঙ্গু নদীর তীরে অবস্থিত হওয়ায় নদীপথে যোগাযোগ সহজ হয়ে পরবর্তীকালে এখানে একটি বাজার গড়ে ওঠে। এই বলিপাড়া বা বলি বাজারকে নিয়ে এ অঞ্চলের আদিবাসীদের একটি পৌরাণিক কাহিনি রয়েছে। এই গ্রামে ছিল এক রূপসী কন্যা। তার রূপে এলাকার যুবকরা প্রায় পাগল হয়ে যেতো। কিন্তু সেই রূপসী মেয়েটি সর্বক্ষণ নিজেকে আড়াল করে রাখতো। গোসল ও নির্দিষ্ট কিছু কাজ করা ছাড়া সে কখনো অসময়ে ঘরের বাইরে বের হতো না। তবে মাঝেমধ্যে সে গহিন অরণ্যে হারিয়ে যেতো। এভাবে একদিন সেই রূপসী মেয়েটি গ্রাম থেকে হারিয়ে গেলো। অনেক খোঁজাখুঁজির পরও তার কোনো হদিস মেলেনি।

এভাবে পাঁচ বছর কেটে যাওয়ার পর গ্রামের একদল শিকারি সেই গহিন বনে ৫টি কুকুর নিয়ে পশু শিকার করতে গেলো। শিকারে গিয়ে সেই রূপসী মেয়েকে তারা দেখতে পায়। সেই মেয়েটি তখন কোলে ফুটফুটে একটি শিশুকে নিয়ে আপন মনে বসে আছে। তারা তাকে জিজ্ঞেস করলো—'তুমি এখানে কেন?' তখন মেয়েটি বললো— 'আমি একজন ছায়াবিহীন মানুষকে বিয়ে করেছি।' কিছুদূর গেলেই আমাদের গ্রাম দেখতে পাবে।' তারপর মেয়েটি শিকারিদেরকে তাদের গ্রামে নিয়ে গেলো। তখন শিকারিরা বললো—'তুমি আমাদের সাথে আবার গ্রামে ফিরে চলো। আমরা তোমাকে গ্রামে নিয়ে যাবো।' তখন মেয়েটি বললো-'আমি আমার স্বামীর অনুমতি ছাড়া তোমাদের সাথে যেতে পারবো না। সে কখনো আমাকে যেতে দেবে না। বাবা ও মায়ের সাথে দেখা করতে আমার খুবই ইচ্ছা। তোমরা এক সপ্তাহ পর আমাকে নিতে এসো। এখন সে বাড়িতে নেই। তবে কিছুক্ষণ পরে চলে আসবে। সে আমাকে তিনদিন পর বাড়িতে ফিরে আসবে বলেছে। তিনদিন পর বাড়ি ফিরবে বললে সে

একদিন আগে ফিরে আসে। আবার একদিন পর ফিরবে বললে এক সপ্তাহ পর ফিরে আসে। বরং তোমরা তাড়াতাড়ি এখান থেকে চলে যাও। আমার স্বামী তোমাদেরকে দেখতে পেলে তোমাদের মেরে ফেলবে।'

এক সপ্তাহ পর স্বামীর অনুপস্থিতিকালে গ্রামবাসীরা ওঝা-বৈদ্য নিয়ে সেই ছায়াবিহীন মানুষের গ্রামে গেলো। নানা ধরনের মন্ত্রতন্ত্র, তাবিজ-কবজ পড়িয়ে নানা ধরনের লতা-পাতার ঔষধের জলে গোসল করিয়ে রূপসী মেয়ে ও তার শিশু সন্তানকে গ্রামে নিয়ে আসলো। এরপর সাত গাচ্ছি সুতো ও নানা ধরনের লতাপাতা দিয়ে গ্রামের চতুর্দিকে গাথিয়ে পাড়া বন্ধ করে দিলো।

সেদিন সন্ধ্যা হলে সেই বিশালদেহ ছায়াবিহীন মানুষটি স্ত্রী ও বাচ্চাকে নিতে গ্রামে এলো। বিশালদেহ লোকটির পাগুলো থামের মতো। চোখ দুটি রাজহাঁসের ডিমের মতো। পায়ের প্রতিটি পদক্ষেপে মাটি কাঁপতে লাগলো। মন্ত্রতন্ত্র, সুতো ও নানা ধরনের লতাপাতা দিয়ে গ্রাম বন্ধ করার ফলে সেই বিরাটকায় ছায়াবিহীন মানুষটি গ্রামে ঢুকতে পারলো না। এভাবে সাতরাত চেষ্টা করার পর বিফল হয়ে সে আর এলো না।

দিন যায়, মাস যায়, বছর যায় এমনি করে ছায়াবিহীন মানুষের ছেলেটি বড় হতে লাগলো। তবে সে কারোর সাথে কথা বলে না। শুধু বোবার মতো থাকে আর বিভিন্ন কাজ করে তার দিন কাটে। ছেলেটিরও দেহ বিশাল ঠিক তার বাবার মতো। জুম থেকে সে একসাথে ১০-১৫ আড়ি ধান ঘরে তুলতে পারে এমন শক্তি তার।

একদিন ১০-১৫ মন মারফা, চিনাল, মিষ্টি কুমড়া, ঝিঙা, বরবটি নিয়ে সে বাজারে গেলো। যেখানে শুঁটকি মাছ, কাপড়, নাপ্পি, লবণের দোকান আছে সেখানে গিয়ে সে কাউকে কোনো কিছু না বলে ঝুড়ি থেকে মারফা, চিনাল, মিষ্টি কুমড়া, ঝিঙা, বরবটি রেখে দিয়ে শুঁটকি মাছ, কাপড়, নাপ্পি, লবণ সব নিয়ে তার ঝুড়িতে ভরে চলে এলো। তার এই কর্মকাণ্ডে বাজারের সবাই তার দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে রইলো। বাজারের লোকজন তার সাথে কথা বললেও সে কাউকে কোনো উত্তর দিলো না। এভাবে কয়েক বাজারে এই ঘটনা ঘটার পর বাজারের লোকজন একদিন তাকে মারতে গেলো। কিন্তু তার সাথে মারামারি করে কেউ পারলো না। ঐ ছেলেটি রেগে সমস্ত বাজার তছনছ করে বনে চলে গেলো। সে জঙ্গলে গিয়ে আর গ্রামে ফিরলো না। কয়েকদিন পর তার মা জানতে পারে যে, ছেলে তার বাবার কাছে চলে গেছে। সেই ঘটনার পর থেকে সেই গ্রামটির নাম বলিপাড়া। পরবর্তীকালে বলিপাড়া 'বলিবাজার' নামে পরিচিতি লাভ করে। বলি অর্থ বলবান। বলিপাড়া বান্দরবান পার্বত্য জেলার দুর্গম এলাকা থানছি উপজেলায় অবস্থিত।

লোকসাহিত্য

লোকসাহিত্যের সৃষ্টি মূলত মৌখিক ও ঐতিহ্যগত। যে কোনো সাহিত্যের একটি অপরিহার্য উপাদান বা অন্যতম মূল উপাদান হচ্ছে লোকসাহিত্য। লোকসাহিত্যকে সাহিত্যের মূল শেকড়ও বলা চলে। যে সাহিত্যে লোকসাহিত্য যতসমৃদ্ধ, সে সাহিত্যও ততধিক সমৃদ্ধ সাহিত্য হয়। লোকসাহিত্য শুধু অতীতের সামগ্রী বা সম্পদ নয়, লোকসাহিত্য বর্তমানেরও অমূল্য সম্পদ। লোকগল্প, কিংবদন্তি ও লোকপুরাণ বান্দরবানের লোকসাহিত্যকে নিঃসন্দেহে সমৃদ্ধ করেছে। উল্লেখ্য যে, যথাযথ চর্চা ও সংরক্ষণের অভাবে বান্দরবানের সমৃদ্ধ বৈচিত্র্যময় পাহাড়ি লোকসাহিত্য প্রায় বিলুপ্তির পথে।

ক. লোকগল্প/কাহিনি/কিস্‌সা/রূপকথা/উপকথা

আদিবাসী লোকগল্প-কাহিনি/কিসসাগুলোতে পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের স্বতন্ত্র জীবনবোধ, আচার-অনুষ্ঠান ও রীতিনীতি যেভাবে উঠে এসেছে সেই একইভাবে উঠে এসেছে তাদের মানবিক মূল্যবোধের বিষয়গুলিও। লোককথার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, অতিলৌকিক শক্তি, অগাধ ক্ষমতা এবং ব্যক্তি মানুষের বীরত্বগাঁথা। বিজ্ঞান যখন মানুষের কাছে পৌঁছতে ব্যর্থ হয়েছে কিংবা বিজ্ঞানের কঠিনতর যুক্তি যখন মানুষের স্বাভাবিক আবেগের সাথে তাল মেলাতে সক্ষম হয়ে ওঠেনি তখনি মানুষ আকৃষ্ট হয়েছে অতিলৌকিক ক্ষমতার প্রতি। এ লোককাহিনিগুলোতে জাদুবিদ্যার অসাধারণ ক্ষমতা, লোককথার অতিলৌকিক বৈশিষ্ট্যকে ধারণ করেছে অত্যন্ত স্বার্থকভাবে। বন্য প্রকৃতি ও বন্যজন্তুর সাথে আদিবাসীদের নিবিড় সংশ্লিষ্ট জীবনধারাই এর মূল কারণ। আদিবাসী সমাজের কঠোর জীবনসংগ্রাম, ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের গভীর যন্ত্রণা, নিঃসঙ্গতা, বৈষম্য, নৃশংসতা ও মহানুভবতার চিত্র নিখুঁতভাবে পরিস্ফুটিত হয়েছে তাদের লোককাহিনিতে। ন্যূনতম প্রয়োজনীয় খাদ্য যোগাড়ের জন্য উদয়াস্ত কঠোর শ্রমসাধ্য জুমচাষ ও বন্যজন্তু শিকারের চিত্র লোককাহিনিগুলোতে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিকভাবে বারংবার উপস্থাপিত হয়েছে জীবন সংগ্রামের প্রতিচ্ছবি হিসেবে।

পৃথিবী সৃষ্টির কাহিনি (বম আদিবাসী)

'খুজিং-পাথিয়ান' বিধাতা পুরুষ, তিনি সৃষ্টিকর্তা। একদিন তার পৃথিবী সৃষ্টি করার মনোবাসনা হলো। তার দুই ছেলে। ছেলেদের তার পরিকল্পনার কথা জনালেন। শর্ত দিলেন, দু'জন বিপরীত দুই দিগন্তের শেষপ্রান্তে যাবে এবং পৃথিবী সৃষ্টির কাজ আরম্ভ করবে। দু'জনের ঠিক মধ্যবর্তী একস্থানে একটি গাছের খুঁটি স্থাপন করা হবে এবং গাছের খুঁটির সাথে একটি ঢোল ঝোলানো থাকবে। সৃষ্টির কাজ যার আগে শেষ হবে সেই বাজাবে ঢোল; সাথে তার জুটবে ভবিষ্যৎ রাজ্যাধিকার ও সিংহাসন।

দুই ছেলে দুই প্রান্তে গেলো। শুরু হলো সৃষ্টির কাজ। নিপুণ হাতে তৈরি হতে লাগল নরম মাটি দিয়ে মাঠ, জমি, সমতলভূমি, নদী-সমুদ্র, মহাসমুদ্র, বন, পাহাড়, জঙ্গল ইত্যাদি। সৃষ্টির সেরা উপহার দেওয়ার জন্য এবং স্বর্গের শ্রেষ্ঠতম পুরস্কার পাবার জন্য সৃষ্টি করে চলেছে পৃথিবী, দেশ মহাদেশ।

দুই ছেলে তাদের পৃথিবী সৃষ্টির কাজ করে চলেছেন। সৃষ্টি এমন মনোমুগ্ধকর এমন নৈপুণ্য চোখ জুড়ানো পৃথিবী। নিজের কাছেই অবিশ্বাস্যরকম সুন্দর মনে হচ্ছে। তারপরও সৃষ্টির কাজ অবিরাম চলছে। কিন্তু একি! কিসের আওয়াজ? কোথা থেকে? একি সৃষ্টি সুখের উল্লাস! রাজকীয় সম্বর্ধনা, বিজয়োল্লাস! সিংহাসন লাভের আনন্দ, নাচ গান? অথচ হায়! আমার তো এখনো পৃথিবী সৃষ্টির কাজ অনেক বাকি। এমন চিন্তা একি দুই ভাইয়ের মনে।

দুই প্রান্তে দুই ভাই দ্বিধাগ্রস্ত। আর সময় নেই। তাড়াতাড়ি শেষ করতে হবে। আমি হয়তো পরাজিত হয়ে গেলাম, একপ্রান্তে এক ভাই ভাবছে, আর অপর প্রান্তে আরেক ভাইও একই কথা ভাবছে।

সময় অযথা নষ্ট না করে দুই ভাই তাড়াহুড়া করে হাতের পায়ের কাদামাটিগুলো এদিক সেদিক এখানে সেখানে ছোঁড়াছুড়ি করে যেমন-তেমন করে লেপে দিয়ে শেষ করল পৃথিবীর সৃষ্টির কাজ। তারা দৌড় দিলো সেদিকে যেখানে ঢোল ঝোলানো আছে। দুই জনে একই সময়ে সমানে পৌঁছাল সেই স্থানে। পরস্পর অবাক চোখে তাকিয়ে, তবে কে বাজাল ঢোল?

জানা গেল যে, এক ধূর্তবাজের এই কাজ। ততক্ষণে নরম মাটি রোদে শুকিয়ে শক্ত হয়ে গিয়েছে। দুই দিগন্তের প্রান্ত-সীমানাগুলো কি মসৃণ, সুন্দর ! সাজানো ছবির মতো সুন্দর সমতল। কোথাও উচুঁ-নীচু নেই। অবাক করার মতো নদী-সমুদ্র-মহাসমুদ্র। কিন্তু পরেরগুলো যা-তা, এবড়ো-থেবড়ো, অসমান পাহাড়-পর্বত। কোথাও সমতল ভূমি নেই।

এই এবড়ো-থেবড়ো পাহাড়-পর্বতেই বমদের বাস। হয়তো চিম্বুক অথবা কেউক্রাডং। সেই সুন্দর, মসৃণ সমতল প্রান্তভূমিই হয়তো মেঘনা-যমুনার দুই কূলের মনোরম সমতল ভূমি।

ম্রোদের পৃথিবী সৃষ্টির কাহিনি

অনেকদিন আগের কথা। পৃথিবী সৃষ্টির পূর্বে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে কোনো মৃত্তিকা ও উদ্ভিদকুল ছিলো না। তখন মহাসমুদ্রের উপর ভেসে যাওয়া এক খণ্ড প্রস্তরকে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড বলে বিবেচনা করা হতো। সে প্রস্তর খণ্ডে বাস করতো এক বিধবা বুড়ি ও 'ক্লাংচা' নামে এক যৌবন উদ্দীপ্ত সুদর্শন নাতি। একদিন 'ক্লাংচা' কুকুর নিয়ে শিকার করতে গেলো। শিকারে 'পাকচারুয়ামা' (এক প্রকার বন্যজন্তু) শিকার পেলো। বৃদ্ধা 'পাকচারুয়ামা'কে দেখে বললো—"ক্লাংচা তুমি তাকে মেরে ফেলো না, তাকে দিয়ে মহাসমুদ্রের উপর মৃত্তিকা আচ্ছাদন করে পৃথিবী সৃষ্টি করো। তুমি পাকচারুয়ামাকে পাঠিয়ে দাও 'রেংমা ওয়ালে চরউম নুই' (মৃত্তিকা দ্বীপে) এ। সে সেখান থেকে মৃত্তিকা সংগ্রহ করে ভূমণ্ডল

সৃষ্টি করতে পারবে। মৃত্তিকা দ্বারা আচ্ছাদিত হলেই জীবকুল ও উদ্ভিদকুল সবই সৃষ্টি হবে।" ক্লাংচা দাদির কথা অনুসারে পাকচারুয়ামাকে মৃত্তিকা দ্বীপে পাঠিয়ে দিলো। পরদিন পাকচারুয়ামা মৃত্তিকা দ্বীপ থেকে মাটির খণ্ড চুরি করে নিয়ে আসলো। কিন্তু পথিমধ্যে সমুদ্র অতিক্রম করার সময় মৃত্তিকা খণ্ডটি তিমি মাছ ছিনিয়ে নিলো। চুরি করে নিয়ে এসেছে বলে তিমি মৃত্তিকা খণ্ডটি নিতে বাঁধা দিলো। ব্যর্থ হয়ে পাকচারুয়ামা শূন্য হাতে ফিরে এলো। ক্লাংচা দাদিকে সব ঘটনা বর্ণনা করলো। নাতির কথা শুনে দাদি বললো, "তুমি পাকচারুয়ামাকে চুরি করতে বারণ করো। চুরি করে মৃত্তিকা আনলে কোনো দিনও ভূমি সৃষ্টি হবে না। কাজেই তুমি স্বয়ং গিয়ে মৃত্তিকা দ্বীপের রক্ষকের নিকট আবেদন-নিবেদনের মাধ্যমে তোমার পরিকল্পনা জানাবে। তিনি তোমার পরিকল্পনাকে স্বাচ্ছন্দ্যে গ্রহণ করবেন।" পরদিন প্রত্যুষে নাতি পাকচারুয়ামার পিঠে চড়ে সমুদ্র পাড়ি দিয়ে মৃত্তিকা দ্বীপে পৌঁছালো। তাদের আগমন দেখে দ্বীপবাসীরা ঢাল, তলোয়ার হাতে নিয়ে প্রস্তুত রইলো এবং তাদেরকে বন্দি করে রাজার নিকট নিয়ে গেলো। রাজা ক্লাংচার আগমনের উদ্দেশ্য জানতে চাইলো। ক্লাংচা তার পরিকল্পনা রাজার সমীপে জানালো। রাজা ক্লাংচার পরিকল্পনা শুনে খুবই সন্তুষ্ট হলো এবং ক্লাংচার আগমনকে স্বাগত জানালো।

পরদিন ক্লাংচা রাজার নিকট হতে মৃত্তিকাখণ্ড নিয়ে রওয়ানা দিলো। সাথে রাজা ক্লাংচাকে আরও বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণী ও উদ্ভিদের বীজ দিয়ে দিলো। আর রোগব্যাধি, ঝগড়াঝাঁটি, চুরি-ডাকাতি, আলোচনা-সমালোচনা ও ছলনা-ব্যভিচারের বীজও সাথে করে দিয়ে দিলো। এই বীজগুলো কোন কোন স্থানে বা জায়গায় প্রয়োগ করবে তাও শিখিয়ে দেওয়া হলো যে, ঝগড়া-বিবাদের বীজ মদ্যপান আসরে, রোগব্যাধির বীজ ঝরণার ধারে, সমালোচনার বীজ রমণীদের আড্ডায়, চুরি-ডাকাতির বীজ গৃহের সম্মুখে এবং ব্যভিচারের বীজ যুবক-যুবতীদের শয়নকক্ষে প্রয়োগ করবে। ফিরে এসে ক্লাংচা পাকচারুয়ামার মাধ্যমে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে মৃত্তিকা কণার দ্বারা তিনভাগ জল ও একভাগ স্থল সৃষ্টি করলো। তারপর ক্লাংচা তার কর্মকাণ্ড সমাপ্তকরণের বার্তা দাদিকে জানালো। দাদি তাকে উদ্ভিদকুল জন্মানোর জন্য বিভিন্ন জাতের উদ্ভিদের বীজ ভূমিতে বপন করতে নির্দেশ দিলো। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যাতে অতিদ্রুত তৃণগুল্মে ছেয়ে যেতে পারে তার জন্য প্রথমে 'পাংচা' (নল খাগড়া বাঁশ) কে আদেশ দিলো। তাতে পাংচা জবাব দিলো- 'ক্লাংচা, যখন আপনি আমাকে মৃত্তিকা দ্বীপ থেকে নিয়ে এসেছেন, তখন আমি পরিপূর্ণ পরিশুদ্ধি লাভ করিনি'। তদুপরি আমি এ ভূমণ্ডলে অতিদ্রুত বেগে পরিপূর্ণভাবে জন্মাতে পারবো না। আমি শুধু সমতল ভূমিতে, নদীর ধারে, খাল-বিলের ধারে জন্মগ্রহণ করবো। তারপর বরাখ বাঁশকে নির্দেশ দেওয়া হলে বরাখ বাঁশ বললো যে, আমারও সম্পূর্ণরূপে পরিশুদ্ধি লাভ হয়নি। ফলে আমি দ্রুতগতিতে ভূমণ্ডলে বীজ জন্মাতে পারবো না। আমার জন্মস্থান হবে সমতল ভূমিতে। সমতলবাসীরা আমাকে ব্যবহার করবে। ক্লাংচা তৃতীয়বার ডলু বাঁশকে আদেশ দিলো। ডলু বাঁশ ক্লাংচার জবাবে উত্তর দিলো যে, "আমিও পূর্ণ পরিশুদ্ধি লাভ করতে পারিনি। যারফলে আমিও ত্বরা করে জন্মাতে অপারগতা প্রকাশ করছি। আমার জন্মস্থান হবে শুধু পাহাড়ের পাদদেশে। জগদ্বাসী আমাকে লবণদানী ও নস্যিদানী হিসেবে ব্যবহার করবে।"

ক্লাংচা কোনো উপায় না দেখে নিরাশ হয়ে পরিশেষে পায়া বাঁশকে ভূমণ্ডলে পরিপূর্ণ করে ছেয়ে ফেলার নির্দেশ দিলো। ক্লাংচার কথা শুনে পায়া বাঁশ বললো—"আমি নিশ্চয়ই আপনার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করবো। তবে লাল বর্ণের মোরগ ও নয়টি বাঁশের পাতা দ্বারা উঁইপোকার টিবিকে পূজা করতে হবে। তারপর আমি ভূমণ্ডলে অতিদ্রুত জন্মাবো। ক্লাংচা পায়া বাঁশের কথা অনুযায়ী পূজার্চনা করলো। সত্যি সত্যি পরদিন প্রভাতে ক্লাংচা দেখতে পেলো সমস্ত ভূমণ্ডল পায়া বাঁশে পরিপূর্ণভাবে ছেয়ে গেছে। তারপর বিভিন্ন জাতের তৃণগুল্ম বীজ ছিটিয়ে দেওয়া হলো। তাতে সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বনজঙ্গলে পরিপূর্ণ হয়ে গেলো। তারপর ক্লাংচা দাদিকে তার কর্মকাণ্ডের কথা জানালো। দাদি তাকে পবনের বলয় প্রয়োগ করার জন্য নির্দেশ দিলো। ক্লাংচা দাদির কথার পরিপ্রেক্ষিতে পবনের বলয় নিক্ষেপ করলো। তাতে ভূমণ্ডলের সমস্ত বনজঙ্গল বাতাসে উপড়ে গেলো। এতো দিনের পরিশ্রমের ফল বিফলে গেলো বলে ক্লাংচা কাঁদতে কাঁদতে দাদির কাছে ঘটনাটা জানালো। দাদি ক্লাংচার বর্ণনা শুনে বললো—"তোমার প্রধান কাজ এখনও বাকি আছে। তা যদি তুমি সম্পাদন করো, তাহলেই তোমার সুকর্ম ফলের দর্শন পাবে। কাজ হলো, তুমি লতাগুল্ম বীজ ছিটিয়ে দাও, দেখবে বাতাসে আর তৃণগুল্ম উপড়ে যাবে না। ঠিকই বনজঙ্গল রয়ে যাবে। ক্লাংচা দাদির পরামর্শ অনুযায়ী কর্ম সম্পাদন করলো। পরবর্তীতে পুনরায় যখন পবনের বলয় প্রয়োগ করলো তখন সত্যি সত্যি বাতসে আর গাছপালা নূয়ে পড়েনি। লতা প্যাঁচিয়ে গাছগাছালি, বাঁশের ঝাড় অভূতপূর্ব পরিবেশে দাড়িয়ে রইলো। তারপর বিভিন্ন প্রজাতির পশুপাখি, সরীসৃপ, কীটপতঙ্গ সেই বৃক্ষে পরিপূর্ণ বনজঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হলো। এই সমস্ত কর্মক্রিয়া শেষ হওয়ার পরও একটি বৃহৎ সমস্যা রয়ে গেলো। দিন ঠিকই সৃষ্টি হলো, তবে কোনো রাত সৃষ্টি হলো না। ক্লাংচা দ্রুত দাদির কাছে গিয়ে খুলে বললো। দাদি ক্লাংচার কথা শুনে জবাব দিলো—তুমি বাঘকে দিয়ে দিনরাত সৃষ্টি করো। বাঘ ঠিকই দিনরাত সৃষ্টি করতে পারবে।" ক্লাংচা দাদির পরামর্শ অনুযায়ী বাঘকে দিনরাত সৃষ্টি করার আদেশ দিলো। ক্লাংচার আদেশ শুনে বাঘ মনে মনে ভাবলো "আমি যদি দিনই সৃষ্টি করি তাহলে আমাদের (বাঘদের) পক্ষে আহার সংগ্রহ করা দুষ্কর ব্যাপার হবে।" এই ভেবে বাঘ দিন সৃষ্টি না করে শুধু রাতই সৃষ্টি করলো। এতে সমস্ত ভূমণ্ডল অন্ধকারে পরিপূর্ণ হয়ে গেলো। কখনো আর আলোর আভাস দেখা দিলো না। ক্লাংচা পুনরায় ছুটে গেলো দাদির কছে। দাদি এবার ভাল্লুকের মাধ্যমে দিনরাত সৃষ্টি করার জন্য নির্দেশ দিলো। ক্লাংচার নিদের্শক্রমে ভাল্লুক কোনো রাত সৃষ্টি না তরে শুধু দিনই সৃষ্টি করলো। ক্লাংচা আবারও দাদির কাছে গেলো পরামর্শ গ্রহণ করতে। দাদি এবার পাখিদের সাহায্যে দিনরাত সৃষ্টি করার জন্য আদেশ দিলো। ক্লাংচা প্রথমে ধনেশ পাখির নিকট গিয়ে নিবেদন করলো—দিনরাত সৃষ্টি করার জন্য। ধনেশ পাখি তখন অন্তঃসত্ত্বা। এ অবস্থায় তার পক্ষে দিনরাত সৃষ্টিকার্যে হস্তক্ষেপ করা বাস্তবসম্মত নয় এবং এ অবস্থায় সে যদি দিনরাত সৃষ্টি করে তাহলে সমস্ত ভূমণ্ডলে অমঙ্গল ও অশুচিতা নেমে আসবে বলে সে ক্লাংচাকে জানালো। তা না হলে সত্যি এরূপ কর্ম সম্পাদন ধনেশ পাখির পক্ষে সম্ভব হতো। এরপর ক্লাংচা গেলো বুলবুলি পাখির কাছে। ক্লাংচা কথা বলার পরপরই বুলবুলি "নিশ্চয় পারবো" বলে ক্লাংচাকে আশ্বাস দিলো। পূর্বে

বুলবুলি পাখি বাঘের নিকট রাত সৃষ্টির কৌশল এবং ভাল্লুকের নিকট দিন সৃষ্টির কৌশল রপ্ত করেছিল। ফলে সে পরক্ষণেই দিনরাত সৃষ্টি করে ফেললো। বুলবুলির কর্মকাণ্ড দেখে ক্লাংচা মুগ্ধ হয়ে খুশিতে এক দীর্ঘশ্বাস ফেলে বুলবুলিকে ধন্যবাদ দিলো।

দিনরাত সবই সৃষ্টি হলো। কিন্তু কিভাবে গৃহ নির্মাণ করতে হয় তা ক্লাংচার নিকট আরও এক অজানা বিষয় রয়ে গেলো। গৃহনির্মাণ কৌশল জানার জন্য ক্লাংচা আবার দাদির কাছে গেলো। জবাবে দাদি বললো "চারটি কোণের সমন্বয়ে গৃহ নির্মাণ করতে হয়"। তবুও দাদির কথা ক্লাংচার বোধগম্য হলো না। পুনরায় দাদির কাছে গিয়ে জানতে চাইলো, এজাতীয় কৌশলাদি কোন দ্বীপে পাওয়া যায়? দাদি তাকে দক্ষিণ মেরুতে শৈবাল দ্বীপবাসীদের 'কামড়া কিম' (বাসগৃহ) নির্মাণের কৌশল অনুকরণ করে আনতে বললো। পরদিন ক্লাংচা সেই শৈবাল দ্বীপ থেকে গৃহনির্মাণের কৌশল অনুকরণ শিখে আসলো। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে গৃহনির্মাণের কাজ সমাপ্ত হলে দাদি ক্লাংচাকে খাদ্য সংগ্রহ করতে নির্দেশ দিলো। সে খাবারের সন্ধানে পূর্বদিকে অগ্রসর হলো। কিন্তু সেখানে 'পোকাক' নামে এক শয়তানের সাথে তার সাক্ষাৎ হয়। পোকাক তাকে খাদ্য সংগ্রহ করতে না দিয়ে সেখান থেকে বিতাড়িত করে দিলো। উল্লেখ্য যে, পৃথিবী সৃষ্টির পূর্বে এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কোনো শয়তান ছিলো না। শয়তানরা তখন মৃত্তিকা দ্বীপেই ছিলো। দ্বীপ থেকে যখন পাকচারুয়ামা মৃত্তিকা চুরি করে নিয়ে আসলো তখন পাকচারুয়ামার উপর শয়তানের নজর পড়ে। ক্লাংচার কু-মতলবের সুযোগ পেয়ে পোকাক পাকচারুয়ামার সঙ্গে এ পৃথিবীতে এসেছে বলে ম্রোদের বিশ্বাস। ক্লাংচা পোকাকের তাড়া খেয়ে দক্ষিণ দিকে রওনা দিলো। এমন সময় 'কুর্কুক' (এক প্রকার পাখি) ক্লাংচাকে স্মরণ করিয়ে দিলো "ক্লাংচা, তুমি 'দুর্মাং তাকোয়াই দামলী কাপলং সোং' অর্থাৎ "হিমালয়ের পাদদেশে গিয়ে খাদ্য সংগ্রহ করো। সেখানে পর্যাপ্ত পরিমাণে খাদ্য মজুদ আছে।" কুর্কুকের কথা অনুসারে ক্লাংচা সেখানে গেলো। ঘুরতে ঘুরতে একসময় একটা জংলি আলুর মূল পেলো। সে তা খেয়ে দেখলো খুবই মিষ্টি ও সুস্বাদু। তারপর সে আলু নিয়ে এসে দাদিকে দেখালো। দাদি তাকে নদীতে ধোয়ার জন্য পাঠিয়ে দিলো। ক্লাংচা নদীর তীরে পৌঁছতেই 'তরিক তরাং' নামে এক শয়তান যুগল তাকে নদীতে আলু ধুইতে বারণ করলো। ফিরে এসে দাদিকে ঘটনাসমূহ বর্ণনা করলো। দাদি তাকে উলটকম্বল গাছের আঁশের দ্বারা রশি বানিয়ে 'তরিক তরাং'কে ফাঁদ পেতে ধরার জন্য কৌশল শিখিয়ে দিলো। ক্লাংচা দাদির পরামর্শক্রমে কর্ম সম্পাদন করলো। কিন্তু ফাঁদ পুঁতে দেয়ার পূর্বে কোনো পূজার্চনা না করার কারণে 'তরিক তরাং' ফাঁদে পড়লো না। দাদি তাকে পুনরায় পূজার্চনার আয়োজন করে অশ্বত্থ ও বটবৃক্ষের আঠালো কষ দ্বারা ধরার জন্য কৌশল শিখিয়ে দিলো। দাদির কথামতো ক্লাংচা আবার অশ্বত্থ ও বটবৃক্ষের আঠালো কষ সেখানে ছিটিয়ে দিলো। পরদিন ক্লাংচা দেখতে পেলো 'তরিক তরাং'-এর পরিবর্তে 'ক্লাংচা সিরিং ওয়া' (কোয়েল পাখি) বৃক্ষের আঁঠায় এঁটে গেলো। ক্লাংচা পাখিটাকে দাদির কাছে নিয়ে গেলো। দাদি পাখির মাংস কুটতে গিয়ে দেখতে পেলো পাখির গলার ঝুলির মধ্যে নানা জাতের খাদ্যশস্যের দানা। শস্য দানাসমূহকে দু'ভাগে ভাগ করে একভাগ বীজ হিসেবে ব্যবহারের জন্য রেখে দিলো। আর একভাগ খাওয়ার জন্য রান্না করে ফেললো। রান্নার পর দাদি ক্লাংচাকে বললো—"এ খাদ্যদ্রব্য সুস্বাদু

কিনা তা পরীক্ষাস্বরূপ আমি আগে আহার করি। তাতে ভালো কি মন্দ, তার ফলাফল দেখতে পাবে।" আহার গ্রহণ শেষ হলে দাদির চোখে ঘুম আসলো। কিছুক্ষণ পর দাদি ঘুমিয়ে পড়লো। দাদির এমন অবস্থা দেখে ক্লাংচা ভীষণ কান্নায় ভেঙে পড়লো। নাতির বিলাপের আওয়াজে দাদির ঘুম ভেঙে গেলো। তখন ক্লাংচাকে এ খাবার সুস্বাদু এবং জীবনধারণের উপযোগী খাদ্যের উপাদান বলে দাদি জানালো।

ভূমি কর্ষণ ও চাষাবাদ সব পদ্ধতি দাদি তার নাতি ক্লাংচাকে শিখিয়ে দিয়ে বললো, "তুমি বাৎসরিক ফসলের চাষাবাদ কর যাতে সারা বছরের খাবার তোমার কাছে মজুদ থাকে। বাৎসরিক খাবার মজুদ না থাকলে বৃষ্টিবাদল দিনে কিংবা তোমার স্ত্রীর সন্তান জন্মদান কালে তুমি কষ্ট ভোগ করবে। আগেভাগে খাবার মজুদ না রাখলে দুর্দিন-দুর্বিপাকে তোমাকে অনাহারে-অর্ধাহারে থাকতে হবে। এখন আমার যাওয়ার সময় এসেছে।" যাওয়ার পূর্বে দাদি ক্লাংচাকে একজোড়া 'খংরাও' (চকমকি পাথর) দিয়ে বলে দিলো, তুমি লাল রঙের মোরগ দিয়ে এ প্রস্তরগুলোকে বছরে দু'বার করে পূজার্চনা কর, তাহলে তোমার কোনোদিন অভাব-অনটন হবে না এবং খাদ্যশস্যে পরিপূর্ণ থাকবে। আর তোমার জীবনসঙ্গী হিসেবে 'মাসিওয়া' (নারী) নামে আর এক নারীজাতি সৃষ্টি করে দিলাম। তোমরা এ পৃথিবীতে সমস্ত মানবজাতির পিতা-মাতা হবে। তোমরা এ ভূবনে বংশবৃদ্ধি কর।" এই বলে দাদি একখণ্ড মৃত্তিকা নিয়ে নারী জাতি সৃষ্টি করে দিলো। পরদিন সকালে উষার আলো দেখার সাথে সাথেই পশ্চিম দিকে নক্ষত্রের আলো বিচ্ছুরণের মতো দাদি পৃথিবী ছেড়ে চলে গেলো।

ম্রোদের বুই ক সাংচিয়া (সাদা ইঁদুরের গল্প)

ম্রোরা গো-হত্যা উৎসব আয়োজন করলে আয়োজনকারীর ঘরের সাথে সংযোজিত মাচাং এর সাথে বরাখ বাঁশ দিয়ে অ্যান্টিনা সাদৃশ্য 'দংলু কাউ' (খুঁটি) লাগায়। এটি থুরাইকে (সৃষ্টিকর্তা) জানিয়ে দেওয়া হয় যে, এ গৃহে গো-হত্যা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। এ দংলু কাউ-এ নানা ধরনের 'ছিদ' (বাঁশ দিয়ে তৈরি করা নানা ধরনের ফুল) দিয়ে 'ওয়াতো বাই' (দাঁড় কাকের বাসা) প্রতিকৃতি বানিয়ে রাখা হয়। এই দাঁড় কাকের বাসা তৈরির পেছনে একটি কিংবদন্তিমূলক সংস্কার বর্তমান। কথিত আছে-একসময় একগ্রামে দুই অনাথ বালক বাস করতো। তারা যখন হাটি হাটি পা পা অবস্থায় তখন তাদের মা মারা যায়। তাদের সৎ মা তাদেরকে ভালো চোখে দেখতে পারতো না। তাদের উপর প্রায় উৎপীড়ন-নিপীড়ন চালাতো। এহেন অমানসিক অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে তাদের বাবা তাদেরকে গভীর বনে ফেলে আসতো। ইঁদুর শিকারে নিয়ে গেলো। অরণ্যে যেতে যেতে বহুদূর পথ পরিক্রমায় একটা ইঁদুরের গর্ত খুঁজে পেলো তারা। ইঁদুরের গর্ত খুঁড়তে খুঁড়তে একসময় খিদের জ্বালায় দুটি অবুঝ শিশু এক বৃক্ষের ছায়ায় ঘুমিয়ে পড়লো। ছেলেরা ঘুমিয়ে পড়ার পর তাদের বাবা গর্ত থেকে ইঁদুর খুঁজে পেলো। ছেলেদের ঘুমিয়ে থাকার সুযোগে তাদের বাবা ইঁদুর জবাই করে তাদের গলায় রক্ত মেখে দিয়ে বাড়িতে ফিরে গেলো। যখন ছেলেদের ঘুম ভাঙলো তারা আর বাবাকে দেখতে পেলো না। একে অপরের গলায় ইঁদুরের রক্ত দেখে বুঝতে পারলো তাদের বাবা তাদের ফেলে ঘরে চলে গেছে। এখন তাদের প্রচণ্ড ক্ষিদে

পেয়েছে। কোথায় যাবে তাও বুঝতে পারলো না, আর কোথা থেকে বা তারা এসেছে তাও জানে না। চারদিকে ঘন বন আর বন। কোনো উপায় না দেখে তারা বনে ঘুরতে ঘুরতে এক বৃক্ষের ডালে দাঁড়কাকের বাসা দেখতে পেলো। দাঁড়কাকের ডিম খেয়ে ক্ষুধা নিবারণের জন্য বড়ো ভাই গাছের ডালে উঠলো। কাকের ডিম মুখে নিয়ে নীচে নামার সময় হাত ফসকে গেলে শরীরের ভারসাম্য রক্ষা করতে গিয়ে মুখের ভেতর হঠাৎ কাকের ডিম ভেঙে যায়। ডিমের কুসুম গিলে ফেললে সে দাঁড়কাকে রূপান্তরিত হয়। ছোটো ভাই ডাকলে বড়ো ভাই শুধু কা কা শব্দ ছাড়া মুখে আর কিছুই প্রকাশ করতে পারে না। তখন বড়ো ভাই চিন্তা করলো ছোটো ভাইকে কোনো গ্রামে নিয়ে যাবে। তাই ছোটো ভাইকে নিয়ে বড়ো ভাই উড়তে উড়তে এক ম্রো গ্রামে নিয়ে গেলো। এরপর ছোটো ভাই ঐ গ্রামের এক নিঃসন্তান বুড়ির ঘরে উঠলো। বুড়ির ঘরে থেকে বড়ো হয়ে এক ধনবান ব্যক্তি হিসেবে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হলো। একদিন সে গো-হত্যা অনুষ্ঠানের আয়োজন করলো। তখন আত্মীয়স্বজন সবাইকে দাওয়াত দিলো। আর বড়ো ভাইয়ের থাকার জন্য 'দংলু কাউ-এর উপর একটি বাসা বানিয়ে দিলো। এই লোকগল্পকাহিনি থেকে এখনো ম্রোরা গো-হত্যা অনুষ্ঠানের আয়োজন করলে 'দংলু কাউ'-এর উপর 'ওয়াতো বাই' অর্থাৎ দাঁড়কাকের বাসা বানিয়ে ঐ বাসার উপর একটি পাখির প্রতিকৃতি বসিয়ে রাখে।

ত্রিপুরাদের লোককাহিনি 'কংওয়াই কেন্দারা'

অনেকদিন আগে কোনো এক ত্রিপুরা গ্রামে এক মহিলার চার পুত্রসন্তান ছিলো। বনে ঘুরতে ঘুরতে তারা একদিন নাগরাজার পায়খানা দেখলো। তারা নাগরাজার পায়খানা খেয়ে দেখলো, পায়খানা অত্যন্ত সুস্বাদু। তখন তারা ভাবলো পায়খানা যদি এতই স্বাদ হয় তাহলে নিশ্চয় মাংস এর চেয়ে আরও বেশি স্বাদ হবে। তারা নাগরাজার মাংস খাওয়ার জন্য নাগরাজাকে মারতে সিদ্ধান্ত নিলো। এই চারপুত্র নাগরাজাকে খুঁজতে বের হলো। খুঁজতে খুঁজতে একসময় তারা নাগরাজার সাক্ষাৎ পায়। তখন নাগরাজার সাথে চারভাইয়ের প্রচণ্ড যুদ্ধ বাঁধলো। যুদ্ধ করতে করতে অবশেষে নাগরাজা চার ভাইকে এক এক করে মেরে ফেললো। অপরদিকে তাদের মা সন্তানদের অপেক্ষায় দিন গুণতে থাকে। তার সন্তানদের কোনো খোঁজ-খবর নেই। সন্তানরা ফিরে না আসাতে দুশ্চিন্তায় মহিলাটি দিনাতিপাত করতে থাকে। সেই সময়ে একদিন মহিলার স্বামীকে রাজা ডেকেছে শিপাঙ গাছ দিয়ে রানির জন্য ঢেঁকি বানাতে। কিন্তু শিপাঙ গাছ এত শক্ত যে শত চেষ্টা করেও কাটা যায় না। একটি শিপাঙ গাছকে লোকটি চারমাস ধরে কাটলো। তারপরও গাছটি কাটা যাচ্ছে না। রাজার আদেশ পালন করতে না পারায় মহিলাটির স্বামীকে রাজা বন্দি করে রেখে দিলো। মহিলাটির দুশ্চিন্তা আরও বেড়ে যায়। একদিন মহিলাটি উঠানে ঝাড়ু দিচ্ছিলো। ঝাড়ু দিতে দিতে তিনি উঠানে একটি সুপারি কুড়িয়ে পেলো। সুপারিটিকে মহিলা যত্ন করে কোমরে রাখলো। কিছুক্ষণ পর মহিলাটি দেখলো সুপারিটি আর নেই। কিছুদিন পর মহিলাটি অনুভব করলো, সে গর্ভবতী হয়েছে। প্রসবের সময়ে সে এক পুত্রসন্তান জন্মদান করলো। এই সন্তানের নাম রাখা হলো 'কওয়াই কেন্দারা'। এই কওয়াই কেন্দারা বড়ো হয়ে খুবই বলবান ও শক্তিশালী হয়ে

উঠলো। বড়ো হয়ে একদিন সে শিপাঙ গাছ কেটে ঢেঁকি বানিয়ে রাজার কাছে দিয়ে তার বাবাকে রাজার হাত থেকে উদ্ধার করলো। এরপর সে নাগরাজাকে মেরে তার চার ভাইকেও উদ্ধার করলো।

খুমীদের লোককথা 'উইকিই আচি' (কচ্ছপের গল্প)

অনেকদিন আগে এক বনে ছিল এক কচ্ছপ। একদিন ঐ বনে একটি জাম গাছে বানরেরা জামফল খাচ্ছিলো কচ্ছপটিও গাছের নীচে ঝরে পড়া জামফলগুলো খাচ্ছিলো। একসময় এক দুষ্টু বানর কচ্ছপটিকে দেখে ফেলে। বানরটি গাছ থেকে নেমে কচ্ছপটিকে ধরে গাছের উপরে তুলে নিয়ে যায় এবং গাছের ডালে আটকিয়ে রাখে। এরপর সব বানরেরা পালিয়ে যায়। অসহায় কচ্ছপটি গাছের উপর কাঁদতে লাগলো। তার চোখের জলে গাছটির নীচে একটি জায়গায় কাদার সৃষ্টি হলো। এই কাদামাটিতে একটি বন্যশূকর প্রায় স্নান করতে আসতো। একদিন কচ্ছপ শূকরটিকে বললো, তুমি এ কাঁদা মাটিতে গোসল করতে এসো না। কারণ, আমি যে কোনো সময় নিচে পড়তে পারি। তখন তোমার গায়ে লাগতে পারে এবং তুমি আঘাত পাবে। কিন্তু বন্যশূকর কচ্ছপের কথা না শুনে আপনমনে গোসল করতে থাকলো। সত্যি সত্যিই একসময় কচ্ছপটি দুম করে বন্যশূকরের উপর পড়লো। তাতে বন্যশূকরটি মারা গেলো। কচ্ছপটি মাটিতে পড়ার পর বেশ কয়েকদিন ভালো করে খাবার খেতে পারলো। এতে কচ্ছপটি বেশ স্বাস্থ্যবান ও বলবান হয়ে উঠলো। তারপর শূকরের লম্বা দাঁত দিয়ে একটি বাঁশি বানালো কচ্ছপটি সকাল-সন্ধ্যা ঐ বাঁশিটি বাজাতো। ঐ বাঁশির সুর শুনে এক ইঁদুর গর্ত থেকে বেরিয়ে এলো। তারপর সেই বাঁশিটি বাজিয়ে দেখবে বলে কচ্ছপের কাছে বাঁশিটি চাইলো। এভাবে বাঁশি বাজাতে বাজাতে এক পর্যায়ে ইঁদুরটি বাঁশি নিয়ে গর্তের ভেতর ঢুকে গেলো। কচ্ছপটি মনের দুঃখে আবার কান্নাকাটি শুরু করলো।

সেই বনের একটি উঁচু গাছের উপর ডিমে তা দিতে থাকা এক গোখরা সাপ কচ্ছপের কান্নার আওয়াজ শুনে সইতে না পেরে নিচে নেমে এসে কচ্ছপকে কান্নার কারণ জিজ্ঞেস করলো। কচ্ছপ উত্তর দিলো, তার শূকরের দাঁতের বাঁশি ইঁদুরে নিয়ে গেছে বলে সে কান্না করছে। কচ্ছপের কথা শুনে সাপটি বন্যশূকরের দাঁতের বাঁশিটি এনে দেবে বলে আশ্বাস দিলো। কচ্ছপকে তার ডিমে তা দিতে বললো সাপটি। কচ্ছপ যখন সাপের ডিমে তা দিচ্ছিলো তখন দুটি শ্যামা পাখি এসে কচ্ছপকে নড়েচড়ে তা দিতে বললো। শ্যামা পাখির কথামতো নড়েচড়ে সাপের ডিমে তা দিতে গিয়ে সব ডিম ভেঙে গেলো। কচ্ছপটি সাপের ভয়ে আবারও কান্নাকাটি করতে লাগলো। কিছুক্ষণ পর সাপটি বাঁশি নিয়ে ফিরে এলো। এসে আবারও কচ্ছপটিকে কান্নাকাটি করতে দেখে কি হয়েছে জানতে চাইল। কচ্ছপটি শ্যামা পাখির কুবুদ্ধি গ্রহণ করতে গিয়ে তার ডিমগুলো অজান্তে ভেঙে যাওয়ার কাহিনি কাঁদতে কাঁদতে সাপকে বললো। এরপর সাপ বাঁশিটি কচ্ছপকে দিয়ে বাড়িতে ফিরে যেতে বললো। কচ্ছপটি বাঁশি পেয়ে মনের আনন্দে বাঁশি বাজাতে বাজাতে ঘরে ফিরে গেলো। এদিকে সাপটি দুঃখে-ক্ষোভে তার ডিম ভেঙে যাওয়ার প্রতিশোধ নিতে প্রখর রোদে নদীর ধারে এক ঝোপে শ্যামা পাখির অপেক্ষায় রইলো। একসময় ঐ দুটি শ্যামা পাখি নদীতে পানি পান করতে আসলো। তখন শ্যামা পাখি দুটিকে এক ছোবলে মেরে ফেলে সাপটি প্রতিশোধ নিলো।

চাকদের লোককথা 'রেতুক তাইন্‌দু' (টিয়া পাখি)

অনেকদিন আগের কথা। কোনো এক চাক গ্রামে বাস করতো এক বুড়োবুড়ি। তাদের সংসারে ছিল ওদি নামে এক নাতনি। একদিন বুড়োবুড়ি উঠানে ধান শুকাতে দিয়ে গ্রামের পার্শ্ববর্তী জঙ্গলে শাক-লতাপাতা সংগ্রহ করতে যাবে বলে ঠিক করলো। যাবার সময় নাতনিকে বলে গেলো, 'ওদি আজ টিয়া পাখিরা ধান খেতে আসতে পারে। তুমি তাদের ধান খেতে দিও না।' তারপর তারা ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লো। বুড়োবুড়ি চলে যেতে না যেতেই টিয়া পাখিরা ঠিকই এসে পড়লো। তারপর ওদির কাছে ধান খেতে কাকুতি-মিনতি করলো। ছোটো ওদির দাদু-দাদির কথা মনে পড়লো। টিয়াদের বললো, আমার দাদু-দাদি তোমাদের ধান খেতে বারণ করে গেছে। তাই আমি দাদু-দাদি র কথা অমান্য করতে পারবো না। আমি তোমাদের ধান দিতে পারবো না। কিন্তু টিয়া পাখিরা নাছোড় বান্দা। ধান না খেয়ে তারাও ছাড়বে না। অবশেষে ওদি টিয়া পাখিদের ধান খেতে দিতে বাধ্য হলো। পাখিরা পেট ভরে ধান খাওয়ার পর দেখলো যে, চাতাই-এ একটুও ধান রইলো না। টিয়া পাখিরা বলাবলি করলো, হায়রে আমরাতো মস্ত বড়ো অন্যায় করে ফেলেছি। বেচারীকে কিছু বুদ্ধি দেওয়ার দরকার। এরপর যাবার সময় পাখিরা বললো, 'তুমি এক কাজ করবে, তোমার দাদু মারলে দাদির কাছে যাবে আর দাদি মারলে দাদুর কাছে যাবে, যদি দু'জন মিলে মারে তাহলে আমাদের কাছে চলে আসবে।' আমাদের দেশ উত্তর দিকে বহুদূরে অবস্থিত কাঁটা ভিঙি বনে। ঐ বন অতিক্রম করার সময় আমাদেরকে স্মরণ করে তোমাকে এই গান গাইতে হবে, 'কাটা ভিঙি বন, কাঁটা ভিঙি বন কোথায়? এক টিলা পার হবে, এক ছড়া পার হবে, তারপর আমাদের দেশ পাবে।'

ওদিকে ওদির দাদু-দাদি যথাসময়ে বাড়ি ফিরলো এবং নাতনির কাছে ধানের খোঁজখবর নিতে লাগলো। নাতনি কাঁদতে কাঁদতে বললো, 'টিয়া পাখিরা এসে জোর করে সব ধান খেয়ে ফেলেছে।' বুড়োবুড়ি একথা শুনে অত্যন্ত ক্ষেপে গেলো এবং নাতনিকে মারার জন্য উদ্যত হলো। তখন টিয়া পাখিদের পরামর্শ মতো ওদি দাদু মারতে চাইলে দাদির কোলে, দাদি মারতে চাইলে দাদুর কোলে আশ্রয় নিলো। দু'জন মিলে যখন মারতে চাইলো তখন সাথে সাথে দেরি না করে টিয়াদের দেশের অভিমুখে দৌড়ে পালালো। ওদি উত্তর দিকে বহুদূরে যাওয়ার পর তার চোখে পড়লো ঐ কাঁটা ভিঙি বন। তারপর টিয়াদের শিখিয়ে দেওয়া গান গাইতে লাগলো। মেয়েটি টিলা পার হলো, ছড়া পার হলো, তারপর দেখতে পেলো টিয়াদের দেশ। টিয়া পাখিরা মেয়েটাকে দেখে আনন্দে ফেটে পড়লো। মেয়েটির বুদ্ধি আছে কিনা পরীক্ষা করবে বলে টিয়া পাখিরা ঠিক করলো। তাকে ঘেরাও করে স্বাগত জানিয়ে তাদের রাজদরবারে নিয়ে গেলো। দরবারে পৌঁছার পর ওদিকে প্রশ্ন করা হলো : সোনার সিঁড়িতে উঠবে, নাকি ময়লাযুক্ত সিঁড়িতে উঠবে? উত্তরে মেয়েটি বললো, ময়লাযুক্ত সিঁড়িতে উঠবো।

মেয়েটির উত্তরে সন্তুষ্ট হয়ে তাকে টিয়া পাখিরা দরবারে উঠার জন্য সোনার সিঁড়ি পেতে দিলো। মেয়েটি থর থর করে কাঁপতে কাঁপতে সোনার সিঁড়ি বেয়ে দরবারে উঠে গেলো। দরবারে ঢুকে দেখতে পেলো এক অদ্ভুত কাণ্ড। কোথাও কোনো সাড়া শব্দ নেই, নীরব নিস্তব্ধ। যেদিকে চোখ যায় সেদিকে দেখতে পেলো অপূর্ব সুন্দর সুন্দর চকচকে রাজকীয় দ্রব্যসামগ্রী। কিছুক্ষণ পরে এক টিয়া এসে প্রশ্ন করলো, হে মানব আগন্তুক

দাঁড়িয়ে কেন? সোনার পাটিতে বসবে, নাকি ময়লাযুক্ত পাটিতে বসবে? মেয়েটি উত্তর দিলো, 'আমি ময়লাযুক্ত পাটিতে বসবো।' সাথে সাথে টিয়াটি মেয়েটিকে সোনার পাটি বিছিয়ে দিলো। এরপর টিয়া পাখিটি চলে গেলো। তখন মেয়েটি মনে মনে ভাবলো, টিয়া পাখিরাতো অত্যন্ত ভালো। তারা বোধহয় আমাকে পরীক্ষা করছে, আমি লোভী কি না? সে একা একা সোনার পাটিতে বসে মনে মনে ভাবলো, আমি এখানেই থেকে যাবো। কিছুক্ষণ পর আরেকটি টিয়া পাখি এসে তাকে প্রশ্ন করলো, 'হে মানব আগন্তুক তোমার নিশ্চয় খিদে পেয়েছে। এক্ষুণি তোমাকে খাবার দিচ্ছি। তুমি বড়ো মুরগি না ছোটো মুরগির মাংস খাবে? আর সোনার থালায় খাবে, নাকি ময়লার থালায় ভাত খাবে? মেয়েটি ছোটো মুরগির মাংস ও ময়লা থালা দিয়ে খাবে বলে সম্মতি জানালো। তার কথায় সন্তুষ্ট হয়ে টিয়া পাখিরা বড়ো বড়ো মুরগির মাংস সোনার থালায় খাওয়ালো।

ওদির আচার-ব্যবহারে সন্তুষ্ট হয়ে টিয়া পাখিরা দল বেঁধে তাদের রাজার কাছে গিয়ে রাজাকে তার সম্পর্কে বিস্তারিত জানালো। মেয়েটির প্রতি রাজার গভীর ভালোবাসা ও সহানুভূতি জাগলো। তারপর রাজা ওদিকে সোনার থালা, সোনার পাটি, সোনার গ্লাস ইত্যাদি দিয়ে টিয়া পাখিদেরকে তার দেশে পৌঁছিয়ে দিতে বললেন। ওদি তাকে তার দেশে ফিরে পাঠানোর কথা শুনে রাজার দেওয়া জিনিসগুলো নেবে না এবং তার সাথেই জীবন কাটাবে বলে বললো। টিয়া পাখিরা তাকে বললো, এই হুকুম আমাদের রাজার। রাজার হুকুম মানতেই হবে।' এই বলে টিয়া পাখিরা মেয়েটিকে সম্মানের সাথে তার দেশে পৌঁছিয়ে দিলো।

অপরদিকে বুড়োবুড়ি দু'জনই রেগে ওদির কোনো খোঁজখবর নিলো না। তারা মনে মনে ভাবলো হয়তো সে আর কোনোদিন ফিরে আসবে না। ফিরে না আসলে ভালো, সে থাকলে আরও ক্ষতি হবে। এমন সময় হঠাৎ নাতনি এসে পড়লো। নাতনি তার দাদু-দাদির উদ্দেশ্যে বললো, 'দাদু-দাদি, আমি এসেছি, আমি ফিরে এসেছি, আমাকে নিয়ে বাড়ি চলো।' নাতনির কথা শুনে বুড়োবুড়ি তার দিকে একটুও ফিরে তাকালো না। বরঞ্চ বিরক্ত হয়ে বুড়ি বললো, আমাদের জন্য কী নিয়ে এসেছো? এখান থেকে চলে যাও। তোমার আর আমাদের কাছে ঠাঁই নেই। তারপরও নাতনি হাসিমুখে দাদু-দাদির সামনে টিয়া পাখিদের দেওয়া মূল্যবান জিনিসপত্র এক এক করে বের করে দেখালো। নাতনির জিনিসপত্রগুলো দেখে একদিকে খুশি হলো ঠিকই, অপরদিকে মনে মনে তার প্রতি হিংসাও জন্মালো। দাদু তার পিঠে হাত বুলিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'নাতনি গো, তুমি এসব জিনিস কোথেকে কিভাবে পেলে, একটু বলবে কি? তাতে মেয়েটি সরল মনে বিস্তারিত সব খুলে বলে দিলো।

রাতে বুড়োবুড়ি চুপি চুপি আলাপ করলো টিয়া পাখিরা নাতনিকে কম জিনিসপত্র দিয়েছে। তাই তারা ফন্দি করলো টিয়া পাখিদের কাছে গিয়ে আরও বেশি সম্পত্তি নিয়ে আসবে। তারপরদিন তারা নাতনিকে না জানিয়ে টিয়াদের দেশে রওনা দিলো। তাদেরকে টিয়া পাখিরা স্বাগত জানালো। তাদেরকে রাজ দরবারে নিয়ে যাওয়ার জন্য টিয়া পাখিরা বুড়োবুড়িকে প্রশ্ন করলো, আপনারা সোনার সিঁড়ি দিয়ে উঠবেন, নাকি ময়লাযুক্ত সিঁড়ি দিয়ে উঠবেন?' বুড়োবুড়ি দু'জনই উত্তর দিলো, সোনার সিঁড়িতে উঠবো। এভাবে নাতনিকে যেভাবে প্রশ্ন করা হয়েছিলো ঠিক সেইভাবেই তাদেরকেও

প্রশ্ন করা হলো। কিন্তু বুড়োবুড়ি নাতনির সবগুলো উত্তরের বিপরীতে উত্তর দিলো। এরপর বুড়োবুড়ির হাতে সব সম্পত্তি ও তার সাথে একটি খাঁচা তুলে দিয়ে তাদের সাবধান করানো হলো, 'তোমাদের অনেক সম্পত্তি দেওয়া হলো। যাওয়ার পথে কোথাও খাঁচাটি খুলে দেখবে না, ঘরে পৌঁছার পর খাঁচাটি খুলে দেখবে, কেউ যেন দেখতে না পায়। তারপর বুড়োবুড়ি টিয়াদের দেশ থেকে চলে এলো। পথে যেতে যেতে হঠাৎ বুড়ির পায়খানা করতে ইচ্ছে হলো। বুড়ি পাশের ঝোপের আড়ালে পায়খানা করতে গেলে তাৎক্ষণিক সেই ফাঁকে বুড়ো খাঁচাটি খুলতে গেলে সাথে সাথে চারিদিকে কালো মেঘ ঢেকে ফেললো এবং মেঘের গর্জন অনবরত গর্জে উঠলো। এতে বুড়ো টিয়াদের কথা বিশ্বাস করে ভয়ে আর খুলে দেখলো না। তারপর বুড়োবুড়ি বাড়িতে পৌঁছে টিয়াদের কথামতো সমস্ত দরজা-জানালা বন্ধ করে খাঁচাটা খুলে দেখতেই সাথে সাথে খাঁচা থেকে বিভিন্ন রকমের বিষাক্ত সাপ বের হয়ে আসলো এবং বুড়োবুড়িকে কামড় দিয়ে মেরে ফেললো।

পাংখোয়াদের লোককথা (সুয়ানলু সুয়ানলা)

অনেকদিন আগের কথা। কোনো এক পাংখোয়া গ্রামে এক পিতার পাঁচ পুত্র ও এক কন্যা সন্তান ছিলো। পাঁচ পুত্রের মধ্য থেকে একজন প্রস্তাব দিলো, সমাজে আমাদের সুনাম হবে এমন কৃতিত্ব দেখানো উচিত। সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নিলো, দা দিয়ে এক কোপে ঘিলালতা কেটে ফেলে আমরা আমাদের কৃতিত্ব দেখাবো। যে এক কোপে ঘিলালতা কাটতে পারবে না তাকে বাঘ চলাচলের পথের ধারে ঘর তৈরি করে রাখা হবে বলে শপথ করিয়ে পাঁচ ভাইকে জন্মদাতা পিতাই প্রতিজ্ঞা করালো। পরেরদিন সব ভাই মিলে যার যার দা ভালোভাবে শান দিলো। সেসময় হঠাৎ তাদের বাবা প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে বনে চলে গেলো। সেই সুযোগে পাঁচ ভাইয়ে মিলে বুদ্ধি করে পাথর দিয়ে ঘষে তাদের পিতার দা-এর ধার ভোঁতা করে দিলো। পাঁচ ভাইয়ে মিলে ধারালো দা নিয়ে সেই ঘিলালতা কাটার প্রতিযোগিতায় নামলো। তারা প্রত্যেকে এক এক কোপে ঘিলালতা কেটে ফেলতে পারলো। কিন্তু তাদের বাবা অনেকবার কোপ দিলেও ঘিলালতা কাটতে পারলো না। তাদের শপথ মতে, বাবা যেহেতু এককোপে ঘিলালতা কাটতে পারেনি সেহেতু বাবাকে বাঘ চলাচলের রাস্তায় ঘর তৈরি করে দিতে হবে। বাবার বিপদের কথা ভেবে ছোটো ছেলে বাবাকে বললো, 'কথা থাকলেও এমন ভয়ানক কাজ করা তোমরা উচিত নয় বাবা। চলো আমরা সবাই বাড়িতে যাই।' তখন বাবা বললো, 'পুরুষের জবান এককথা, দুই কথা হবে না। আমাকে যেখানে বাঘ চলাচল করে সেখানে একটি কুড়েঘর তৈরি করে দিয়ে তোমরা চলে যাও।' পাঁচ সন্তান তাই করে বাড়ি চলে গেলো।

রাত হলে বাঘেরা হুম হুম শব্দ করে কুড়েঘরের দিকে আসতে শুরু করলো। তখন তাদের পিতা চিৎকার করে বলে উঠলো, 'আমি পাঁচ বীরপুত্রের জন্মদাতা। আমার শরীরের গঠন বোতলের মতো। আমার দাঁত মুরগির ঘরের দরজার মতো। চোখ সুতার বলের মতো। বাঘ তোমরা কোথায়? এই বলে গর্জে উঠতেই বাঘেরা ভয়ে পালিয়ে গেলো। পরদিন একমাত্র মেয়ে খাবার নিয়ে বাবাকে ডাকলো, বাবা তুমি আছ নাকি? বাবা বললো,

আমি আছি, ভেতরে এসো। মেয়েটি ঘরে ঢুকে তার বাবাকে খাবার খেতে দিলো। এভাবে সকাল বিকাল বেশ কয়েকদিন ধরে মেয়ে বাবাকে খাবার দিলো। দুইরাত দুইদিন জেগে থাকতে থাকতে তৃতীয় রাতে বাবার চোখে ঘুম এলো। এ সুযোগে বাঘেরা আক্রমণ করে তাদের বাবাকে মেরে ফেললো। প্রতিদিনের মতো মেয়ে সকালে এসে বাবাকে ডাক দিলো। কিন্তু বাবার কোনো সাড়াশব্দ নেই। ভেতরে গিয়ে দেখলো, বাবাকে বাঘেরা মেরে ফেলেছে। বাড়িতে এসে ভাইদেরকে বাবার সব ঘটনা খুলে বললো। বাবার হত্যার প্রতিশোধ নিতে পাঁচ ভাই তীর-ধনুক নিয়ে রওনা দিলো বাঘের সন্ধানে।

অনেক পথ পরিক্রমায় তারা মোরগের পাড়ায় পৌঁছলো। মোরগ বললো, পাঁচ ভাইরা কোথায় যাও? তারা বললো, বাবার হত্যার প্রতিশোধ নিতে।' তখন মোরগ বলল, আমি তোমাদের পরীক্ষা করে দেখবো, তোমরা তোমাদের বাবার হত্যার প্রতিশোধ নিতে পারবে কিনা। আমি যখন সিঁড়ির উপর বসে ডাক দেবো তখন তোমরা আমাকে ধনুকের তীর ছুড়ে মারবে। আমাকে মারতে পারলে আমার মাংস তোমরা পথের খাবার হিসেবে নিয়ে যেও।' পাঁচ ভাই খুশি হয়ে তীর-ধনুক নিয়ে প্রস্তুত থাকলো। এরপর মোরগ সিঁড়িতে উঠে কু-কু-রু-কুক ডাক দেওয়া মাত্রই পাঁচ ভাই তীর ছুঁড়লো। কিন্তু সব তীর লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো।

এরপর হাঁটতে হাঁটতে তারা আবার মর্দ্দা শুকরের পাড়ায় পৌছলো। সেখানেও একই প্রশ্ন। পাঁচ ভাই একই জবাব দিলো, বাবার হত্যার প্রতিশোধ নিবে। শুকরও বললো, আমাকে আগে মেরে দেখো, তোমরা পিতা হত্যার প্রতিশোধ নিতে পারবে কিনা? তারা সবাই শূকরকে মারতে চেষ্টা করলো। কিন্তু তারা শূকরকেও মারতে পারলো না। এভাবে গয়ালের পাড়াও অতিক্রম করে অবশেষে দেবীর ঘরে গিয়ে পৌঁছলো। পাচঁ ভাই দেবীর ঘরের দরজায় গিয়ে ডাকলো–নানি, ঘরে মেহমান এসেছি। দরজা খুলে দাও।' ঘরের ভেতর থেকে দেবী জবাব দিলো—'আমি অসুস্থ, দরজা খুলতে পারবো না। পাঁচ ভাইয়ের বারবার বিনীত অনুরোধে দেবী দরজা খুলে দিলো। এই দেবী হলো বাঘের মালিক এক পেত্নী। সে বাঘকে শিকারি কুকুরের মতো লেলিয়ে দিয়ে জীবজন্তু ও মানুষ ধরে নিয়ে আসে। দেবী তাদের জন্য খাবার রান্না করলো। তরকারি হিসেবে তাদের বাবার মাংস রান্না করে তাদের খাওয়ালো। দেবীর রান্না খেয়ে তারা দেবীকে খুব প্রশংসা করলো। কিন্তু তারা বুঝতে পারেনি যে, তাদের জন্য তাদের বাবার মাংস রান্না করে খাওয়ানো হয়েছে। পাঁচ ভাইয়ের কাছে তীর-ধনুক ও তাদের মতিগতি দেখে দেবী বুঝতে পারলো তারা তাদের বাবার হত্যার প্রতিশোধ নিতে তার বাঘগুলোকে মারতে এসেছে। সে মনে মনে ফন্দি করলো তাদের তীরগুলো নষ্ট করে দেবে। তাই খাওয়ার শেষে দেবী তাদের বললো, অনেক রাত হয়েছে এবার তোমরা ঘুমিয়ে পড়ো। তবে হ্যাঁ, আমার ঘরে অনেক ইঁদুর আছে। তোমাদের তীর-ধনুকগুলো ইঁদুরে নষ্ট করতে পারে। তীর-ধনুকগুলো আমাকে দাও, আমি যত্ন করে রেখে দেবো। পাঁচ ভাই সরল বিশ্বাসে তীর-ধনুকগুলো দেবীর হাতে তুলে দিলো। রাতে যখন তারা ঘুমিয়ে পড়লো তখন দেবী তার তীক্ষ্ণ দাঁত দিয়ে তীরের ধার নষ্ট করে দিলো। সকালে উঠে তাদের হাতে তীর-ধনুক দিয়ে দেবী প্রশ্ন করলো, 'তোমরা কি চাও? গাছের পিছলা, নাকি মাটির পিছলা?' তারা বললো, উচু মাটির পিছলা। তখন দেবী তার পালিত বাঘগুলোকে ডাকলো, 'কোথায় ক্ষুধার্ত কুকুরেরা এসো,

তোমাদের খাওয়ার বাকি খাওয়াগুলো খেতে এসো।' হুম হুম করে দলে দলে ক্ষুধার্ত বাঘগুলো চলে এলো। পাঁচ ভাইয়ে একে একে সবাই তীর ছুঁড়লো কিন্তু তীরের ধার নষ্ট হয়ে যাওয়ায় একটি বাঘও তারা মারতে পারলো না। অবশেষে পাঁচ ভাইকেও বাঘেরা খেয়ে ফেললো।

এই দুঃসংবাদ শুনে তাদের একমাত্র বোন খুবই মর্মাহত ও শোকাহত হলো। পিতাকে হারানোর পর শেষ পর্যন্ত তার প্রিয় পাঁচ ভাইকেও হারালো. নিঃস্ব মনে সে 'পাথিয়ান'কে (সৃষ্টিকর্তা) ডাকতে লাগলো সর্বক্ষণ। একদিন মাচাং-এর উপর ধান শুকাতে গিয়ে বোনটি আকাশের দিকে তাকিয়ে আবারও পাথিয়ানকে স্মরণ করলো। তখন হঠাৎ আকাশ থেকে একটি আমলকী ফল ধান শুকানোর চাটাইয়ের উপর পড়লো। ঐ আমলকী ফল খেয়ে পাঁচ ভাইয়ের বোনটি গর্ভধারণ করলো। প্রসবের সময় হলে বোনটি এক পুত্রসন্তান জন্ম দিলো। সন্তানের কি নাম রাখবে বলে ভেবে না পেয়ে ধাত্রী বুড়ি সন্তানের নাম রাখলো 'সুয়ানলো সুয়ানলা।' আমলকী ফল খেয়ে এই সন্তান হয়েছে বলে তার নাম রাখা হয় সুয়ানলো সুয়ানলা অর্থাৎ আমলকী মানব সন্তান। সন্তান জন্মদাত্রী সন্তানের নাম শুনে বুড়িকে খুব প্রশংসা করলো। সুয়ানলো সুয়ানলা দিনে দিনে বড় হতে লাগলো। নানা ধরনের খেলাধুলাতে বন্ধুদের সাথে খেলায় মেতে উঠলো। একদিন মার কাছে এসে সে খেলা করার জন্য একটি ঘিলা চাইলো। মা তাকে আকাশের দিকে তাকিয়ে পাথিয়ানের কাছে ঘিলা চাইতে বললো। ছেলেটি আকাশের দিকে তাকিয়ে ঘিলা চাইলো। তাতে আকাশ থেকে পাথরের একটি ঘিলা পড়লো। তারপর সে ঘিলা নিয়ে বন্ধুদের সাথে খেলতে গিয়ে তার ঘিলার আঘাতে বন্ধুদের ঘিলা সব ভেঙে গেলো। বন্ধুরা আর তার সাথে খেলতে চাইলো না। এমনকি পিতৃহীন সন্তান বলে তাকে অপবাদ দিয়ে গালিগালাজ করলো। মা তখন তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললো, 'কে বলে তোমার বাবা নেই? তোমার বাবা অত্যন্ত দয়ালু, আমরা যাকে পাথিয়ান বলি তিনিই তোমার পিতা। তোমাকে এখন থেকে প্রস্তুত হতে হবে তোমার নানা ও পাঁচ মামার হত্যার প্রতিশোধ নিতে।' এরপর তাকে নানা ধরনের রণকৌশল, তীর-ধনুক মারা কৌশল ইত্যাদি শিখিয়ে দিলো। গমের মতো এক প্রকার শস্য যা অত্যন্ত পিছল যাকে পাংখোয়া ভাষায় 'মিম' বলে। পিছল এই মিমের উপর দৌঁড়াদৌঁড়ি করে নিজেকে প্রস্তুত করলো সুয়ানলো সুয়ানলা। সুয়ানলো সুয়ানলা সম্পূর্ণ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হওয়ার পর মা তাকে বললো, 'তোমার প্রতিশোধের সময় এসেছে। তীর-ধনুক ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র তুমি আকাশের দিকে তাকিয়ে তোমার বাবার কাছে চেয়ে নিও। তার জিনিস সবগুলোই শক্ত ও মজবুত।'

পাথিয়ানের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় সব জিনিস চেয়ে নিয়ে সুয়ানলো সুয়ানলা রওনা দিলো নানা ও মামাদের হত্যার প্রতিশোধ নিতে। সেও মামাদের মতো মোরগ পাড়া, মর্দা শুকরপাড়া, গয়াল পাড়া অতিক্রম করে অবশেষে দেবীর ঘরে গিয়ে পৌঁছলো। ঠিক আগের মতো সুয়ানলু সুয়ানলাকেও দেবী তার কাছে তীর-ধনুক রাখতে বললো। সুয়ানলু সুয়ানলা দেবীর ফন্দি ঠিক বুঝতে পারলো। তাই তার তীর-ধনুক দেবীকে না দিয়ে বালিশের নীচে রেখে শুয়ে পড়লো। তারপরও রাতের অন্ধকারে দেবী এসে তার তীর-ধনুক নষ্ট করতে চাইলো। কিন্তু পাথিয়ানের তীর ধুনক লোহার চেয়েও

শক্ত, তাই সে কিছুতেই নষ্ট করতে পারলো না। সকালে দেবী সুয়ানলুকে বললো,'তুমি কি চাও, মাটির পিছলা নাকি বাকলহীন গাছের পিছলা?' সুয়ানলু বললো, 'আমি বাকলহীন গাছের পিছলা চাই। এই বলে সে বাকলহীন গাছে উঠে গেলো। দেবী তার বাঘগুলোকে ডাকলো,' আয় আয় তোমাদের বাকি খাওয়া খেতে এসো।' বাঘেরা হুম হুম করে বেরিয়ে আসলো। তখন সুয়ানলো তীর-ধনুক দিয়ে এক এক করে সব বাঘকে মেরে ফেললো। সর্বশেষে অন্তঃসত্ত্বা বাঘিনীটি ভয়ে ভয়ে আসলো। বাঘিনীকেও তীর মেরে পেট ফেটে দিলো। বাঘিনীর পেট ফেটে বাঘের বাচ্চারা বেরিয়ে জঙ্গলে চলে গেলো। তখন সজারু ও অন্যান্য বন্যপ্রাণিরা সব বাচ্চাগুলোকে খেয়ে ফেললো। দেবী কাকুতি মিনতি করে কোনোরকম প্রাণে রক্ষা পেলো। সোয়ানলু মাকে প্রমাণ হিসেবে দেখানোর জন্য একটি বাঘের মাথা কেটে নিয়ে বাড়ি ফিরে আসলো। ঘরে এসে দেখে মা অন্যলোকের সাথে অপকর্মে লিপ্ত আছে। বারবার ডাকার পরও মা ঘর থেকে বের হলো না। সে রেগে গিয়ে বাঘের মাথা দরজার সামনে রেখে দিয়ে বাড়ি ছেড়ে চলে গেলো। সুয়ানলো আকাশের দিকে তাকিয়ে পাথিয়ানকে প্রার্থনা করে বললো, 'বাবা পাথিয়ান, আমার জন্য একটি সিঁড়ি নামিয়ে দাও।' সোয়ানলোর প্রার্থনায় পাথিয়ান আকাশ থেকে একটি সিঁড়ি নামিয়ে দিলেন। সুয়ানলো সেই সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে আকাশে গিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেলো। অপরদিকে মা দরজা খুলে দেখলো, সুয়ানলো আর নেই। শুধু একটি বাঘের মাথা ও মুরগিছানা দেখতে পেলো। অনেক খোঁজ করেও আর কোথাও সোয়ানলোকে পাওয়া গেলো না। কাঁদতে কাঁদতে মা বাঘের মাথা নাড়াচাড়া করতে গিয়ে হঠাৎ বাঘের দাঁতে লেগে তার আঙ্গুল কেটে যায়। কেটে যাওয়া আঙ্গুল থেকে অনবরত রক্ত ঝরতে ঝরতে অবশেষে মা মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লো।

খিয়াংদের লোককথা (লাল গাল মাছের গল্প)

অনেকদিন আগের কথা। কোনো এক খিয়াং গ্রামে বাস করতো এক বুড়ো ও বুড়ি। একদিন তারা দুপুরের খাবারের জন্য নদীতে মাছ ধরতে গেলো। তারা সেখানে একটি কুম (গভীর জলাশয়) দেখতে পেলো। সেই কুমে প্রচুর মাছ ছিলো। বুড়ো কুমের মধ্যখানের পাথরটি সরাতে গিয়ে একটি লাল গাল (মুখ) মাছ পেলো। খিয়াং ভাষায় এ মাছকে 'ভুলুই বেঙসেন চঃখুই' অর্থাৎ লাল গাল মাছ বলে। বুড়োবুড়ি মাছটিকে পেয়ে অবাক হয়ে দেখতে লাগলো। বুড়ো পৃথিবীর সমস্ত জীবজন্তু, গাছপালা, মাটি, পাথর ও মাছ ইত্যাদির ভাষা বুঝতে পারতো। বুড়ো মাছকে দেখে জিজ্ঞেস করলো, 'ও মাছ, তোমার গাল এতো লাল কেন?' জবাবে মাছটি বললো, 'আমার ইচ্ছাতে আমার গাল লাল হয়নি, পাথরটি আমাকে চাপা দেওয়াতেই আমার গাল লাল হয়েছে।' বুড়ো তখন পাথরটিকে জিজ্ঞেস করলো, 'পাথর, তুমি কেন তাকে চাপা দিয়েছ?' উত্তরে পাথর বললো, 'ইচ্ছাকৃতভাবে আমি তাকে চাপা দিইনি। গাছের ডাল আমার উপর পড়ায় মাছকে চাপতে হয়েছে।' বুড়ো গাছের ডালকে জিজ্ঞেস করলো, 'গাছের ডাল, তুমি কেন পাথরের উপরে পড়েছো? গাছের ডালটি জবাব দিলো, 'আমি ইচ্ছাকৃতভাবে ভেঙে পড়েনি, বানর আমাকে নাড়া দেওয়াতেই আমি ভেঙে পড়েছি।' বুড়ো আবার বানরকে জিজ্ঞেস করলো, 'বানর, তুমি কোন গাছের ডালকে নাড়া দিয়েছো? বানরটি বললো,

'আমি ইচ্ছাকৃতভাবে গাছের ডালকে নাড়া দিইনি। কুকুরটি ঘেউ ঘেউ করে ডাকার আওয়াজের ভয়ে আমি গাছের ডালটি নাড়া দিয়েছি। বুড়ো আবার কুকুরটিকে জিজ্ঞেস করলো, 'কুকুর, তুমি কোন ঘেউ ঘেউ করে বানরকে তাড়া করেছো?' কুকুরটি বললো, 'কুঁজো বুড়োবুড়ি, আমাকে বানরটিকে তাড়াতে বলেছিলো, তাই আমিও ঘেউ ঘেউ করে বানরকে তাড়িয়ে দিয়েছি।' তখন বুড়ো ঐ কুঁজো বুড়োবুড়িকে জিজ্ঞেস করলো, 'কেন তোমরা কুকুর দিয়ে বানরটিকে তাড়িয়ে দিয়েছো'? তখন কুঁজো বুড়োবুড়ি বললো, 'আমরা এমনি বানরকে কুকুর দিয়ে তাড়াইনি'। বানরটি আমাদের জুমে গিয়ে মারফা, মিষ্টি কুমড়া, ধান, ভুট্টা সব খেয়ে সর্বনাশ করেছে। তাই কুকুর দিয়ে বানরকে তাড়িয়েছি। তখন বুড়োবুড়ি বললো, 'একজনের কারণে সবারই ভোগান্তি পোহাতে হয়।'

মারমা লোককথা (সর্প মানব)

অনেকদিন আগের কথা। একদা এক গ্রামে এক বুড়ো দম্পতি বাস করতো। গ্রামটি ছিল পাহাড়ে, জঙ্গলে ঘেরা। তাদের বিবাহযোগ্য তিনটি কন্যা ছিলো। একদিন বুড়োবুড়ি তাদের বাড়ির পাশেই ছোটো পাহাড়ি নদীতে গিয়ে তাদের কাপড় ধুচ্ছিলো। একসময় বুড়ো দেখতে পেলো, একটা লাল টকটকে পাকা ডুমুর ফল উজান থেকে স্রোতে ভেসে আসছে। বুড়ো ফলটা ধরে নিলো। তারা এমন সুন্দর ডুমুর ফল আগে কখনো দেখেনি। খেয়ে দেখলো খুবই সুমিষ্ট। তারা ফলটা আরও পাওয়ার আশায় নদীর কূল ধরে খোঁজ করতে করতে উজানের দিকে চলে গেলো।

বুড়োবুড়ি অনেকদূর গিয়ে দেখতে পেলো, নদীর তীরেই সেই ফল ভর্তি গাছটা। দেখে তারা খুবই খুশি হলো। কিন্তু হায়! গাছের ডালে পেঁচিয়ে আছে একটি বড়ো সাপ। বুড়ো সাপের ভয়ে ফল পাড়তে সাহস করলো না। বুড়ি বুদ্ধি করে সাপকে বললো, 'ও সাপ, তুমি খুব ভালো, দয়া করে আমাদের জন্য দুটি ফল ফেলে দাওনা।' বুড়ির কথায় সাপটা তাদের জন্য দুটি ফল ফেলে দিলো। তবুও বুড়োবুড়ির মন ভরলো না। তারা বললো, 'আমাদের তিনটি বিবাহযোগ্য মেয়ে আছে। তুমি চাইলে বড়টাকে বিয়ে করতে পার বলে সাপের কাছে আরও কয়েকটি ফল চাইলো। এরপর সাপ আরও কয়েকটি ফল ফেলে দিলো। বুড়ি আরও বললো, 'মেজো মেয়েটাকে বিয়ে করতে চাইলে গাছের অর্ধেক ফল ফেলে দাও।' সাপটা তাই করলো। তখন বুড়োবুড়ি ভাবলো, সাপটা খুবই বোকা। সাপের সাথে মেয়ের কে বিয়ে দেবে? তবু নিছক কথায় ভুলিয়ে গাছের সব ফল পেলে মন্দ কি। তাই তারা আবারও বললো, 'আমাদের ছোটো মেয়েটাকে বিয়ে করতে চাইলে গাছের সব ফল ফেলে দাও।' সাপও গাছের সব ফল ঝেড়ে ফেলে দিলো। বুড়োবুড়ি মনের আনন্দে সব ফল কুড়িয়ে ঝুড়িতে ভরে বাড়ি নিয়ে এলো। তারা সাপের কথা ভুলেই গেলো। সাপ কিন্তু কিছুই ভুললো না।

পরদিন দেখা গেলো সাপটি তাদের বাড়িতে এসে হাজির। ঘরের সবস্থানে আনাগোনা করে বুড়োবুড়ির কাছে তাদের দেওয়া প্রতিশ্রুতির কথা জানালো। বাড়ির সবাই ভয়ে অস্থির হয়ে রইলো। উপয়ান্ত না দেখে বুড়োবুড়ি মেয়েদেরকে সব কথা খুলে বললো। শুনে মেয়েরা সাপকে একবারেই বিয়ে করতে রাজি হলো না। অবশেষে অনিচ্ছা সত্ত্বেও সবার মঙ্গলের কথা চিন্তা করে ছোটো মেয়েটা নিজেকে উৎসর্গ করে

সাপের সাথে বিয়েতে রাজি হলো। রাতে সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে মেয়েটি সাপের সাথে বসবাসের জন্য বাসর ঘরে ঢুকলো। সাপটা ঘরের কোণে গোল পাকিয়ে চুপচাপ শুয়ে রইলো। ভয়ে মেয়েটার চোখেও ঘুম এলো না। রাত যখন গভীর হলো সাপটা তখন নড়েচড়ে উঠলো। আস্তে আস্তে নিজের সাপের খোলস ছাড়িয়ে বের হয়ে উঠে দাঁড়ালো এক সুদর্শন যুবক। তা দেখে মেয়েটা খুব অবাক হয়ে গেলো। ভুল দেখলো কিনা চোখ কচলিয়ে আবার তাকালো, না কোনো ভুল হয়নি, ঠিকই দেখছে। তখন যুবকটি মেয়েটাকে বললো, 'ভয় পেয়ো না, আমিও তোমার মতো মানুষ। ভাগ্য আমাকে তোমার কাছে টেনে এনেছে। এক দুষ্ট ডাইনির কুপ্রস্তাবে রাজি হয়নি বলে সে আমাকে মন্ত্রের বলে সর্পে পরিণত করেছে। আমাকে কোনো নারী স্বেচ্ছায় বিয়ে করতে রাজি না হওয়া পর্যন্ত আমি মুক্তি পাবো না বলে ডাইনি আমাকে অভিশাপ দিয়ে সাপ বানিয়ে রেখেছে। তুমি আমাকে উদ্ধার করেছো, আমি তোমার কাছে ঋণী।' মেয়েটা তার সব কথা বিশ্বাস করলো। সে যুবক আবার যদি সাপ হয়ে যায় তার ভয়ে তাড়াতাড়ি উঠে সাপের খোলসটাকে আগুনে পুড়িয়ে ফেললো। খোলসটা যখন আগুনে পুড়ানো হলো তখন যুবকের শরীরেও একটু জ্বালা পোড়া বোধ করছিলো। খোলসটি সম্পূর্ণ পুড়ে যাবার পর সেও স্বাভাবিক হয়ে এলো।

পরদিন বুড়োবুড়ি ঘুম থেকে জেগে দেখলো, তাদের মেয়ে দিব্যি জীবিত আছে। সঙ্গে সাপের বদলে এক সুদর্শন যুবককে দেখে তারা অবাক হয়ে গেলো। মেয়েটা রাতের সব ঘটনা তাদেরকে খুলে বললো। এরপর সর্প থেকে মানুষ হবার এই ঘটনার খবর চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লে আশে-পাশের মানুষেরা একে একে সবাই সর্পমানবকে দেখতে এলো। এরপর তারা সুখেই দিন কাটাতে লাগলো। তাদের কোলে একটি পুত্রসন্তানও জন্ম নিলো। এবার তাদের সংসারে আরও পূর্ণতা আসলো।

পাশের গ্রামে এক বুড়োবুড়ির সংসার ছিলো। তাদের সংসারে পাঁচটি কন্যা ছিলো। অনেক বয়স হয়ে গেলেও সে কন্যাদের কারও বিয়ে হয়নি। বিয়ের জন্য তাদেরকে কেউ দেখতে পর্যন্ত আসেনি। মেয়েদের চিন্তায় মা বাবার চোখে ঘুম নেই। হঠাৎ তাদের মনে পড়লো পাশের গ্রামে অমুকের মেয়ের সাথে সাপের বিবাহ হয়েছে। পরে সাপটা মানুষ হয়ে যাবার পর তারা সুখে সংসার করছে। তাই তাদের মেয়েদেরকেও সাপের সাথে বিয়ে দেওয়ার চিন্তা-ভাবনা শুরু করলো। যেই ভাবা সেই কাজ। তারা বন-জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে খুঁজে একটি বিরাট অজগর সাপ ধরে আনলো। বড়ো মেয়েটার সাথে সেই সাপের বিয়ে দিলো।

রাতে বাসর ঘরে ঢুকার কিছুক্ষণ পর মেয়েটা চেঁচামেচি করতে লাগলো। মেয়েটি মাকে ডেকে বললো, 'মা, ও আমার হাঁটু পর্যন্ত উঠেছে।' মা শুনে বললো, 'দুর বোকা মেয়ে, জামাইবাবা তোকে আদর করছে, তাতে কি হয়েছে।' কিছুক্ষণ পর মেয়েটি আবার চেঁচিয়ে ডাকলো, 'মা, সে আমার কোমর পর্যন্ত উঠেছে, আমাকে ধরো।' মা বললো, 'আহা অমন করো না। জামাই বাবা হয়তো গায়ে হাত-পা তুলেছে। চুপ করে থাকো, কেউ শুনলে হাসবে।' কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকার পর আবারও মেয়েটি চিৎকার করে বললো, 'ও আমার গলা পর্যন্ত উঠেছে, আমাকে বাঁচাও মা।' মা তখন নিজের ভাগ্যকে ধিক্কার দিয়ে মনে মনে বললো, 'পোড়া কপাল আমার, এত চেষ্টা করে বিয়ে

দিয়েও শান্তি পাচ্ছি না।' এরপর আর কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া গেলো না। মা-বাবা নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়লো।

সকালে অনেক বেলা হয়ে গেলেও মেয়ে ও জামাই দরজা খুলছে না দেখে মা বাবা তাদেরকে অনেকবার ডাকলো। কিন্তু তাদের কোনো সাড়া পাওয়া গেলো না। দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকে দেখে মেয়েটাকে সাপটা গিলে খেয়ে ফেলেছে। তা দেখে মা-বাবা, বোনেরা সবাই মিলে বুক চাপড়াতে চাপড়াতে হায় হায় করে কাঁদতে লাগলো। সাপটাকে টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলতে হবে। সর্পমানবকে ডেকে এনে সাপটাকে কাটার জন্য গ্রামবাসী সবাই অনুরোধ করলো। সবার অনুরোধ ফেলতে না পেরে সর্পমানব অজগরটাকে দা দিয়ে টুকরো টুকরো করে কাটলো। কাটার সময় সাপের রক্ত তার বুকে, কপালে ও গলায় পড়ার সাথে সাথে সর্পমানবটি আবার সাপে রূপান্তরিত হয়ে গেলো। এ অবস্থা দেখে সবাই আশ্চর্য হয়ে দুঃখ প্রকাশ করতে লাগলো। সর্পমানবটি সাপে রূপান্তরিত হবার পর কয়েকদিন বাড়িতে থাকার পর তার ছেলে মেয়েরা তাকে দেখে ভয় পাবে চিন্তা করে সে চিরদিনের জন্য জঙ্গলে চলে গেলো।

তঞ্চঙ্গ্যা লোককথা 'কলাখুর কন্যা পসন'

অনেকদিন আগের কথা। এক দেশে বাস করতো এক বুড়ো দম্পতি। তাদের ছিল একটিমাত্র ছেলে। বুড়ো একদিন মারা গেলো। বুড়ি ছেলেকে নিয়ে সুখে-দুঃখে দিন কাটাতে লাগলো। দেখতে দেখতে ছেলে বড়ো হলে তার বিয়ে করতে ইচ্ছে জাগলো। একদিন ছেলেটির ভারি মুখ দেখে মা জিজ্ঞেস করলো, 'বাবা, তোমার কি হয়েছে?' তখন ছেলে বললো, 'মা আমি দেশভ্রমণে যাব। বুড়ি কলাপাতায় ভাত মুড়িয়ে দিয়ে ছেলেকে বিদায় দিলো। যেতে যেতে সে আরেক দেশে গিয়ে পৌঁছলো। সেখানে সে এক বুড়ির ঘরে আশ্রয় নিলো। সে বুড়িটিকে নানি বলে সম্বোধন করাতে বুড়িটি খুব খুশি হয়ে গেলো। ছেলেটির কথা শুনে বুড়ি বললো, তুমি কে? আমাকে নানি বলে ডাকলে? এতোদিন আমাকে কেউ নানি বলে ডাকেনি।' ছেলেটি বললো, 'আমি অনেক দূর থেকে এসেছি।' বুড়ি বললো, 'তুমি যতদিন থাকতে ইচ্ছে করো ততদিন আমার এখানে থাকতে পারবে।

একদিন বুড়ি ছেলেটিকে উঠানে শুকানো ধান পাহারার দায়িত্ব দিয়ে নদীতে পানীয় জল আনতে গেলো। ধান পাহারা দিতে গিয়ে ছেলেটি একসময় ঘুমিয়ে পড়লো। কিছুক্ষণ পর হঠাৎ তার ঘুম ভেঙে যায়। তখন সে দেখতে পেলো, শুকাতে দেওয়া ধানগুলি সাতজন সুন্দরী মেয়ে পা দিয়ে নেড়ে দিচ্ছে। এ দৃশ্য অবলোকন করতে পেরে সে নির্বাক দৃষ্টিতে দেখতে থাকলো। ঐ সাতজনের মধ্যে একজন সবচেয়ে সুন্দরী। তাকে তার খুব পছন্দ হলো। তাদের ভালো করে দেখার জন্য সে চুপচাপ শুয়ে থাকলো। এমন সময় বুড়ির আগমনের শব্দ পেয়ে সুন্দরী মেয়েরা সেখান থেকে পালিয়ে বুড়ির ঘরের পাশের কলাগাছগুলিতে এক এক করে সবাই ঢুকে গেলো। তার পছন্দ করা সুন্দরী মেয়েটি কোন কলাগাছে ঢুকলো তা সে মনে মনে চিহ্নিত করে রাখলো। আর মনে মনে ভাবলো, তার পছন্দ করা সুন্দরীকে অবশ্যই তাকে পেতে হবে। তারপর সে গোমড়ামুখে বসে থাকলো।

বুড়ি এসে দেখলো, ছেলেটি গোমড়ামুখে বসে আছে। ছেলেটির গোমড়ামুখ দেখে বুড়ি জিজ্ঞেস করলো, 'বাছা, তোমার কি হয়েছে? মন খারাপ নাকি?' ছেলেটি বললো, 'নানি, অনেক দিনতো তোমার সাথে কাটালাম। আমার মায়ের কথা খুব মনে পড়ছে। এখন আমার বাড়ি যাওয়া খুবই প্রয়োজন।' বুড়ি বললো, 'বেশতো, তুমি যখন যেতে চাইছো তাহলে যাবে। আর হ্যাঁ, যাওয়ার সময় আমার বাড়ির সামনের একটি কলাগাছ কেটে নিয়ে যেও। পথে অনেক পাহাড় পড়বে। প্রতিটি পাহাড় অতিক্রম করলে কলাগাছের একটি করে খোসা ছাড়াবে।' বুড়ির কথায় ছেলেটি খুব খুশি হলো। যাওয়ার সময় সবচাইতে বেশি সুন্দরী মেয়েটি যে কলাগাছটিতে ঢুকলো সেই কলাগাছটি সে কেটে নিয়ে গেলো।

ছেলেটি বাড়ির পথে খুশি মনে হাঁটতে লাগলো। যখন একটি পাহাড়ে পৌঁছলো তখন বুড়ির কথামতো একটি খোসা ছাড়ালো। এভাবে পাঁচ-ছয়টি পাহাড় পার হওয়ার পর কলাগাছের সব খোসাই যখন ছাড়ানো হলো ঠিক সে সময়েই কলাগাছ থেকে সেই মেয়েটি বের হয়ে আসলো। কিন্তু মুশকিল ব্যাপার হলো, মেয়েটি হাঁটতে পারে না। অনেক চেষ্টার পরও মেয়েটিকে কোনোভাবেই হাঁটাতে পারলো না ফলে মেয়েটিকে কোনোক্রমে বাড়িতে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হলো না। ঐ জায়গায় একটি পানির কুয়া ছিলো। কুয়ার পাশে একটি বিরাট বটবৃক্ষ। কোনো উপায় না দেখে মেয়েটিকে ওই বটবৃক্ষের একটি উঁচু ডালে রেখে ছেলেটি বাড়ি থেকে একটি ঘোড়া নিয়ে আসার জন্য রওনা দিলো। এদিকে এই কুয়ার পাশেই থাকতো এক মায়াবী রাক্ষসী। ঐ রাক্ষসী পানির কুয়ার কাছে আসতেই বটগাছের ডালে বসে থাকা সুন্দরীকে দেখতে পেলো। হিহি করে হেসে মেয়েটিকে সে বললো—'তুমি সুন্দর, নাকি আমি সুন্দর?' তারপর আবার বললো—'ও নাতনি, আমাকে এক খিলি পান দাও না।' উত্তরে মেয়েটি বললো—'আমার কাছেতো কোনো পান নেই।' রাক্ষসী বললো—'তাতে কি? তুমি বটগাছের পাতা আর বিচি ও গাছের আঠালো রসটা লাগিয়ে খিলি পান বানিয়ে আমাকে দাও।' মেয়েটি তার কথামতো পানের খিলি বানিয়ে নিচে ফেলে দিলো। কিন্তু রাক্ষসীটি মাটিতে পানের খিলি পড়ে গেলো বলে না খেয়ে ফেলে দিলো। এভাবে তিন তিনবার মাটিতে ফেলে দেওয়ার পর রাক্ষসটি বললো—'এবার হাতে হাতে আমাকে পানের খিলি দাও, তাহলে আর মাটিতে পড়বে না। যেই মাত্র মেয়েটি হাত বাড়িয়ে দিলো অমনি সুন্দরী মেয়েটিকে হাত টান দিয়ে মাটিতে নামিয়ে আনলো। এরপর মেয়েটিকে কুয়ার পানিতে ডুবিয়ে রেখে নিজে সুন্দরী মেয়েটির রূপ ধারণ করে বটগাছের ঠিক সেই ডালে বসে রইলো। আর কুয়ার মধ্যে যেখানে মেয়েটিকে পুঁতে রেখেছিলো ঠিক সেখানে একটি লাল পদ্মফুল ফুটলো।

এরই মধ্যে ছেলেটি একটি ঘোড়া নিয়ে সেই স্থানে ফিরে এলো। কিন্তু ঘোড়ার পিঠে মেয়েটিকে যতবার তুলতে চাইল ততবার ঘোড়াটি পিঠ সরিয়ে নিলো। ছেলেটি চিন্তা করলো, নিশ্চয় এর কোনো কারণ আছে। ছেলেটি চারিদিকে তাকাতেই কুয়ার মধ্যে একটি লাল পদ্মফুল দেখলো। সেটি তুলে নিয়ে সে ঘোড়ার উপর চড়লো। এবার ঘোড়া কোনো বাঁধা দিলো না। বাড়িতে এসে সে সেই লাল পদ্মফুলকে সযত্নে বাক্সে রেখে দিলো। আর রূপসী মায়াবী রাক্ষসীকে নিয়ে সংসার করতে লাগলো। কিছুদিন যেতে না

যেতেই মায়াবী রাক্ষসীর নানা ধরনের জ্বালা-যন্ত্রণায় সংসারের সুখ-শান্তি নষ্ট হয়ে গেলো। কোনো উপায় না দেখে ছেলেটি বাক্স থেকে পদ্মফুলটিকে বের করে বারবার দেখে আর দীর্ঘশ্বাস ফেলে। এভাবে দিন যায়, মাস যায়। একদিন ছেলেটি যখন পদ্মফুল দেখছিলো এমন সময় মায়াবী রাক্ষসী তা দেখে ফেলে। এক সময় স্বামীর অনুপস্থিতিকালে রাক্ষসী বাক্স থেকে পদ্মফুলটি বের করে ছিঁড়ে বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দেয়।

কিছুদিন পর যেখানে পদ্মফুল পড়েছিলো সেখানে একটি লাউয়ের চারা গজিয়ে উঠলো। বেড়ে উঠতে উঠতে একদিন লাউয়ের গাছটি ঘরের চাল ছেয়ে ফেললো। একদিন ঐ লাউয়ের গাছে একটি লাউ ধরলো। বুড়ির ছেলে যখন ঐদিকে হেঁটে যেতো তখন লাউটি উপরে উঠে যেতো আর যখন সুন্দরীরূপী রাক্ষসী ঐদিকে হেঁটে যেতো তখন ঐ লাউ তার কপালে টোকা দিতো। এভাবে লাউটি বারবার মাথায় লাগার ফলে বিরক্ত হয়ে রাক্ষসী লাউটি ছিঁড়ে এনে রান্না করলো। রান্না করা লাউ নিজে খাওয়ার পর স্বামীর জন্য কিছু রেখে দিলো। কিন্তু স্বামী না খেয়ে তা উঠানের মাটিতে ফেলে দিলো। যেখানে লাউয়ের তরকারি পড়লো সেখানে একটি সুপারি গাছ জন্মালো। একদিন সেই গাছে অনেক সুপারি ধরলো। এক সময় ফলগুলো পেকে মাটিতে ঝরে পড়লো।

সেই সুপারি গাছের কাছাকাছি জায়গায় আর এক বুড়োবুড়ি বাস করত। একদিন তারা ঐ পথ দিয়ে যাওয়ার সময় একটি সুপারি কুড়িয়ে পেয়ে সুপারিটিকে ঘরের কোণে এক ঝুড়িতে রেখে দিলো। পরেরদিন তারা যথারীতি কাজের জন্য বাইরে গেলো। দুপুরবেলা বাড়ি ফিরে রান্নার জন্য ঘরে ঢুকতেই বুড়োবুড়ি একেবারেই হতবাক। কে যেনো রান্না করে দিয়ে গেছে। এভাবে দু-তিনদিন যাবৎ এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটলো। বুড়ি বুড়াকে বললো, 'এর নিশ্চয়ই কোনো রহস্য আছে।' তারপর বুড়ো বুড়িকে বললো— 'চিন্তা করোনা, আজ তুমি কাজে যাবে। আমি ঘরে পাহারা দেবো।' যথারীতি বুড়ি কাজে চলে গেলো। এদিকে বুড়ি কাজে যাওয়ার পর বুড়ো মদের বোতল বের করে আরাম করে মদ খেতে খেতে একসময় মাতাল হয়ে বেঘোরে ঘুমাতে লাগলো। বুড়ি ফিরে দেখে, রান্না আগের মতোই করা আছে। আর বুড়ো ঘরের এককোণে মাতাল অবস্থায় শুয়ে আছে। বুড়ি বুড়োকে বললো—' তোমার দ্বারা কিছুই হবে না। কাল আমি পাহারা দেবো। দেখি, কে রান্না করে যায়।'

পরের দিন বুড়ি ঘরের এক কোণে লুকিয়ে থেকে পাহারা দিতে লাগলো। একসময় যে ঝুড়িতে সুপারি রাখা ছিল সেখান থেকে এক অপরূপ সুন্দরী মেয়ে বের হয়ে আসলো। তারপর রান্না ঘরে ঢুকে রান্না করার জন্য ব্যবস্থা করতেই বুড়ি চুপি চুপি গিয়ে পেছন থেকে তাকে জাপটে ধরলো। মেয়েটি নিজেকে ছাড়িয়ে নেওয়ার জন্য বহু চেষ্টা করলো কিন্তু পারলো না। অবশেষে হাল ছেড়ে দিয়ে বুড়োবুড়ির সাথে বাস করতে লাগলো। বুড়ি মেয়েটির তার রূপের জন্য কোনো বিপদ হতে পারে এই ভেবে মেয়েটির সারা গায়ে কালি মাখিয়ে দিলো। এভাবে দিন চলে যায়।

একদিন ঐ ছেলেটি তার ঘোড়া নিয়ে বের হলো। চলতে চলতে সেই বুড়োবুড়ির বাড়িতে পৌঁছলো। এদিকে বুড়ি ছেলেটিকে আসতে দেখে মেয়েটিকে লুকিয়ে থাকতে বললো। কিন্তু মেয়েটি লুকানোর আগেই ছেলেটি মেয়েটিকে দেখে ফেললো। তারপর

ছেলেটি সেখানে গিয়ে বললো—নানি, আমার খুব পিপাসা লেগেছে। আমাকে এক গ্লাস পানি দেবে?' বুড়ি এক গ্লাস পানি এনে ছেলেটির দিকে বাড়িয়ে দিলো। তখন ছেলেটি বললো— 'আমি এ পানি পান করবো না, তোমার ঘরে যে মেয়েটি আছে সে যদি এনে দেয় তবে পান করবো।' অতপর বুড়ি মেয়েটিকে পানি এনে দেয়ার জন্য বললো। ছেলেটি মেয়েটির হাত থেকে পানির গ্লাস নেয়ার সময় গ্লাস থেকে ফসকে কিছু পানি মেয়েটির হাতে পড়ে গেলো। এতে হাতে মাখানো কালির কিছু অংশ মুছে গিয়ে আসলরূপ বেরিয়ে পড়লো। এরপর ছেলেটি সব ঘটনা বুঝতে পারলো এবং মেয়েটিকে ঠিকই চিনতে পারলো। সে মেয়েটিকে একটানে ঘোড়ায় তুলে নিয়ে বাড়িতে ফিরে গেলো।

বাড়ি ফিরে মেয়েটি বাড়ির লোকজনের কাছে তার সেই অতীতের ঘটে যাওয়া জীবনের সব কাহিনিগুলো একে একে বর্ণনা করলো। এই কাহিনি শুনে সুন্দরীরূপী ডাইনি রেগে ফেটে পড়লো এবং তার আসলরূপে ফিরে গেলো। আর রাগে-ক্ষোভে চিৎকার করে বুক চাপড়াতে চাপড়াতে সে মারা গেলো। অতপর ছেলেটি কলাথুরকন্যাকে নিয়ে সুখে জীবন কাটাতে লাগলো।

খ. কিংবদন্তি

তৈন খালের কিংবদন্তি

তৈন খালটি বান্দরবান পার্বত্য জেলার আলীকদম উপজেলায় অবস্থিত। পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমা ও তঞ্চঙ্গ্যা আদিবাসীদের ইতিহাস সূত্রে আলীকদম একটি ঐতিহাসিক অঞ্চল। অতীতে আরাকানিদের দ্বারা দৈনাকরা (তঞ্চঙ্গ্যা) অত্যাচারিত হয়ে ১৪১৮ খ্রিষ্টাব্দে মৈসাং রাজপুত্র 'মারেক্যা' ও 'তৈন সুরেশ্বরী'র নেতৃত্বে আরাকান থেকে দুর্গম গিরিপথ অতিক্রম করে পার্বত্য বান্দরবানের আলীকদম অঞ্চলে পালিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করে। তারা তৈন খালের পার্শ্ববর্তীস্থানে একটি রাজ্য স্থাপন করেন। জ্যেষ্ঠভ্রাতা 'মারেক্যা' মৃত্যুবরণ করলে তার ছোটো ভাই 'তৈন সুরেশ্বরী' রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করেন। তৈন সুরেশ্বরীর নামানুসারে এই খালটির নামকরণ করা হয় তৈন খাল।

ম্রো কিংবদন্তি

ম্রো আদিবাসীদের লোককাহিনি যেমন সমৃদ্ধ তেমনি কিংবদন্তি কাহিনিও অত্যন্ত সমৃদ্ধ। এই কিংবদন্তি কাহিনি থেকে জানা যায় তাদের অতীত ইতিহাস। নিম্নে ম্রো আদিবাসীদের কয়েকটি কিংবদন্তি কাহিনি তুলে ধরা হলো :

ওয়ি তুম (রক্তের কুম)

এ রক্তের কুমটি থানছি বাজার ও তিন্দু বাজারের মধ্যবর্তীস্থানে সাঙ্গু নদীতে অবস্থিত। "ওয়ি" শব্দটি ম্রো ভাষায় রক্ত আর 'তুম' শব্দটির অর্থ কুম বা গভীরতল। সবসময় এ কুমের পানির গভীরতা ১৫-২০ হাত থাকে। অতীতে ম্রো আদিবাসীরা এ কুমে বছরে একবার করে পাঠা ছাগল বলি দিয়ে পূজা করতো। কুমের মধ্য দিয়ে ভেলা ভাসিয়ে যাওয়ার সাহস কারো থাকতো না। এ কুমের বিশেষত্ব হলো, পানির উপর কোনো

লতা-পাতা ভাসতে দেখা যায় না। আর কুমের তল কখনো ভরাট হয় বলে এর কোনো প্রমাণ নেই। ম্রোরা এ কুমে কখনো কোনো মাছ ধরে না।

কুমের পূর্বপাশে একটি পাথর আছে। পাথরের সামনের অংশ এবড়োথেবড়ো। সেখান থেকে মাঝে মধ্যে রক্তের পানি বেরিয়ে আসতে দেখা যায়। জনশ্রুতি আছে এ পাথর থেকে যখন রক্তবর্ণ পানি বেরিয়ে আসে তখন নাকি সাঙ্গু নদীতে কেউ না কেউ ডুবে মারা যাবে। এ বিশ্বাসে ম্রোরা এ কুমের নাম রাখে 'ওয়ি তুম' অর্থাৎ রক্তের কুম। এ কুমের তলদেশে হাতির মতো দেখতে একটা পাথর আছে বলে জানা যায়। একদিন জেলেরা এ কুমে মাছ ধরতে জাল ফেলার সময় জালটি আটকে যায়। অনেকক্ষণ টানাটানি করার পর কোনো উপায় না দেখে একজন জেলে পানির নীচে জালটি খুলতে গেলে হাতির মতো দেখতে একটি পাথর দেখতে পায়। জালটি ঐ পাথরের হাতির দাঁতের সাথে আটকে আছে। পাথরটি হুবহু হাতির মতো দাঁড়িয়ে আছে।

সংপাও ম্লা তুম (আফা কুম)

আফা কুমটি সাঙ্গু নদীর সংযুক্ত রেমাক্রী খালে অবস্থিত। এই কুমটি থানচি উপজেলার রেমাক্রী ইউনিয়নে অবস্থিত। এর গভীরতা আনুমানিক ১০-১৫ হাত। আফা এক প্রকার মাছ। এটি সাধারণত সাঙ্গু নদীতে বেশি দেখা যায়। টেংরা মাছের মতো দেখতে হলেও আকারে বড় এবং কাটাযুক্ত। এ মাছটি অত্যন্ত নিরীহ এবং লাজুক স্বভাবের। নিজেকে সর্বক্ষণ আড়ালে লুকিয়ে রাখে। ওই মাছটির গায়ে ডোরাকাটা দাগ আছে। কাটা থাকলেও তারা কাউকে আঘাত বা হত্যা করে না। তারা নদীর পানির গভীর তলে থাকে। নদীর গভীর তলে জমে থাকা শেওলা ও ছোটো ছোটো জলজপ্রাণী তাদের প্রিয় খাদ্য। নদীর তলে যখন চুপচাপ বসে থাকে তখন তারা মানুষের দৃষ্টি ফাঁকি দিয়ে পাথরের সাথে মিশে যায়। মাঝে মাঝে যখন নদীর কম জলে আসে তখন তারা মানুষের পাতা মরন ফাঁদে পড়ে মারা যায়। কম জলে এলে সে মাছকে যে কেউ হাতে ধরে ফেলতে পারে। 'আফা' শব্দটি মারামাদের শব্দ। ম্রো আদিবাসীরা এ মাছকে "সংপাও ম্লা দাম" বলে। "সংপাও" একজন ম্রো রূপসী মেয়ের নাম। 'ম্লা' অর্থ- রূপসী-যুবতী-তরুণী। 'দাম' অর্থ মাছ। আর আফা কুমকে 'সংপাও ম্লা তুম' অর্থাৎ সংপাও কুম বলে।

এই কুমকে নিয়ে যুগ যুগ ধরে ম্রোদের রয়েছে একটি কিংবদন্তি কাহিনি। কথিত আছে- সাঙ্গু নদীর পার্শ্ববর্তীস্থানে একটি ম্রো পাড়া ছিলো। পাড়ায় সংপাও নামে এক রূপসী ম্রো মেয়ে ছিলো। কিশোরী বয়সে সংপাও-এর মা মারা গেলে তার বাবা আরেকটি বিয়ে করে। তাতে সংপাও সৎ মায়ের চক্ষুশুল হয়ে যায়। সংপাও জুমে কাজ করতে গেলে তার সৎমা পঁচা ভাত পঁচা তরকারি কলা পাতায় মোচায় বেঁধে দিয়ে তাকে খেতে দিতো। ঘরে একসাথে খেতে বসলেও খাবারের উচ্ছিষ্টগুলো সংপাওকে খেতে দিতো। তারপরও সংপাও-এর রূপে মুগ্ধ হয়ে তাদের গ্রামের এক যুবক পাগলপ্রায় হয়ে গিয়েছিলো। যুবকটি সংপাওকে পাওয়ার স্বপ্নে সবসময় বিভোর থাকতো।

পাড়ায় একদিন গো-হত্যা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হলো। পাড়ার সব যুবতী মেয়েরা সাজগোজ করে সবাই নৃত্যের জন্য তৈরি হলো। এদিকে সংপাও-এর সৎমা সংপাও যাতে অনুষ্ঠানে যেতে না পারে সেজন্য বড়ো একটি পাতিলের ভেতর পাথর

রেখে ঐ পাথর সিদ্ধ করতে দিলো। আর কলাগাছকে লাকড়ি হিসেবে দিয়ে বললো— 'সংপাও, যতক্ষণ এ পাথর সিদ্ধ না হবে। ততক্ষণ তুমি কোথাও যেতে পারবে না। অপরদিকে গো-হত্যা নৃত্য শুরু হয়ে গেলো। নৃত্যানুষ্ঠানে সংপাওকে দেখতে না পেয়ে যুবকটি সংপাওকে নাচে অংশগ্রহণ করাতে ডাকতে গেলো সংপাও এর বাড়ি। তখন সংপাও যুবকটিকে বললো—'এখনো পাথর সিদ্ধ হয়নি। আমার মা আমাকে পাথর সিদ্ধ করতে দিয়েছে। পাথর সিদ্ধ হলেই আমি চলে আসবো।' আসলে কি পাথর কখনো নরমভাবে সিদ্ধ হয়? এটি তার সৎমায়ের কূটবুদ্ধি। যাতে সংপাও নাচতে যেতে না পারে। সে যাতে আনন্দ করতে না পারে সেটাই ছিল তার সৎমায়ের চাওয়া। এমনি করে সকাল হয়ে গেলো। এরপরও পাথর সিদ্ধ হয়নি। অবশেষে সংপাও সৎমায়ের ঐ কর্মকাণ্ডে রাগে ও অভিমানে ছেঁড়া কাপড়চোপড় পরে একটি গভীর কুমে গিয়ে লাফ দিয়ে আত্মহত্যা করলো। পানিতে পড়ার সাথে সাথে সংপাও মাছে রূপান্তরিত হয়ে যায়। ছেঁড়া কাপড় পরে ডুবে মরেছে বলে ঐ মাছের গায়ে ডোরাকাটা দাগ দেখা যায়। ম্রোরা মনে করে সংপাও মরে গিয়ে ঙাফা মাছে রূপান্তরিত হয়েছে। যার কারণে ঐ মাছ সংপাও-এর গোষ্ঠীর ম্রোরা খায় না। এরপর থেকে এই কুমের নাম ম্রো ভাষায় 'সংপাও ম্লা তুম' হয়েছে আর মারমারা 'ঙাফা কুম' বলে।

বউংডো (রাজাপাথর)

এই জায়গাটি থানছি উপজেলা সদর থেকে উজানদিকে ১০ কিলোমিটার দূরে সাঙ্গু নদীতে তিন্দু নামক স্থানে অবস্থিত। এখানে বড়ো বড়ো আকারের ৮-১০টি পাথর রয়েছে। সাঙ্গু নদীর উজানে যেতে হলে এ পাথরের ফাঁক দিয়ে নৌকা বা ইঞ্জিনচালিত নৌকা দিয়ে যেতে হয়। বর্ষাকালে সাঙ্গু নদীর পানি বেড়ে গেলে ঐপথ দিয়ে নৌকায় যাতায়াত করতে অত্যন্ত কষ্টকর। সেসময়ে নৌকা চলাচলের সময় পাথরের আঘাতে নৌকার ক্ষতি সাধিত হয় এবং জানমালেরও ক্ষতি হয়। আদিবাসীরা বছরের শুরুতে এবং বছর শেষে এ পাথরকে পূজার্চনা করে। জুমচাষ করার আগে পাঁঠাছাগল, কবুতর ও মোরগ বলি দিয়ে এ পাথরের পূজা করে। রোগমুক্তি কামনা ও ভালো ফসল পাওয়ার আশায় মূলত এ পূজার আয়োজন করা হয়ে থাকে। বছর শেষে আবার অনেকে রোগমুক্তি ও ভালো ফসল ঘরে তোলার সময় ঐ পাথরকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনস্বরূপ মোমবাতি ও আগরবাতি জ্বালিয়ে প্রার্থনার মাধ্যমে পূজা করে। অতীতে যাদের সন্তান হয়নি তারা সন্তান পাওয়ার আশায় মোমবাতি জ্বালিয়ে প্রার্থনা করে সন্তান লাভ করেছে এমন অনেক প্রমাণ পাওয়া গেছে। এভাবে এ পাথরকে পূজা-অর্চনা করে রোগমুক্তি, অর্থপ্রাপ্তি, ভালো ফসললাভ ও সন্তানলাভ করা যায় বলে এ পাথরকে রাজসম্মানে সম্মানিত করা হয় এবং এই পাথরের নাম রাখা হয় বউংডো বা রাজাপাথর।

বাঘের সাথে বন্ধুত্ব (পাংখোয়াদের কিংবদন্তি কাহিনি)

সুদূর অতীত থেকে বাঘের সাথে পাংখোয়াদের সম্পর্ক। বাঘকে ভয় করেনা এমন মানুষ খুবই কম আছে। বনে গিয়ে অনেক মানুষ বাঘের হিংস্র থাবায় প্রাণ হারিয়েছে এমন খবর অহরহ পাওয়া যায়। এমন হিংস্র পশু বাঘের সাথে কোনো জনগোষ্ঠীর পরম

বন্ধুত্ব থাকতে পারে তা অবিশ্বাস্য। পাংখোয়া সমাজে জগতের সব পশুপাখি শিকার করা সামাজিকভাবে স্বীকৃত হলেও বাঘ শিকার করা পাংখোয়াদের সমাজে সামাজিকভাবে অনুমতি নেই। এককথায় পাংখোয়া সমাজে বাঘ শিকার করা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। তারপরও যদি কোনো পাংখোয়া ভুলবশত বা অজান্তে বাঘ শিকার করে তাহলে সে সামাজিকভাবে হেয়প্রতিপন্ন হয়। পাংখোয়ারা বিশ্বাস করে তাদের পূর্বপুরুষেরা বাঘের সাথে পরম বন্ধু হয়ে পরস্পর ঘনিষ্ঠ থেকে ঘনিষ্ঠতর হয়ে উঠেছিলো। পাংখোয়ারা যে কোনো শিকার পেলে শিকার করা পশুর উৎকৃষ্ট অংশ বন্ধু বাঘের জন্য যেখানে বাঘেরা চলাফেরা করে সেখানে রেখে দিতো।

পাংখোয়াদের কাছে বাঘ হচ্ছে তাদের প্রধান দেবতা 'খোজিং'-এর বাড়ির পালিত কুকুরস্বরূপ। তারা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে খোজিং-এর আশীর্বাদ পেয়ে তাদের মধ্যে কিছু মানুষ যাদুমন্ত্রের প্রভাবে দৈবশক্তির অধিকারী হয়। পাংখোয়া ভাষায় তাদের বলা হয় 'কোয়াভাং' বা সিদ্ধিপুরুষ। তারা বিশ্বাস করে কোয়াভাং ইচ্ছে করলে বাঘের রূপ ধারণ করতে পারে। এসব মনে করে পাংখোয়ারা বাঘের মাংস খায় না। পাংখোয়াদের মধ্যে 'সাকং' গোত্রের কোনো ব্যক্তি মারা গেলে মৃত ব্যক্তির কবরের আশপাশে বাঘ আসে মৃতব্যক্তিকে শোক সমবেদনা জানাতে। ভালো করে লক্ষ্য করলে কবরের আশপাশে বাঘের পায়ের চিহ্ন দেখা যায় বলে তারা বিশ্বাস করে।

বাঘ নাকি প্রতিদিন ভোর বেলায় সূর্যোদয়ের সময় প্রার্থনা করতো-শিকারের সময় তার মানব বন্ধুদের সাথে যেনো দেখা হয় আর সারাদিন যেনো হিংসাত্মক মনের মানুষের সাথে মুখোমুখি না হয়। সে পাহাড়ে গেলে আমি যেনো নদী-ঝরনার ধারে থাকি। সে নদী-ঝরনা ধার দিয়ে গেলে আমি যেনো পাহাড়ের চূড়ায় থাকি। তারপরও যদি শিকারের মুহূর্তে হঠাৎ তাদের সাথে বাঘের দেখা হয়, তাহলে কোনো পাংখোয়া 'মারিয়াম-পা লামপুই হং কিয়ান র' অর্থাৎ সুপ্রিয় বন্ধু যাওয়ার জন্য আমাকে রাস্তা দাও, তুমি একটু সরে যাও' এ কথা বললে বাঘ সরে যায় আপন মনে। এই সত্য প্রমাণ আজও পাংখোয়াদের মাঝে আছে। এতে অবিশ্বাস করার কিছুই নেই। এরকম কথা বলে বাঘকে চলার রাস্তা থেকে সরিয়ে দিয়েছে, এমন লোক এখনো পাংখোয়া সমাজে আছে।

গ. লোকপুরাণ

বগালেক

বগালেক বাংলাদেশের সবচেয়ে সুন্দর ও মনোরম প্রাকৃতিক হ্রদ। এ হ্রদ দেশের অন্যান্য হ্রদ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এই হ্রদ বান্দরবান জেলার সদরদপ্তর হতে ৬৫ কিলোমিটার এবং রুমা উপজেলা সদর থেকে ১৫ কিলোমিটার দূরে কেউক্রাডং পর্বত শ্রেণিতে অবস্থিত এবং রুমা উপজেলার নাইতিং মৌজায় এর অবস্থান। নৃতত্ত্ববিদরা বাংলাদেশের বান্দরবানে অবস্থিত এই বগা হ্রদকে দুই হাজার বছর আগে সৃষ্ট প্রাকৃতিক হ্রদ বলে ধারণা করেন। Bangladesh District Gazetteers, Chittagong Hill Tracts-এ উল্লেখ আছে এই হ্রদটি সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে ১৮০০ ফুট উচ্চ এবং এর গভীরতা ১২৫ ফুটের কাছকাছি। তবে এ অঞ্চলের আদিবাসীরা মনে করেন, এ হ্রদের গভীরতা

এখনো পর্যন্ত কেউ সঠিকভাবে নির্ণয় করতে পারেনি। আনুমানিক ১৮৬০ সালে এক ইংরেজ দম্পতি এ হ্রদের গভীরতা মাপতে গিয়ে তারাও এর গভীরতার সঠিক তথ্য দিতে পারেনি বলে এলাকাবাসিরা জানান। এ হ্রদের রূপ অদ্ভূদভাবে বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন রকম পরিবর্তন হয়ে থাকে। এই হ্রদের বৈশিষ্ট্য হলো, বর্ষকালে এ হ্রদের পানি ঘোলাটে ও অপরিষ্কার হওয়ার কথা থাকলেও আশ্চর্যজনকভাবে তখন পরিষ্কার ও স্বচ্ছ থাকে। আবার গ্রীষ্মকালে বিশেষ করে বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে যখন বঙ্গপোসাগর উত্তাল থাকে তখন হ্রদের পানি ঘোলাটে হয়। সে সময় হ্রদের ঠিক মাঝখান থেকে পানি ঘোলা শুরু হয়। এরপর আস্তে অস্তে হ্রদের চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এ হ্রদের বুকে কোনো শেওলা বা আগাছা নেই। আর হ্রদের চারপাশে গাছগাছালি থাকলেও নীচে কোনো প্রকার শুকনো পাতা পড়ে না। হ্রদের জল সবসবময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে। এ হ্রদের ঠিক মাঝখানে পানির উৎস উৎপত্তিস্থল রয়েছে। এটি প্রায় প্রস্রবণের মতোই বুদবুদ করে। যার কারণে এ হ্রদে ঝরেপড়া পাতা বা আগাছা হ্রদের পাড়ের দিকে সরে যায়। দেখলে মনে হয় যেনো কেউ সকলের অলক্ষে এসে এসব পরিষ্কার করেছে। অনেকে ধারণা করছেন, এই হ্রদের নীচে, হ্রদ আর সমুদ্রের সাথে সুড়ঙ্গজাতীয় সংযোগ রয়েছে। তাই সাগর যখন উত্তাল থাকে তখন এই হ্রদের জল ঘোলাটে হয়।

বগালেকের পৌরাণিক কাহিনি

এ হ্রদকে নিয়ে এ অঞ্চলের আদিবাসীদের রয়েছে নানা ধরনের পৌরাণিক কাহিনি। কাহিনি কিছুটা ভিন্ন হলেও সারবস্তু এক এবং অভিন্ন। সব আদিবাসীর পৌরাণিক কাহিনিতে হ্রদটির সৃষ্টির কাহিনির মূলে রয়েছে ড্রাগন, অজগর অর্থাৎ সাপের কাহিনি। ম্রো আদিবাসীরা মনে করে হ্রদের সেই বগা গ্রামের নীচে ড্রাগনের সুড়ঙ্গ ছিলো। ড্রাগনকে যখন মেরে ফেলা হয়েছে তখন গ্রামটি সুড়ঙ্গের নিচে পানিতে নিমজ্জিত হয়ে যায়।

বগালেক

পরবর্তীকালে সেখানে একটি হ্রদের সৃষ্টি হয়। বম আদিবাসীরা মনে করে, সেই ড্রাগনটি একজন বম যুবক। যুবকটির সাথে ঠকবাজ রাজকন্যার বিবাহ হলে তাকে মেরে ফেলার জন্য ড্রাগনের মাংস খাওয়ার ইচ্ছা বায়না করে। তাতে যুবকটি ড্রাগনকে মেরে ড্রাগনের দাঁতগুলো ভাঙতে গিয়ে তার হাতের আঙ্গুল কেটে যায়। আঙ্গুল কেটে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ ও রক্তে ড্রাগনের বিষ মিশে বিষক্রিয়ায় যুবকটি মারা যায়। মৃত্যুর পর যুবকটি ড্রাগনে রূপান্তরিত হয়। এরপর সে ড্রাগন রূপ ধারণ করে রাজকন্যার ষড়যন্ত্রের প্রতিশোধ নিতে পাড়ার সমস্ত জনবসতি গুড়িয়ে হ্রদের অতল তলে তলিয়ে দেয়।

ম্রো পৌরাণিক কাহিনি

ম্রো আদিবাসীরা মনে করে কোনো এক সময় এ হ্রদের উপর বগা নামে একটি ম্রো গ্রাম ছিলো। 'তারচা' নামে ম্রোদের প্রভাবশালী গোত্রের লোকেরা এই বগা গ্রামে বাস করতো। তাদের সাথে অন্য ম্রো গোত্রের তেমন বনাবনি নেই। পাহাড়ের চূড়ায় গ্রাম তৈরি করে তারা স্বাধীনভাবে বসবাস করতে পছন্দ করতো। তাই বগা পাহাড়ের উঁচু চূড়ায় তারা গ্রাম তৈরি করে। ধনেধানে ভরপুর ছিল গ্রামবাসীরা। গ্রামের কোনো দুঃখ-কষ্ট ছিলো না। বছর শেষ হলেই মেতে উঠতো গো-হত্যার উৎসবে। তবে বেশ কয়েক বছর ধরে অস্বাভাবিকভাবে গ্রামের গৃহপালিত জীবজন্তু হারিয়ে যেতে লাগলো। যারফলে দিনদিন গ্রামবাসীর গৃহপালিত পশুপাখির সংখ্যা হ্রাস পেতে লাগলো। শরৎকাল আসলে জুমে পাকা ধান কাটতে গ্রামবসীরা সবাই ব্যস্ত। তারা তাদের হারিয়ে যাওয়া গৃহপালিত পশুপাখির দিকে কোনো খেয়ালই করলো না। এসময় গ্রামে লোকজন ফাঁকা থাকে। ছোটো ছোটো ছেলেমেয়ে আর কাজকর্মে অক্ষম বৃদ্ধ-বৃদ্ধা ছাড়া পাড়ায় কেউ নেই। কেউবা ধান আনার জন্য জুমে চলে গেছে। কেউ আবার ধানগুলো কাটার জন্য ঢালু জুমক্ষেতে পা দাপাতে দাপাতে খুব সতর্কতার সাথে নামছে। পা পিছলে পড়লে সোজা গিরিখাতে। সেখান থেকে লাশ হয়ে ফিরে আসা ছাড়া উপায় নেই। এভাবে গ্রামবাসী সবাই যার যার জুমে গেলো ফসল তুলতে। কয়েকদিন পরে তো পাড়ায় শুরু হবে নবান্ন উৎসব। তারপর আবার গো-হত্যা উৎসব। নেচে-গেয়েতো কয়েক মাস কাটাতে হবে। এসব ভেবেচিন্তে যত শীঘ্রই পারে জুমের ফসল ঘরে তোলা। গ্রামে এক ষোড়শী কিশোরীও রয়ে গেলো । সেও ঢালু জুমে ধান কাটতে গিয়ে পা মোচড় খেয়েছে। প্রচণ্ড যন্ত্রণায় অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাকে ঘরে বিশ্রাম নিতে হচ্ছে। বিশ্রাম করে কি লাভ এই ভেবে কিশোরী সময় কাটানোর জন্য কোমড়তাঁতে কাপড় বুনতে শুরু করলো।

শরতের সোনালি সকাল। কিশোরী মেয়েটি কোমড়তাঁতগুলো ঘরের বারান্দায় নিয়ে আসার সময় তার হাত থেকে ফসকে 'সংসত' (এক প্রকার তাঁতের সরঞ্জাম) নীচে মাটিতে পড়ে গেলো। সেখানে ৫-৬ বছর বয়সের একটি বালক আপন মনে খেলা করছিলো। কিশোরী তাকে নীচে পড়ে যাওয়া সংসত আনতে বললো। বালকটি নীচে সংসত আনতে গিয়ে আর ফিরে এলো না। ছেলেটি ফিরে আসতে না দেখে কিশোরী বালকটিকে ডাকাডাকি করলো। তারপরও ছেলেটির কোনো খোঁজ পাওয়া গেলো না। তন্ন তন্ন করে খুঁজেও কোথাও বালকটিকে পাওয়া গেলো না। এমনি করে দিন গড়িয়ে গেলো। সন্ধ্যায় গ্রামবাসীরা সবাই বাড়ি ফিরলো। ঘটনাটি জানাজানি হয়ে গেলে

গ্রামবাসীরা বালকটিকে খুঁজতে বেরিয়ে পড়লো। কিন্তু ছেলেটির কোথাও কোনো হদিস পাওয়া গেলো না। সবাই নিরাশ হয়ে ব্যর্থমনোরথে ফিরে এলো।

পরদিন সকালে পুনরায় বালকটিকে খোঁজা শুরু করলো। কোথাও না পেয়ে গ্রামের চারদিকের ঝোপজঙ্গল কেটে পরিষ্কার করতে লাগলো। এমন সময় গ্রামবাসিরা ঝোপের মধ্যে একটি বিরাটকায় গর্ত দেখতে পেলো। গর্তের চতুষ্পার্শ্বে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। মনে হয় যেনো গর্তের মুখ সর্বক্ষণ কেউ ঝাড়ু দিয়ে পরিষ্কার করে রেখেছে। সবাই মনে করলো গর্তটি 'দাকামাং' (ড্রাগন)-এর। গ্রামবাসীরা ধরে নিলো যে, দাকামংই আমাদের সব গৃহপালিত পশুপাখি খেয়ে ফেলেছে। বালকটি যে হারিয়ে গেছে তাকেও নিশ্চয়ই দাকামাংই খেয়েছে। এখন উপায় কি? সবার মনে একই প্রশ্ন উদয় হলো। সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নিলো দাকামাংকে বড়শি দিয়ে ধরবে। তাই একটি বিরাটকায় বড়শি বানিয়ে একটি মর্দ্দা শূকর গেঁথে দিয়ে ঐ দাকামাংকে ধরার জন্য গর্তের ভেতর ফেলে দেওয়া হলো।

সকালে গিয়ে গ্রামবাসীরা দেখলো, গর্তের মুখে বড়শি নেই, আছে শুধু বড়শি দড়িখানা। সবাই মিলে দড়িটি টানতে লাগলো। টানতে টানতে বেরিয়ে এলো বিরাটকায় এক দাকামাং (ড্রাগন)। দাকামাংটি এমন দীর্ঘাকৃতি যে, ঐটিকে টানতে টানতে গ্রামের চারদিকে ৭ কুণ্ডলী পাকিয়েও শেষ হয় না। গ্রামবসীরা আর কোনো উপায় না দেখে দাকামাং-এর গর্তের বাইরের অংশ কেটে ফেললো। সাতদিন সাতরাত ধরে গর্তের ভিতরে দাকামাংটির কাটার বাকি অংশ পড়ে যাওয়ার বিকট শব্দ শোনা গেলো। গ্রামবাসীরা সবাই মিলে দাকামাং-এর মাংস ভাগ করে খাওয়ার জন্য যার যার ঘরে নিয়ে গেলো। সেই গ্রামে বাস করতো এক বিধবা বুড়ি। কিন্তু গ্রামবাসীরা ঐ বুড়িকে ড্রাগনের মাংসের ভাগ দিলো না। বুড়ির ছিল যৌবনোদীপ্ত এক নাতি। বয়স বেশি হওয়ার কারণে বুড়িটি সামাজিক কাজকর্মে কোনো সহযোগিতা করতে পারে না বলে সবাই তাকে হেয় চোখে দেখে।

একদিন গ্রামে 'চিয়াসদ পই' (গো-হত্যা) উৎসব আয়োজন করা হলো। তখন মাঘী পূর্ণিমার রাত। সবুজ অরণ্য নীল জ্যোৎস্নায় প্লাবিত। তার সাথে পাল্লা দেয় অরণ্যের কীটপতঙ্গের বিভিন্ন ডাকের শব্দ। মাঝে মাঝে দূরবন থেকে ভেসে আসে বাঘ ও হায়েনার গর্জন। গ্রামবাসীরা গো-হত্যা উৎসবের নৃত্যে ডুবে থাকে। তারা আনন্দে আত্মহারা। যুবকরা মনের আনন্দে প্লুং (বাঁশি) বাজায় আর যুবতীরা হাত ধরাধরি করে হাঁটু ভেঙে ভেঙে প্লুং এর সুরে তাল মিলিয়ে নৃত্য পরিবেশন করে। খোপায় বুনো ফুল, অঙ্গে রৌপ্য অলংকারে নান্দনিক দ্যুতি আর তাদের সুরভিত মন। তাদের সাথে আবাল-বৃদ্ধ-বণিতারা নৃত্যে যোগ দেয়। নৃত্যের ফাঁকে ফাঁকে শিল্পীরা মাঝে মাঝে ই-হু-হু-উ শব্দ তুলে নৃত্যের তালে গতিসঞ্চার করতে থাকলো। অপমানিত হবে বলে বুড়িটি নাতিকে গো-হত্যার উৎসবে যোগ দিতে দিলো না।

রাত প্রায় শেষ। জ্যোৎস্নার আলো প্রায় ক্ষীণ হয়ে আসছে। সারারাত ধরে মদ্যপানের ফলে সবাই মাতাল আর পাগল প্রায়। এমন সময় ভয়ংকর এক বিকট শব্দ শোনা গেলো। মুহূর্তের মধ্যে কেউ ধারণা করতে পারলো না যে গ্রামটি মাটির নীচে দিকে ধাবিত হচ্ছে। শুধু একে অপরের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলে— কি হয়েছে? আশে পাশের পাহাড়গুলো যেনো উচ্চ থেকে আরও উচ্চতর মনে হচ্ছে। মাটি নীচে

ধাবিত হলে পাহাড়গুলোকে এমনিতেই উপরে দেখা যাবে। মাটি নীচের দিকে ধাবিত হতে হতেই মুহূর্তের মধ্যে গ্রামটি পানির নীচে ডুবে গেলো। পরদিন সকালে বুড়ি ঘুম থেকে উঠে দেখলো, বগা গ্রামের কোনো চিহ্ন নেই সেখানে। শুধু বিরাট একটি হ্রদ দেখা গেলো। আর গ্রামের কেউ বেঁচেও নেই। বুড়িই একমাত্র বগালেকের নিরব সাক্ষী। এখনো বগালেকে গেলে দেখা যাবে লেকের পশ্চিম প্রান্তে সেই বুড়ির বাস্তুভিটা। লেকের ভেতর বেশ কিছু অংশে দ্বীপের মতো ভূমি দেখা যায়।

বম পৌরাণিক কাহিনি

বম আদিবাসীদের মতে, বর্তমানে পাহাড়ের উপর যেখানে বগাহ্রদ দাঁড়িয়ে আছে, আগে সেখানে কোনো হ্রদ ছিলো না। সেখানে ছিল শুধু অরণ্য। একদিন পাঁচ ভাই মিলে জঙ্গলে শিকার করতে গিয়েছিলো। অনেকক্ষণ ধরে বনবাদারে ঘুরেও কোনো পশুপাখি শিকার পেলো না। এমন সময় দেখতে পেলো এক হিংস্র নাগিনী ফণা তুলে তাদের দিকে ছুটে আসছে। নাগিনীর সাথে যুদ্ধ করে তারা নাগিনীকে মেরে ফেললো। পাঁচ ভাইয়ের সবার ছোটো ভাই আমতনকে নাগিনীর মাংস রান্নার ভার দিয়ে বড়ো ভাইরা অন্য কাজে চলে গেলো। নাগিনীর মাংস কেটেকুটে ছোটো ভাই তা রান্না করতে লাগলো। বেশ কিছুক্ষণ রান্না করার পর ঐ মাংস যখন সিদ্ধ হওয়ার উপক্রম তখন দূর থেকে ফোঁস ফোঁস শব্দ করতে করতে একটি বিরাট নাগ মুখে কি একটি শিকড় নিয়ে উনুনের দিকে ছুটে আসলো। নাগের ফোঁস-ফোঁসানির বাতাসে চারদিকে ঘূর্ণিবায়ু বইতে শুরু করলো। এ অবস্থা দেখে ভয়ে আমতনের প্রাণ যায় যায় অবস্থা। নাগটা তার রান্না করার পাতিলটা উনুন থেকে মাটিতে নামিয়ে মুখের শিকড়টা নাগিনীর রান্না করা মাংস পিণ্ডের উপর ছোঁয়াতেই নাগিনীর মাংশের টুকরোগুলো জোড়া লেগে নাগিনী আগের রূপ ফিরে পেলো। এরপর নাগিনীর প্রাণহীন দেহের মুখে আশ্চর্যজনক শিকড়টা ছোঁয়াতেই নাগিনী জীবিত হয়ে গেলো। এরপর নাগ-নাগিনী একে অপরের দিকে ফণা তুলে ফোঁস-ফোঁসানি ও নাচানাচি করতে করতে পুনরায় ঘূর্ণিঝড় বইয়ে দিলো। তারপর তারা সেখান থেকে চলে গেলো। আমতন ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে ঘটে যাওয়া সব দৃশ্য অবলোকন করলো। আমতন নাগের ফেলে যাওয়া সে আশ্চর্য শিকড় নিয়ে নিজের জামার পকেটে ভরে রাখলো।

কিছুক্ষণ পর বড়ো ভাইরা পেটে ক্ষিধে নিয়ে ক্লান্তদেহে ফিরে এসে ছোটো ভাইকে রান্না-বান্না না করে বসে থাকতে দেখে জিজ্ঞেস করলো, 'সাপের মাংস কোথায় লুকিয়ে রেখেছো?' রান্না করা সাপের মাংস দেখতে না পেয়ে তারা ছোটো ভাইটিকে মারধর করলো। আমতন তখন সেই অদ্ভুত ঘটনার কথা তাদেরকে সব খুলে বললো। কিন্তু তার কথায় কেউ কর্ণপাত করলো না। এভাবে রাগের মাথায় ছোটো ভাইকে দুই টুকরো করে কেটে ফেলে রেখে তারা বাড়ি ফিরে গেলো। আমতন মৃত অবস্থায় সেখানে পড়ে রইলো। কিছুক্ষণ পর দক্ষিণা বাতাসে তার পকেটে থাকা সেই আশ্চর্য শিকড় থেকে চারদিকে শিকড়ের গন্ধ ছড়িয়ে পড়লো। সেই শিকড়ের গন্ধে তার কাটা শরীর জোড়া লেগে গেলো। ঐ আশ্চর্যজনক শিকড়ের বায়ু নাকে প্রবেশ করতেই আমতন জীবিত হয়ে উঠলো। সে জীবিত হয়ে ঐ আশ্চর্য শিকড়গুলো যত্নসহকারে জামার পকেটে নিয়ে

রাখলো। সে বাড়িতে ফিরে গেলে তার বড়ো ভাইরা তাকে মেরে ফেলবে এ ভয়ে সে আর বাড়িতে না ফিরে অন্যদিকে যাত্রা শুরু করলো। যেতে যেতে পথে একটি কালো কুকুরের মৃতদেহ দেখতে পেলো। মৃত কুকুরটির শরীরের উপর শিকড়টা বুলাতে কুকুরটি জীবিত হয়ে উঠলো কিন্তু নিষ্প্রাণ। তারপর আশ্চর্যজনক শিকড়টা নাকের কাছে দিতেই কুকুরটি জীবিত হয়ে উঠলো। হাঁটতে হাঁটতে আবার লাল রঙের একটি কুকুরের মৃতদেহ দেখতে পেলো। পুনরায় একই কায়দায় লাল রঙের কুকুরটিকেও জীবিত করে তুললো। আমতন দুটি কুকুরকে সাথে নিয়ে পথ চলতে থাকলো। এভাবে যেতে যেতে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো। ক্লান্তিতে আমতনের পা আর চলে না। এমন সময় দূর থেকে ভেসে আসলো ঢোলের আওয়াজ ও কান্নার আওয়াজ। তারা সেদিকে দ্রুতগতিতে পা বাড়ালো। সেখানে গিয়ে দেখে এক মহাকাণ্ড। আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সকলেই কান্নাকাটি করছে। আমতন সেখানে গিয়ে জানতে পারলো যে, রাজার একমাত্র ছেলে মারা গেছে। আমতন রাজাকে বললো—'মহারাজ, আপনি অনুমতি দিলে আমি আপনার ছেলেকে জীবিত করে তুলতে পারি'। রাজা ভীষণ খুশি ও অবাক হয়ে বললেন, 'তুমি যদি আমার পুত্রকে জীবিত করতে পারো, তাহলে তুমি যা চাও, আমি তাই দেবো'। তারপর মৃত রাজার ছেলেকে নির্জন একটি কক্ষে নিয়ে গিয়ে নাগের সেই শিকড় দিয়ে রাজপুত্রকে জীবিত করে তুললো। রাজা খুশি হয়ে আমতনের সাথে তার একমাত্র কন্যাকে বিয়ে দিতে চাইলেন। এদিকে রাজকন্যার ছিল এক প্রেমিক। তাই রাজকন্যা আমতনকে বিয়ে করতে রাজি হলো না। রাজকন্যা আমতন কে বিয়ে না করলে রাজা রাজকন্যাকে কেটে ফেলবে বলে হুমকি দিলেন। এতে বাধ্য হয়ে রাজকন্যা আমতনকে বিয়ে করতে রাজি হলো ঠিকই তবে আমতনকে স্বামী হিসেবে মনেপ্রাণে মেনে নিতে পারলো না।

বিয়ের পর থেকে রাজকন্যা আর আমতনের সংসারে অশান্তি শুরু হয়ে গেলো। রাজকন্যা একদিনও একসাথে আমতনের সাথে থাকতে চাইলো না। তাই গুপ্তঘাতকের মাধ্যমে রাজকন্যা আমতনকে দু'বার কেটে ফেলেছিলো। কিন্তু নাগের সেই আশ্চর্যজনক শিকড়ের গুণে আমতন বারবার বেঁচে ওঠে। সবশেষে রাজকন্যা আমতনকে মেরে ফেলার ফন্দি করে তাদের রাজ্যের একটি পাহাড়ের সুড়ঙ্গে বাস করা বিরাট একটি নাগকে মেরে মাংস আনতে বললো। আমতন কয়েকজন সঙ্গীকে নিয়ে রাজ্যের সমস্ত পুরানো দাগুলো গলিয়ে বিরাট একটা বড়শি তৈরি করে তার সাথে বিরাট একটি শূকর গেঁথে দিয়ে সুড়ঙ্গের মুখে বড়শিটি ফেললো। এক সময় নাগটা শূকরসহ বড়শিটি গিলে খেলো। তারপর শুরু হলো সাপে মানুষে টানাটানি। মানুষেরা টানতে টানতে নাগের অর্ধেক অংশ গর্ত থেকে বের করে আনলো। তারপর অনেক টানাটানি করেও নাগটাকে সম্পূর্ণ বের করে আনতে না পেরে গর্তের বাইরের নাগের শরীরের অংশটুকু কেটে ফেললো। নাগের যে অংশটুকু পাওয়া গেলো তা কেটেকুটে বাড়িতে নেওয়ার জন্য সবাই প্রস্তুত হলো। এদিকে আমতন নাগের ধারালো দাঁতগুলো ভাঙতে গিয়ে তার বাম হাতের কনিষ্ঠ আঙুল নাগের দাঁতে কেটে যায়। তাতে অনেক রক্তক্ষরণ হলো। আমতন স্ত্রীর জন্য একঝুড়ি নাগের মাংস পাঠিয়ে তার খোঁজখবর নেওয়ার জন্য খবর পাঠালো। স্ত্রী সেই খবর শুনে তার কাছে যাওয়াতো দূরের কথা বরঞ্চ অত্যন্ত খুশি হলো। মনে মনে ভাবলো—এতদিনে তার মনের সাধ পূরণ হতে যাচ্ছে।

এদিকে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলে সবাই যার যার বাড়ি চলে গেলো। শুধু আমতনের সাথে রয়ে গেলো বুড়োবুড়ি দু'জন। তারা নাগের মাংস খেতে রাজি হলো না। সেখানে আমতনকে দেখাশোনা করার মতো কেউই ছিলো না বলেই তারা সেখানে রয়ে গেছে। এদিকে ক্রমে ক্রমে রাত হয়ে এলেও তার স্ত্রীর কোনো দেখা মিললো না। আমতন তখন বুঝতে পারলো স্ত্রী ইচ্ছে করে তাকে মেরে ফেলার জন্য নাগের মুখে পাঠিয়েছে। এতে হতাশ ও নিরাশ হয়ে সে স্ত্রীর প্রতি অত্যন্ত রাগান্বিত হলো। তারপর আমতন বুড়োবুড়ি দু'জনকে বললো—'আপনারা এ রাজ্য ছেড়ে অন্যত্র কোথাও চলে যান। মৃত্যুর পর আমি নাগের রূপ ধারণ করে গোটা গ্রামটা ধ্বংস করে দেবো।' একথাগুলো বুড়োবুড়ি বাড়িতে ফিরে গ্রামের সবাইকে বললো। কিন্তু তাদের কথা কেউ বিশ্বাস করলো না। কিছুক্ষণ পর আমতন মারা গেলো এবং মৃত্যুর পর একটা বিরাট নাগে রূপান্তরিত হয়ে গেলো। ড্রাগনরূপী সেই বিরাট নাগ আকাশ সমান উঁচু হয়ে বিশাল ফণা তুলে পর্বতের মতো দেহ নিয়ে প্রচণ্ড বেগে সেই সুড়ঙ্গমুখ থেকে জনবসতির দিকে এগিয়ে গেলো। তার বিশাল দেহের চাপে সমস্ত বন, পাহাড়-পর্বতগুলো গুড়িয়ে গেলো। এতে সমস্ত লোকালয় ও জনবসতি ভূপৃষ্ঠের অতল তলে তলিয়ে গেলো এবং ভূপৃষ্ঠের নীচ থেকে প্রচণ্ড বেগে জল উত্থিত হয়ে বিশাল একটি হ্রদের সৃষ্টি হলো। সমস্ত কিছু ধ্বংস করে দিয়ে নাগরাজ দুঃখে, ক্ষোভে ও ভারাক্রান্ত হৃদয়ে হ্রদের জলে ডুব দিলো।

পাংখোয়াদের পৌরাণিক কাহিনি

পাংখোয়া আদিবাসীদের মতে, অনেকদিন আগে যেখানে এখন বগালেকের কালোজল টলমল করছে সেখানে একটি পাংখোয়া গ্রাম ছিলো। গ্রামবাসীরা অতি সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে বসবাস করতো। তাদের প্রত্যেকেরই গরু-ছাগল, হাঁস-মুরগি এমনকি বহু গয়ালও ছিলো। এমনি সময়ে শুরু হয় তাদের গ্রামে একটি অদৃশ্য প্রাণীর উৎপাত। প্রতিদিন তাদের অলক্ষ্যে তাদের গরু-ছাগল, হাঁস-মুরগি এমনকি তাদের প্রিয় ছেলে-মেয়েরাও হারিয়ে যাচ্ছে। এমন অবস্থায় গ্রামের সর্দার ম্রোইলং সবাইকে ডেকে অবস্থা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার জন্য গ্রামের চারপাশে ঝোপঝাড় পরিষ্কার করালো। শেষপর্যন্ত গ্রামের কিছুদূরে একটা কালো পাথরের নীচে আশ্চর্যজনকভাবে একটি সুড়ঙ্গ পাওয়া গেলো। সুড়ঙ্গের ভেতর কোনো একটি প্রাণী আছে সন্দেহ হওয়ায় তারা সেই প্রাণীটিকে ধরার জন্য পরিকল্পনা করলো। তারা সেই প্রাণীকে ধরার জন্য একটি বিরাট বড়শি বানিয়ে বড়শিতে একটি শুকরছানা গেঁথে গর্তে ফেলে দিলো। পরদিন দেখা গেলো কোনো একটা প্রাণী শুকরছানা শুদ্ধ বড়শিটা গিলে গর্তে ঢুকে গেলো। সবাই মিলে রশি টানতে লাগলো। টানতে টানতে দেখা গেলো একটি বিরাট সাপ (ড্রাগন)। সাপটিকে অর্ধেক টানার পর তারা আর টানতে না পেরে সাপটির অর্ধেক অংশ কেটে ফেললো। যেটুকু কাটা হলো সেটুকুর মাংস সবাই ভাগাভাগি করে নিয়ে গেলো। তারা ঐ সাপের মাংস রান্না করে মহানন্দে আহার করলো। রিয়ানলাল নামের এক দম্পতি সাপের মাংসের ভাগ নিলো না এবং রান্না করেও খেলো না। কারণ যে পাথরের নীচে সাপটা গর্ত করেছে রিয়ানলাল সেই পাথরটাকে খুবই শ্রদ্ধা করে। রিয়ানলাল যখন যুবক ছিল

একদিন বন থেকে শিকার করে বাড়ি ফেরার পথে সর্দারকন্যা লিয়ানাকে বাঘ তাড়া করতে দেখে ফেলে। সর্দারের কন্যা লিয়ানা দৌড়তে দৌড়তে সেই কালো পাথরের উপর ওঠার চেষ্টা করে, কিন্তু উঠতে পারছিলো না। এ অবস্থা দেখে রিয়ানলাল দ্রুত সর্দ্যারের কন্যাকে পাথরের উপর উঠিয়ে বাঘটাকে বর্শাবিদ্ধ করে মেরে ফেলে। কিন্তু যে পাথরটিতে তারা উঠেছিলো সেই পাথরটিকে কোনো যুবক-যুবতী স্পর্শ করলে যে ক্ষতি হয় তা তাদের অজানা ছিলো। রিয়ানলাল যার জন্যে বাঘের সাথে যুদ্ধ করেছিলো ততক্ষণে তার অনেক ক্ষতি হয়ে গেলো। বাঘটা মারা যাওয়ার পর সর্দারকন্যা লিয়ানা যখন পাথর থেকে নীচে নামতে গেলো তখন তার দুটি পা অবশ হয়ে গেলো। এরপর রিয়ানলাল চিন্তা করলো সর্দারের কন্যাকে কিভাবে সুস্থ করা যায়?

একদিন রাতে রিয়ানলাল স্বপ্নে দেখলো, একটা সাপ তাকে বলছে, 'পবিত্র জল দিয়ে ঐ কালো পাথরটা ধুয়ে পবিত্র নাগেশ্বর ফুল দিয়ে পূজা করলে লিয়ানা শাপমুক্ত হবে এবং তার রোগও সেরে যাবে।' সাপের স্বপ্নাদেশ অনুযায়ী রিয়ানলাল পাথরটিকে পূজা করলো। এরপর আশ্চর্যজনকভাবে লিয়ানা আরোগ্য লাভ করলো। অতীতের এসব ঘটনার কারণে রিয়ানলাল কালো পাথর আর কালো পাথরের নীচে থাকা সাপটাকে খুব শ্রদ্ধা করে. তাই সে সাপের মাংস না খাওয়ার জন্য সবাইকে বারণ করেছিলো। কিন্তু কেউ তার কথায় কর্ণপাত করেনি। বরঞ্চ সবাই মহানন্দে সাপের মাংস খেতে লাগলো। সেই রাতেও রিয়ানলালকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে সাপটা তাকে গ্রাম ছেড়ে অন্যত্র চলে যেতে বলেছে। তার স্বপ্নের কথা রিয়ানলাল পুনরায় সবাইকে জানালো। বিশ্বাসতো দূরের কথা, উপরন্তু সবাই তাকে ঠাট্টা বিদ্রুপ করতে লাগলো। এরপর নিরাশ হয়ে রিয়ানলাল তার স্ত্রীকে নিয়ে অন্যত্র চলে গেলো। যেতে যেতে তারা যখন উঁচু পাহাড়ের চূড়ায় উঠলো তখন সমস্ত গ্রাম জুড়ে শুরু হলো প্রচণ্ড কম্পন। দেখতে দেখতে গ্রামটা থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে মুহূর্তের মধ্যে জলের নীচে তলিয়ে গেলো। সেই প্রলয়ঙ্কর মুহূর্তে ঐ কালো পাথরের নীচে থেকে একটা প্রচণ্ড আগুনের লেলিহান শিখা বের হয়ে গ্রামবাসীকে গ্রাস করলো। এরপর গ্রামটি চিরদিনের মতো নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলো। তারপর সেখানে সৃষ্টি হলো একটি মনোরম হ্রদ। যা বর্তমানে বগালেক নামে পরিচিত।

আলী পাহাড়

আলীকদম উপজেলা সদর দপ্তর থেকে ২-৩ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বদিকে আলী পাহাড় অবস্থিত। এই পাহাড়ে তিনটি সুড়ঙ্গ রয়েছে। এই সুড়ঙ্গগুলো নিয়ে যুগ যুগ ধরে এতদাঞ্চলের মানুষের কাছে নানা ধরনের কিংবদন্তি প্রচলিত রয়েছে। অনেকদিন আগে মাতামুহুরী নদীর তীরবর্তীস্থানে আলী পাহাড়ে একদল কাঠুরিয়া কাঠ কাটতে যায়। তারা সেখানে একটি ঝুপড়ি বানিয়ে বিশ্রাম নিচ্ছিলো। এমন সময় একজন অদ্ভুত লোক তাদের সামনে উপস্থিত হলো। লোকটিকে দেখে ভয়ে কাঠুরিয়ারা তাড়িয়ে দিতে চাইলো। তখন লোকটি বিনয়ের সাথে বললো— 'তোমরা আমাকে মেরো না। আমি কোনো ভূতপ্রেত, জ্বিনপরী নই। কোনো পাগল বা বনদস্যুও নই। আমিও তোমাদের মতো একজন কাঠুরিয়া ছিলাম। আমাকে সাহায্য করো, আমাকে আশ্রয় দাও।' এরপর

তারা লোকটিকে আশ্রয় দিলো। তখন লোকটি বললো— 'আমরাও তোমাদের মতো এ পাহাড়ে কাঠ ও বাঁশ সংগ্রহ করতে এসেছিলাম। একদিন গভীর বনে বাঁশ-কাঠ সংগ্রহের সময় আমি অন্যদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ি। এমন সময় আদিমরূপী এক রূপসী মেয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরে। তার পরনে ছিল শুধুমাত্র গাছের পাতা। শত চেষ্টা করেও আমি তার কবল হতে মুক্ত হতে পারিনি। এমনকি শব্দ করার মতো আমার একবিন্দুও শক্তি ছিলো না। আমার সঙ্গীরা আমাকে অনেক খোঁজাখুঁজি করে আমাকে না পেয়ে ফিরে চলে যায়। তারা মনে করেছিলো আমাকে কোনো হিংস্র জন্তু খেয়ে ফেলেছে। আমার সঙ্গীরা আমাকে খোঁজার সময় আমি তাদেরকে দেখতে পাচ্ছিলাম কিন্তু আওয়াজ করার মতো কোনো শক্তি আমার ছিলো না। আদিমরূপী রূপসী মেয়েটি আমাকে নিয়ে সেই একটি সুড়ঙ্গে ঢুকে পড়লো।

পাহাড়ের সুড়ঙ্গ রয়েছে পর পর তিনটি। আমাকে তৃতীয় সুড়ঙ্গটিতে নিয়ে গেলো আদিমরূপী রূপসী মেয়েটি। তখন থেকে আমি সেই নিস্তব্ধ অন্ধকার গুহায় বন্দি হয়ে গেলাম। মাঝে মাঝে এই রূপসী মেয়েটি শ্যামবর্ণের বিশালদেহী মহিলার রূপ নিতো। তখন তার অবয়ব হতো অত্যন্ত অদ্ভুত। তখন তার পরনে থাকতো পশুর চামড়া। চুলের খোপায় ও কানে নানা ধরনের পাখির পালক পরতো অলংকার হিসেবে। উপর ও নিচের মোটা মোটা ঠোঁটের ফাকে উজ্জ্বল দাঁতের সারি দেখা যেতো। পশুপাখি, বিভিন্ন সরীসৃপ প্রাণী শিকার করে কাঁচা মাংস খাওয়া ছিল তার প্রিয় খাবার। কোনো উপায় না দেখে আমিও সেসব খাবার খেতে বাধ্য হতাম। মহিলাটি আমাকে সুড়ঙ্গে রেখে প্রতিদিন গভীর বনে শিকারে বেরিয়ে যেতো। সে যখন শিকারে যেতো তখন সে গুহার মুখটি একটি বড়ো পাথরে চাপা দিয়ে রাখতো যাতে তার অনুপস্থিতকালে আমি সুড়ঙ্গ থেকে বেরিয়ে যেতে না পারি।

দিন যায়, মাস যায়, বছর যায় এমনি করে অনেক বছর পার হয়ে যায়। মনের অজান্তে আমাদের দু'জনের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান হয়ে আমাদের দু'জনের মাঝে ভাব জমে যায়। এক পর্যায়ে আমাদের দু'জনের গোপন অভিসারের ফলে মহিলাটির গর্ভে সন্তান আসে। তখন মহিলাটি মনে করেছিলো আমি তার প্রতি অনুরক্ত হয়েছি। আমাকে বিশ্বাস করে একদিন মহিলাটি শিকারে যাওয়ার সময় গুহার মুখে পাথর চাপা দিয়ে যায়নি। অনেকক্ষণ লক্ষ্য করে দেখলাম বাহির থেকে সূর্যের রশ্মি গুহার ছিদ্রপথ ভেদ করে গুহার ভিতরে প্রবেশ করছে। ঐ মহিলাটির অনুপস্থিতির এই সুবর্ণ-সুযোগটি গ্রহণ করে আমি গুহা থেকে বেরিয়ে আসি। আবার অনুভব করি পৃথিবীর আলো-বাতাস। উপলব্ধি করি প্রকৃতির কোলাহল। তাদের এই আলাপরত অবস্থায় হঠাৎ সেই আদিমরূপী রূপসী মহিলা তার শিশুকে বুকে জড়িয়ে ধরে ওদের সামনে উপস্থিত হলো। কাঠুরিয়ারা অনেকে ভয়ে দিক-বেদিক পালাতে লাগলো। অনেকে হতভম্ব হয়ে নিশ্চুপ বসে বসে এ দৃশ্য দেখলো। তখন আদিমরূপী রূপসী মহিলাটি তার কাছ থেকে পালিয়ে আসা লোকটির দিকে অগ্নিমূর্তি ধারণ করে তার দিকে তাকিয়ে চিৎকার করতে লাগলো এবং কান্নাকাটি করলো অনেকক্ষণ। তার বিকট বিকৃত কান্নার আওয়াজ আকাশে বাতাসে ধ্বনিত হলো। এক পর্যায়ে কি যেনো বলতে বলতে তার আচরণে হিংস্রতা প্রকাশ পেলো। শিশুটির দিকে দেখে দেখে কি যেনো বলতে বলতে শিশুটির

দু'পা ধরে এমনভাবে টানলো তাতে শিশুটি দ্বি-খণ্ডিত হয়ে গেলো। এক খণ্ড তার কাছ থেকে পালিয়ে আসা লোকটির হাতে দিলো আর অপর খণ্ড নিজের মুখে দিয়ে চিবুতে চিবুতে গভীর বনে অদৃশ্য হয়ে গেলো। যে লোকটি আদিমরূপী রূপসী মহিলাকে বিয়ে করেছিলো তার নাম আলী। সেই আলীর নাম অনুসারে সেই পাহাড়ের নাম আলীপাহাড় এবং সুড়ঙ্গের নাম আলীসুড়ঙ্গ।

ঘ. লোকছড়া

লোকছড়া

লোকসংস্কৃতির সবচেয়ে জনপ্রিয় উপাদান হচ্ছে ছড়া। যা সহজ-সরল ভাষায় স্বতঃস্ফূর্ত কাব্যিক ছন্দে সৃষ্টি হয়। সাধারণত বেশিরভাগ ছড়া হয় শিশু মনের উপযোগী। এখানে ভাবের গভীরতা নেই, চিন্তার জটিলতা নেই, বাঁধাধরা নিয়ম নেই, তবে একটি আকর্ষণীয় শক্তি আছে। ফলে আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সকলে ছড়া পাঠে আনন্দ পায়. মুখে মুখে প্রচলিত এই ছড়াগুলো সময়ের পরিবর্তনে পরিবর্তিত হয়ে অনেক ক্ষেত্রে যুগকেও প্রতিনিধিত্ব করে। বান্দরবান পার্বত্য জেলার আদিবাসীদের লোকছড়া অত্যন্ত বৈচিত্র্যপূর্ণ। তাদের লোকছড়া বেশিরভাগই অরণ্য, প্রকৃতি, গাছপালা, জীবজন্তু, কীটপতঙ্গ, চাঁদ-তারা, চন্দ্র-সূর্য ইত্যাদি নিয়ে রচিত। তবে এ লোকছড়াগুলোর কোনো সুনির্দিষ্ট রচয়িতা নেই। আদিকাল থেকেই লোকমুখে এই লোকছড়াগুলো বংশ পরম্পরায় চলে এসেছে। কিছু কিছু আদিবাসী লোকছড়া আছে যা সরাসরি বাংলায় অনুবাদ করা যায় না। যেগুলো অনুবাদ করার চেষ্টা করা হয়েছে সেগুলোও বাংলায় হুবহু অনুবাদ সম্ভব নয় বলে ভাবানুবাদ করা হয়েছে। কিছু কিছু আদিবাসী শব্দ আছে বাংলা ভাষায় সেশব্দের সঠিক অর্থ নেই অর্থাৎ বাঙালিরা সেসব শব্দ ব্যবহার করে না বা বাঙালি সমাজে এসব বস্তুও নেই। আবার এমনকিছু ছড়া আছে যা ছেলে-মেয়েদের ঘুম পাড়ানি গান হিসেবে প্রচলিত। কিছু ছড়া আছে যে ছড়াগুলোতে আদিবাসীদের সমাজজীবনে তাদের সৌর্যবীর্যের বীরত্ব গাঁথা প্রকাশ পেয়েছে। আবার কিছু কিছু লোকছড়া আছে যাতে যুদ্ধ পরাজয়ের করুণকাহিনি বিধৃত। তাছাড়া কৌতুক ব্যঞ্জক ছড়াও আদিবাসী সমাজে প্রচলিত আছে। অপরদিকে চট্টগ্রামের লোকছড়াগুলোতে তাদের জীবনের ইতিহাস-ঐতিহ্য, অর্থনীতি, রাজনীতি, লোকাচার-সংস্কার-কুসংস্কার, বর্ণ-প্রথা, রীতিনীতি, আচার-আচরণ, উৎসব-বিনোদন, ধর্ম-সংস্কৃতি ইত্যাদি নানাদিক প্রকাশ পায়। নিম্নে বান্দরবান পার্বত্য জেলায় বসবাসরত বিভিন্ন আদিবাসীদের এবং চট্টগ্রামের কিছু লোকছড়া তুলে ধরা হলো :

চাক লোকছড়া

১. মংছাং (চাঁদ)

ও মংছাং

বাই পাই মালা বাইং
ইংগা দুছা ইক্কা রিয়াই নাইং।
শৈরাফুওয়াং তাকহেক্কা
ঙাওয়ে বাইলিংঙাং লাকাই আইং,
বাই আদু ছাইং মাকতা
ইক্কানে মালা বাইং।
শৈউক্কাফাংঙাং আঠাইগোক
বাই আদু ছাইং মাকতা
ইক্কানে মালা বাইং।

অনুবাদ

ও চাঁদ
এসো তাড়াতাড়ি
আমার খুকুমণি ঘুমুচ্ছে।
সোনার রশি দিয়া
নিয়ে এসো রূপোর দোলনা,
এসো আমার খুকুমণির সাথে
দোলনায় দোলে ঘুমাতে।
এসো সোনার সিঁড়ি দিয়ে
রূপোর র‍্যালিং ধরে
চাঁদ এসো খুকুর সাথে
দোলনায় ঘুমুতে।

২. আদিছা (খুকুমণি)

ও আদিছা, আদিছা, আদিছা,
নাংগা-নো, নাংগা-বা মালাংহেয়া?
থুন-মুন বাইনগা লাংহে,
থুন-মুন মায়া?
থুন-মুনইন আঁথুহে
আঁগো মায়া?
আঁঙান উ-ছাহে
উ-গো মায়া?
উ-ঙান মালিং হাইন কাইনগো লাকালাংনাই।

অনুবাদ

ও খুকুমণি, খুকুমণি, খুকুমণি
তোমার মা-বাবা কোথায় গেছে?
বনে গেছে ঢেঁকি আনতে,
ঢেঁকি কোথায় গেছে?
ঢেঁকিতে ধান ভানে।
ধান কোথায়?
মুরগি ধান খাচ্ছে।
মুরগি কোথায়?
বনবিড়ালে ধরে নিয়ে গেছে।

৩. **বাগ্‌ফি (প্রজাপতি)**

বাগফি, বাগফি নাংগো-নো, নাংগা বা, মা লাং হেকয়া?
ঠুং-মুং বাইংগা লাংহেক।
ঠুং গো মায়া? আংঠুহেক
আংগো মায়া? উ-ছাহেক
উ-গো মায়া? হাইং কাইং হেক।
হাইং গো মায়া? ফুং ফাং হুংঙা ছাংলাংনাইং
ফুং ফাং গো মায়া? বাইংতিক্ নাক্ নাইং।
বাইং গো মায়া? উই-গো নাংক্ নাইং।
উই গো মায়া? নিবাইংঙা সেলাংলাইং।

অনুবাদ

প্রজাপতি, প্রজাপতি, তোর বাবা-মা গেল কই?
ঢেক্ ঢেঁকি গাছ কাটতে গেছে।
ঢেক্ ঢেঁকি কই? ধানভানে।
ধানের চাল কই? মুরগিতে খেয়েছে।
মোরগ-মুরগি কই? বিড়াল খেয়ে ফেলেছে।
বিড়াল গেল কই? গাছের গর্তে ঢুকে গেছে।
গাছের গর্ত কই? আগুনে পুড়ে গেছে।
আগুন গেল কই? আগুনে পানি ঢেলে দিয়েছে।
পানি গেল কই? নির্বাণে উঠে গিয়েছে।

৪. **আদু, আদুছা**

উয়ে, উয়ে, উয়ে

আদ–আদুছা মাংদু ইয়াকআইহে, উ-উ-উয়ে আদু–আদুছা
নাঙ্গা উহ্ আছতাহ্মা আহেয়া
নিঙ্মা
নিঙ্মাহগা মারা চু চাংনেহ্
আনাঙজিহ্ আছাইন্‌ছা আছাইন্‌ছা য়ুগ ইয়াংনেহ্
নাঙ্ আমরাহ্না আমরাহ্না য়ুগ ইয়াংনেহ্
নাঙ্গা আছাহ্লুকা হাইঙযি ইয়াংনেহ্
হাইঙ্গা আছাহ্লুকা মুস্‌কা উননাআংনেহ্
উয়ে, উয়ে, উয়ে
আদু–আদুছা নাঙ্ আতেহ্ আউকাইয়া পংগেলে আইয়া পংগেলে
দুলু–লু লু লু
আইয়া পাংকালাংনাহ্।

অনুবাদ

খোকা ও খোকন সোনা
দুলছে, দুলছে, দুলছে
খোকা ও খোকন সোনা, ঝড় বাতাস আসছে মনে হয়
হু হু— দুলছে খোকা ও খোকন সোনা
দুলছে, দুলছে, দুলছে
খোকা ও খোকন সোনা
তোমার মুরগি কয়টি রয়েছে?
দুটি
দুটি থেকে একটি খেয়ে নিও
মেহমানদেরকে ভালো মাংসগুলি বেছে দিও
তুমি হাড়ের মাংস দেখে দেখে খেও
যেটা তুমি খেতে পারবে না সেটা বিড়ালকে খেতে দিও
বিড়াল খেতে না পারলে
বাইরের আবর্জনায় ফেলে দিও
তুমি এখন কার কাছে যাবে
দাদার কাছে পড়বে নাকি দাদির দিকে
দুলু– লু লু লু
দাদির কাছে পড়ে গেল।

পাংখোয়া লোকছড়া

১. নাউ-ওয়াই লা

ইন্ দুয়াই দুয়াই-দুয়াই দুয়াই র,

পা-বুয়াং, নু-বুয়াং ইন দুয়াই দুয়াই র
না ইন দু লৌ ইন চুন;
না-মিত খুয়াই নাল রা-বেগ পে-নে কাতি।
মিংথাং সাই-লু থুলুন-তু তিং ঙেই।

অনুবাদ

ঘুম পাড়ানি ছড়া

ঘুম যাও ঘুম যাও লক্ষ্মী বাবা ঘুম যাও,
যদি না ঘুমাও চোখে মোম লাগিয়ে দিব
ঘুম যাও ঘুম যাও লক্ষ্মী বাবা ঘুম যাও,
বাবা তুমি বড়ো হয়ে হাতির মাথা নিয়ে এসো
সকলে তোমাকে চিনবে, চারিদিকে সুনাম ছড়িয়ে পড়বে।

২. মুরগির বাচ্চা ঘুম পাড়ানি ছড়া

পাংখোয়া শিশুরা খেলাধুলা করার সময় আনন্দ চিত্তে মুরগির বাচ্চা ধরে গায়ে হাত বুলিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দেয়। তখন তারা এ ছড়াটি বলে থাকে।

আর তে এই মু-মুদ
না-চু চাং চেল এক থাই কাল কাল
না-পা-সা-খি মে ফুর কাল কাল
ইন চুং আন রামো আম্
ইনথ খুয়াই আন সা ঙার আম্
নাং চিত, কেই চিত, আ-ই-ই।

অনুবাদ

ঘুমাও ঘুমাও মুরগির বাচ্চা
তোমার মা কেঁচো খুঁড়তে গেছে
তোমার বাবা হরিণের মাংস আনতে গেছে
তোমার ঘরের উপর চিল, নীচে বনবিড়াল
তোমার ভয়, আমার ভয় আ-ই-ই।

৩. পি-চেম পেক্ থিয়াম

পি-চেম্ পেক্ পেক্ তি,
ই তি না-তি?
থাল সুই না-তি,
থাল তে তি?

নাউ ইন চয় তি?
নাউ তে তি, পি-ইন পক্ তি?
পি-তে তি আর সাং ভেন তি?
আর তে তি, মু ইন লাক তি?
মু তে তি, থি-অ্যাঁ সুক তি।
থিং তে তি, লি লাই জাম্ তি?
লি তে তি, সিয়াল ইন ডব তি?
সিয়াল তে তি, কেই ইন এই তি?
কেই তে তি, চাং ইন কা-তি।
চাং তে তি, মেই ইন কা-তি?
মেই তে তি, ভান-নু ভান- পা চিম্ রে রোই।

অনুবাদ : কৌতুক ব্যঞ্জক ছড়া

দাদি আমাকে দা দাও,
দা কেন?
শেল বানাতে, শেল কোথায়?
বাচ্চার হাতে, বাচ্চা কোথায়?
দাদির পিঠে, দাদি কি করে?
ধান পাহারা দিচ্ছে, মুরগি কোথায়?
চিলে নিয়ে গেছে, চিল কোথায়?
গাছের ডালে, গাছ কোথায়?
কুয়োতে পড়েছে, কুয়ো কোথায়?
গয়াল খেয়েছে, গয়াল কোথায়?
বাঘে খেয়েছে, বাঘ কোথায়?
ফাঁদে পড়েছে, ফাঁদ কোথায়?
আগুনে পুড়েছে, আগুন কোথায়?
আকাশের মাঝখানে, আকাশ কোথায়?
আকাশ মাথার উপরে।

৪. চোয়ান তোয়ার

আঁইতে নি বৌপুই আহেং দন
ছনপেই লৌতে ইনপেই বৌ।
বুচিতে আন ঙোয় জৌতাআ

বুলেমতে আন হিপরাল দল।
হ্লান সাথে আওথম নাসাজিয়া
কৃনিদামতো ইহায় এসতি।

অনুবাদ

শোন উৎসব দিন আসছে
যারা প্রস্তুত হওনি প্রস্তুত হও।
খারাপ বীজ দুর্বল হয়ে যাচ্ছে
খারাপ বীজ ধ্বংস হয়ে যাবে।
যারা রক্ত দিয়ে কিনেছে, চিৎকার করো
ত্রানকর্তা তাদেরকে ভুলে যাবে না।

ম্রো লোকছড়া

১. ঙকলাই

কিতং চেন চেন
রবখার মাক মাক
তামতু ওয়াং পলা
কিনা প্রোন।

অনুবাদ

গোবর পোকা চিমটি কাটে
লাল কাঁকড়া কামড়ায়,
'তামতু' তাতে নিয়ে এলো
মলের দুর্গন্ধ।

২. ঙকলাই

আওয়া ওয়াং মাঙ বত বত
আপা-আ ওয়াং মাঙ বত বত
ম্রো কুরেং কুরাই চাওয়া
ওয়াং কোয়াক কিম খুং
কিম বেত খাই খাই।

অনুবাদ

ও মা শীঘ্রই ফিরে এসো
ও বাবা শীঘ্রই ফিরে এসো
ধনী লোকের ছেলেরা
মোদের চালে ঢিল মারে।

খিয়াং লোকছড়া

১. উঁলুই

উঁলুই ও উঁলুউ ও
ইয়া নে বেং সেন স-ওম
সেনাইহ্ খিয়াং আঁলা কেসেন স্ হিয়াহ্
লুং পেক পে চলা একেপ নকা
লুং পেক পে চ-ও লুং পেক পে চ-ও
ইয়া নেকেপ নক সওম
কেপ ন-আইহ্ খিয়াং আঁলা কেপ্ নক স্ হিয়াহ্
থিং বাক্ ও থিং বাক্ ও
ইয়া ন-খ্রক নক সওম
খ্র ন-আই খিয়াং আঁলা ক-খ্রক নক স্ হিয়াহ্
ওং লা ইহ্লিনা
য়োং ও য়োং ও
ইয়া নি -হ্লি সওম
হ্লিনাইহ্ খিয়াং আঁলা কিহ্লিন স্ হিয়াহ্
উই ও উই ও
ইয়া ন-নক সওম
নকাইহ্ খিয়াং ঙালা কনক স হিয়াহ্
মুহ্ নুলা মহ্ পলা সুহ্ খ্রং তে : কা দ :
মহ নুলা মহ প : ও
ইয়া সুহ্ নেতেক সওম
তে : কাই্ খিয়াং ঙালা কেতেক স হিয়াহ্
লোউআ হিল থেইহ্ পানচি থেইহ্ খোল
তেউ পেচে লা ইনি এ য়া দ : ।

অনুবাদ

ও টাকি

ও টাকি ও টাকি
গাল কেন লাল?
আমার ইচ্ছেতে হয়নি লাল
পাথরে দিয়েছে চেপে।
ও পাথর ও পাথর

কেন দিলে চেপে?
আমার ইচ্ছেতে হয়নি চাপা
গাছের ডাল পড়ে।
ও ডাল ও ডাল
কেন পড়লে গায়ে?
আমার ইচ্ছেতে পড়িনি আমি
বানর দিল নেড়ে।
ও বানর ও বানর
কেন গাছের ডাল নাড়লে?
আমার ইচ্ছেতে নাড়িনি ডাল
কুকুর ঘেউ ঘেউ করলো বলে।
ও কুকুর ও কুকুর
কেন ঘেউ ঘেউ করলে?
আমার ইচ্ছেতে করিনি ঘেউ ঘেউ
গৃহকর্তা-কর্ত্রী লেলিয়ে দিয়েছে বলে।
ও গৃহকর্তা ও গৃহকর্ত্রী
কেন লেলিয়ে দিলে?
আমাদের ইচ্ছেতে লেলিয়ে দিইনি
জুমের ফসল ফলাদি
খেয়ে নষ্ট করেছে বন্যপ্রাণী তাই।

২. ঘুম পাড়ানি ছড়া

কেই নও লেকচ- ও ও ও ওলা
কেই নও পয়েইটি ও ইপ্না এ লা
পুয়েই সেচে চ-আ ইপনা এ নায়ো নাং লা
পুলুম লুম চরয়া ন-ওয়ো ইপ না এলা।
অস বোকতি নওয়ো ইপ না এ লা-
উলুপ পয়েই নাতি নওয়ো ইপনাবোই লা
দিক দিক চ নওয়ো ইপনা এই লা
নু লোয়ালহি চি-চ ওনাইবোই নওয়ো-ওলা
নু লা অই খো লোয়ালহি নেএ আলাই নওয়ো-ও ও লা।

অনুবাদ

আমার ছোটো ভাইরে ও ও ওলা
আমার ছোটো সুন্দর ভাইরে ঘুমাওরে- লা

সুন্দর করে তুমি ঘুমাওরে ভাই-লা
গোল গোল হয়ে তুমি ঘুমাও ভাই-লা
সুন্দর মুখখানি ছোট্ট ভাইরে ঘুমাও না-লা
চুপ হয়ে তুমি শোও নারে ভাই-লা
মা আসলে দুধু খাবেরে ভাই তুমি ঘুমাও না
মার আনা কাঁকড়ার পা তুমি খাবেরে ভাই
তুমি ঘুমাও না ও-ও-ও-লা।

৩. প্রচলিত ছড়া

খলওয়ো
নুনুচে?
সুমদুকা।
সুমচে?
খালাসোও।
খাচে?
আলোয়াক।
আ চে?
মুহ্‌লা ফাই।
মুহ্ চে?
অ্যাথিঙ্যেং দ্যেম।
এ্যাথিং চে?
মুইলা খ্রেঃ
মুই চে?
কোংকই।
কোং চে?
অয়চ্যেঃ
অয় চে?
সাংগানস্যেঃ
সাংগান চে?
মংসাংলা ওয়াত।
মংসাং চে?
খেয়াছ্যিআ চেত।
খেয় চে?

ফলায়াতং।
ফলা চে?
হ্নিংবাংঙ্যেং ওয়ং দ্যেক।

বাংলা অনুবাদ

তেলাপোকা
তোমার মা কোথায়?
ঢেঁকির ভেতরে।
ঢেঁকি কোথায়?
ঢেঁকিতো উঁইপোকারা খাচ্ছে।
উঁইপোকা কোথায়?
মুরগি খাচ্ছে।
মুরগি কোথায়?
চিলে নিয়ে গেছে।
চিল কোথায়?
বটগাছের উপরের ডালে
বটগাছ কোথায়?
হাতি ভেঙেছে।
হাতি কোথায়?
পাহাড়ে উঠেছে।
পাহাড় কোথায়?
পাহাড়ে হলুদ লাগাচ্ছে।
হলুদ কোথায়?
চীবর রঙ করছে।
চীবর কোথায়?
শ্রমন পড়েছে।
শ্রমন কোথায়?
ফুল ছিঁড়ছে।
ফুল কোথায়?
বুদ্ধকে পূজা করছে।
বুদ্ধ কোথায়?
নির্বাণে গেছে।

লুসাই লোকছড়া

Kanu kapa
Lo Haw Thuai Rawh
Tlangah Ruahpcci A Sure,

Lengi A Tape
Ka Mumang Mang
Chu Ni Sela
Ka Zuk Auna Ruai Ruai
Tur Che.

অনুবাদ

ও মা ও বাবা
তাড়াতাড়ি ঘরে এসো
পাহাড়ের মধ্যে বড় বৃষ্টি পড়ছে
ছোটো বোন লেঙভি কাঁদছে।
আর রোলেঙরোও কাঁদছে
সেও তোমায় খুঁজছে।
এ যদি হতো স্বপ্ন আমার
আমি তাদের ডেকে দিতাম
গলা উঁচিয়ে।

চাকমা লোকছড়া

১. কবাজাং কবাজাং
মোনো উগুড়ে বাহ্ যাং।
চাক ন'খাং ঘিলুক খাং
ইক্কুয়া বদালই ঘরত যাং।
কাবাজাং কাবাজাং
মামু ঘরত বেরেদ যাং
ম'মামি দিব' কুরো কাবি
চিত ঘিলেলোই খাং।

অনুবাদ

কাজাবাং কাজাবাং
পাহাড়ের উপর রাত কাটাবো।
চাক খাবো না ঘিলু খাব
একটি ডিম নিয়ে বাড়ি যাব।
কাজাবাং কাজাবাং

মামার বাড়ি বেড়াতে যাব।
মামি দেবে মোরগ কেটে
কলিজা দিয়ে খাব।

২. ঝিগুককুক ঝিগুককুক
বরব' বাত্তে শুনোনি?
ভেরোন গাজর থুবনি
এ গাজ' বাগল উ-গাজত যায়
বুড়ো মিলার দূত্ ছিনি যায়
উ-উ-উ-উ-উ-উ-উ-উ।

অনুবাদ
ঝিগুককুক ঝিগুককুক
ঘূর্ণিঝড় বইছে শুনছ কী?
ভেরোন গাছেরা একত্রিত হচ্ছে
এগাছের বাকল ঐ গাছে যাচ্ছে
বৃদ্ধ মহিলার স্তন ছিঁড়ে যাচ্ছে
উ-উ-উ-উ-উ-উ-উ-উ।

তঞ্চঙ্গ্যা লোকছড়া

জুম ঘরত চাইর কাইত্
চালাহ চনাহ ফুলর বাইচ্।
ভঙরায় গত্তন গুন্ গুন্ গুন্
চুহ্তন্ রেনু ফলত্তুন।
রু রুর রুর বাঁশি তালে তালে
খেংখ্রং বা-দন তার তালে।
পুনং চানান আকাশ্যতজুম নাই আচ্যা
লাঙ্যা আ লাঙনি চুড়ত্ত।

অনুবাদ
জুম ঘরের চারপাশে
মৌ মৌ করছে ফুলের সুবাসে।
ভ্রমরের দল গুঞ্জন তুলছে
ফুলের রেণু নিচ্ছে চুষে।

রু রু রু বাঁশির সুরে সুরে
খেংখ্রং বাজাচ্ছে একই সুরে।
পূর্ণিমা চাঁদ ঐ গগনে
প্রেমিক প্রেমিকার ঘুম নেই নয়নে।

ত্রিপুরা লোকছড়া

১. নখানি তাল

অং তাল তাল
চিনি লগ ফাই।
নিনিবানা অ্ওয়ান্ তন্খা
ফায়ই নুং চাফাই।
আর "রন" খালুই কুমুন
কক্ কিয়া কুমুন্ তালই
চাফাইদি তার নখা ফাইনি।
চিবি নগ" ফায়ই।

অনুবাদ

আকাশের চাঁদ

ওরে চাঁদ ওরে চাঁদ
মোদের ঘরে আয়
তোমার তরে রাখছি পিঠা
এসে তুমি খাও।
আরও দেবো পাকা কলা
পাকা পেঁপে কেটে
এসে খেয়ো আকাশ থেকে
মোদের ঘরে এসে।

২. থাংলুই ফাং

থাংলুই ফাং থাংলুই ফাং
নুং বারি মাচাং।
চালা বোরোই কাইনি খাই
নন"বল" সাকাং।
নিনি বাথাই চানি গাম্
মাচাং খালুই ফাং।

বাথাই ওয়াই সা থাই কালাই
তমই থুয়ই থাং।

অনুবাদ

কলাগাছ

কলাগাছ কলাগাছ
তুমি ভারি সুন্দর।
বিয়ের দিনে তুলে
লাগাই প্রথমে।
তোর ফল খেতে ভালো
সুন্দর কলাগাছ।
একা কেন মরে যায়
কেন মরে যায়।

বম লোকছড়া

সু লৌ কার তলুং দাহ্ লৌ
পা লৌ কার তলুং দাহ্ লৌ
ত্লাংরিপাতে ইন্ মোয়ান আঃ
রেয়াজা খালা
মেল দুম খালা
বাবু ডিন, বাবু ডিন।

অনুবাদ

জুম থেকে মা ফিরে নাই
জুম থেকে বাবা ফিরে নাই
ত্লাংরিপার বাড়ি পাহাড়ে
রেয়াজা খালা
মেল দুম খালা
বাবু বিশ্রাম করে।
বাবু বিশ্রাম করে।

খুমী লোকছড়া

১. এউকু তুই প্য কাংবো
শি কএ্ওও নায় নায়।
ম্যাচেউং তুই প্য কাংবো,
শি ক্লি ও নায় নায়।

তোভো তুই প্য কাংবো,
শি কিঞ্ওও নায় নায়।

অনুবাদ

এউকুর পানি শুকিয়ে গেছে
আয় আয় বৃষ্টি দাদা, ঝেপে ঝেপে পড়।
ছড়ার পানি শুকিয়ে গেছে,
আয় আয় বৃষ্টি দাদা, ঝেপে ঝেপে পড়।
নদীর পানি শুকিয়ে গেছে,
আয় আয় বৃষ্টি দাদা, ঝেপে ঝেপে পড়।

২. আ ল্ মা মো?
তামা ম্ কে ইউং বো
তামা ল্ মা মো?
থিংক্রেও ম্ তিউইং বো।
থিৱংক্রেও মা মো?
মাই ম্ কাং উইং বো।
মাই ল্ মা মো?
কাসাই আম সেং ম্ ল্ হাইউং বো।
কাসাই আম সেং ল্ মা মো?
তুই ম্ ল্ হাই উইং বো।

অনুবাদ

মুরগি কোথায় গিয়েছে?
বনবিড়ালে খেয়েছে।
বনবিড়াল কোথায় গিয়েছে?
মরা গাছটি চাপা দিয়েছে।
মরা গাছটি কোথায়-রে?
আগুনে জ্বলে পুড়েছে।
আগুন কোথায় গিয়েছে?
হাতি শুঁড়ের পানিতে নিভেছে।
হাতির শুঁড়টি কোথায়-রে?
জলে ভেসে নিয়েছে।

চাঁটগাইয়া লোকছড়া

১. রৈদ-রে রৈদ আনি
চাঁদার মারে পুতানী।
চাঁদা কাড়ি

হাত ঘর বাডি।
সুইজ্জ উভের কন্‌নান্দি
কদম গাছের তলাদি।
কদম গাছের নাই ফুল
চির্‌চিরাইয়া রৈদ তোল।

২. ঘুম যারে দুধের বাছা ঘুম যারে তুই,
ঘুমুত্থুন উভিলে বাছা দুধ দিয়াম মুই।
ঘুম যারে দুধের বাছা ঘুম যারে তুই,
ঘুম যাইলে গড়াই দিয়ুম সোনার বাজু মুই।
ঘুম যারে কৈতর বাছা ঘুম যারে তুই,
ঘুমুত্থুন উভিলে বাছা দানা দিয়াম মুই।

৩. মাইরে মাই ফুতা কাট,
কাইল বেইন্যা গজর হাট।
গজর হাটত যাইতাম চাই,
চরকা বাঁধাত দিতাম চাই।
চরকা নিয়ে চোরে
গজর হাটর কোরে।
মভ আইয়ে ঘামাইয়া
ছাতি ধৈর্যে নামাইয়া।
ছাতির উঁয়র কুসুম ফুল,
নাভট্টা নাচের নাদামপুর।
নাদাম পুইয্যা যুগী ভাই
হুক্কা দেয় থঁভ খাই।
লাঠি দেয় দরবারত যাই।

৪. ইক্কিনি বাচা গুনগুনি ঠেং
কে-নে বাচা রেঙ্গুন গেল
আ-তর বাঁশি ফেলাই গেল
মা-বইনরে কাঁদাই গেল।

৫. দুধারে দুধা কিরে ভাই দুধা
দুধ ক্যান ন দস
বাঘর ডরে

বাঘে কিরে মারে ধরে
বাঘের নাম কি আঁচিলা
ফাঁডা জালত বাজিলা
ফাঁডা জালতঅ ফাঁডি গেল
আঁচিলাত বাজি গেল।

৬. বব্‌বুর জামাই আইস্যেরে
আইলর উঁয়র বইস্যেরে।
কি কি আইন্যে চ গৈ,
এক পাতিলা জিলাপি
তার জিলাপি তারে দে
আরো কদ্দুর বাড়াই দেয়।

বস্তুগত লোকসংস্কৃতি

লোকশিল্প

সামাজিক রীতিনীতি ও ঐতিহ্যিক ধারায় এক গুরুত্বপূর্ণ ও অবিচ্ছেদ্য অংশ লোকশিল্প। আমাদের আদি সমাজ ও বর্তমান সমাজের সাধারণ শ্রমজীবী মানুষের শিল্পকলাই লোকশিল্প হিসেবে চিহ্নিত। লোকশিল্পীদের লোকশিল্পের মধ্যেই প্রতিফলিত হয় মানুষের প্রতিচ্ছবি। এসব শিল্পে একইসাথে লোকশিল্পীদের মনন ও সৌন্দর্য প্রকাশ পায়। ওই শিল্পগুলো তৈরি করতে শিল্পীকে সাহায্য করে তার পরিবেশ, পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং জীবন ঘনিষ্ঠতা। বিভিন্ন মেলা-উৎসবকে কেন্দ্র করে পাওয়া যায় লোকশিল্পীদের মননশীলতার প্রকৃতি ও ব্যাপ্তির পরিচয়। মেলা আর উৎসবকে ঘিরে আবহমানকাল থেকে বিভিন্ন অঞ্চলে বিকাশ লাভ করেছে বিশেষ বিশেষ লোকশিল্প। এছাড়াও মেলা উৎসবকে কেন্দ্র করেই এক এলাকা থেকে অন্য এলাকার লোকশিল্পীদের মধ্যে শুরু হয় উৎপাদন ও শিল্প সৌন্দর্য নিয়ে প্রতিযোগিতা। এভাবেই ক্রমে ক্রমে উৎকর্ষ লাভ করেছে লোকশিল্প সম্ভার। বান্দরবান অঞ্চলের লোকশিল্পের মধ্যে বাঁশ, কাঠ ও বেত শিল্পই উল্লেখযোগ্য।

বাঁশ, কাঠ ও বেতশিল্প

বাঁশ পার্বত্য চট্টগ্রামে আদিবাসীদের জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। ঘর-বাড়ি নির্মাণ থেকে শুরু করে খাদ্যের চাহিদা পূরণ করে বাঁশ। বাঁশ কুরল (কঁচি বাঁশ) আদিবাসীদের খাবারের তালিকায় শীর্ষে আছে। ধান শুকানোর জন্য আদিবাসীরা চাতাইসদৃশ্য এক প্রকার পাটি তৈরি করে। একে স্থানীয় ভাষায় 'তলই' বলে। দা দিয়ে বাঁশকে ফেটে ছোটো ছোটো করে মসৃণভাবে বেত টেনে এরপর রৌদ্রে শুকিয়ে তলই তৈরি করে। অনেকে এ তলই তৈরি করে বাজারে বিক্রি করে সংসার চালায়।

বাঁশের তৈরি ঝুড়ি

বাঁশ ও বেতের তৈরি শো-পিচ

তাছাড়া বাঁশ দিয়ে আদিবাসী নারীদের পিঠে বহন করে জিনিস নেওয়ার জন্য এক প্রকার ঝুড়ি তৈরি করা হয়। এ ঝুড়িকে স্থানীয় ভাষায় 'থুরুং' বলে। এটি তৈরিতে প্রত্যেক আদিবাসীদের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান রয়েছে। তাছাড়া বাঁশ দিয়ে আদিবাসীরা নানা ধরনের গহনার বাক্স ও নানা ধরনের ঝুড়ি তৈরি করে ব্যবহার করে থাকে। পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীরা 'মা থুরুং' নামে বড় আকারের এক প্রকার ঝুড়ি তৈরি করে। এটি তারা আলমিরা বা সিন্দুক হিসেবে ব্যবহার করে। এ ঝুড়িতে নতুন নতুন কাপড়, টাকা-পয়সা, অলংকার ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ ও দামি জিনিসপত্র রাখা হয়। এ ঝুড়িতে বিশেষ ধরনের ঢাকনা বানিয়ে তালা দেওয়ার ব্যবস্থা থাকে। বাঁশের নির্মিত বিভিন্ন ঝুড়িকে ফিনিসিং করতে হয় বেত দিয়ে। ঝুড়ির পায়া, মুখ, হাতল ইত্যাদি বেত দিয়ে ফিনিসিং করে বাঁধলে বাঁশের ঝুড়িটি আরও মজবুত হয়। তাছাড়া বসার চেয়ার, টেবিল, সোফাসেট বেত দিয়ে তৈরি করে অনেকে অর্থ উপার্জন করে থাকে। আদিবাসীদের বাঁশ ও বেতের শিল্পের মধ্যে রয়েছে ঝুড়ি (থুরুং), তলই, মাছ ধরা চাঁই, কুলা, ঢালা, ধানচালা চালানি, গহনার বাক্স, থালাবাসন রাখার ঝুড়ি, ভাত খাওয়ার পইদাং, মুরগির খাঁচা, শূকরের খাঁচা, ধান রাখার বড়ো ঝুড়ি, ধানের গোলা ইত্যাদি।

কাঠ শিল্প

আদিবাসীরা দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহারের জন্য কাঠের তৈরি প্রয়োজনীয় নানা ধরনের গার্হস্থ্য সামগ্রী তৈরি করে। সমাজে উচ্চ শ্রেণির লোক বা ধনী লোকেরা ঘরবাড়ি কাঠ দিয়ে তৈরি করে। কাঠের তৈরি জিনিসের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য জিনিসগুলো বর্ণনা করা হলো :

১. চরকা : জুমের উৎপাদিত তুলার বিচি আলাদা করার জন্য আদিবাসীরা নিজস্ব স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে চরকা-চরকি তৈরি করে। তাছাড়া সুতা কাটার জন্যও আদিবাসীরা নিজস্ব ডিজাইনে নানা ধরনের সুতা কাটার যন্ত্র তৈরি করে।

২. ঢেঁকি : আদিবাসীরা সাধারণ ঢেঁকি ব্যবহার করলেও ভিন্ন ধরনের ঢেকিও আদিবাসী সমাজে পরিলক্ষিত হয়। ঐ ঢেঁকি তৈরি করতে শক্ত বড় কাঠের গুড়ির মাঝখানে প্রথমে প্রয়োজনীয় ধান রাখা যায় এমন গর্ত করা হয়। এই গর্তের মধ্যে ধান রেখে দুই হাতে কাষ্ঠদণ্ড দিয়ে ধানে আঘাত করলে ধান থেকে চাল বের হয়।

৩. নৌকা : আদিবাসী দক্ষ কারিগররা তাদের স্বকীয় কারিগরের দক্ষতায় বড়ো গাছকে খোদাই করে নৌকা তৈরি করে। জঙ্গল হতে চাঁপালিশ অথবা নৌকার জন্য উপযুক্ত বড়ো গাছ বেছে নিয়ে গাছটাকে খোদাই করে তারা নৌকা তৈরি করে। এ ধরনের নৌকা তৈরি করতে কোনো আলাদাভাবে তক্তা বা পাটাতন জোড়া হয় না। এজন্য এজাতীয় নৌকাকে এক কাঠের নৌকা বলা হয়। ঐজাতীয় নৌকা সাঙ্গু নদীতে রুমা, থানছি এলাকায় এবং মাতামুহুরী নদীতে আলীকদম এলাকায় এখনো দেখা যায়। তাছাড়া কাঠ দিয়ে আদিবাসীদের বিভিন্ন ঐতিহ্যবাহী আসবাবপত্র ও সাধারণ আসবাবপত্রও তৈরি হয়।

কারুশিল্পী হ্লং ফত্রী মারমা

হ্লং ফত্রী মারমা ১৯৫০ সালে বালাঘাটা মৌজার লেমুঝিড়ি পাড়ায় এক দরিদ্র মারমা পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাদের নিজস্ব কোনো জায়গা-জমি না থাকায় ছোটোবেলা থেকে তিনি তাঁর বাবার সাথে বর্গাজমি চাষ করতেন। বর্গাজমি চাষ করেও তাঁর সংসার চলতো না। সংসারের টানাপোড়নে তিনি বালাঘাটা বাজারে এক ফার্নিচার দোকানে কাঠমিস্ত্রি হিসেবে কাজ শুরু করেন। দোকানে কাজ করার ফাঁকে ফাঁকে তিনি কাঠের পুতুল বানাতেন। এভাবে তিনি আস্তে আস্তে স্বশিক্ষায় ভাস্কর্য কাজে দক্ষতা অর্জন করেন।
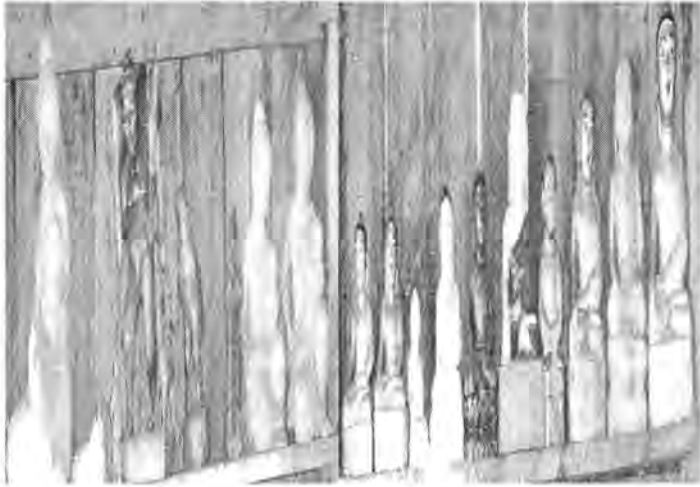
হ্লং ফত্রী মারমার শিল্পকর্ম

তাঁর ভাস্কর্যের মধ্যে আদিবাসীদের ধর্মীয়-সামাজিক জীবন, অরণ্য পরিবেশ, শিকারির চিত্র ফুটে উঠেছে। আদিবাসী এক ঝানু শিকারি হরিণ শিকার করে হরিণটিকে কাঁধে বহন করে হাতে তীর-ধনুক নিয়ে গ্রামে ফিরছে। এই ভাস্কর্যটিতে আদিবাসীদের শৌর্য-বীর্য প্রতিফলিত হয়েছে। মাচাং ঘরে বসে এক আদিবাসী নারী আপন সন্তানকে দুগ্ধপান করাচ্ছে। সত্যিকার অর্থে এই ভাস্কর্যে আদিবাসী নারীদের বাস্তব চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

শিল্পী হ্লং ফত্রী মারমার ভাস্কর্যে জঙ্গলের হরিণ, বাঘ, হাতি, টিয়া, ধনেশ ইত্যাদির প্রতিকৃতিতেও প্রকৃতির প্রতি ও জীবজন্তুর প্রতি তাঁর অগাধ ভালোবাসার নিদর্শনের চিহ্ন ফুটে উঠেছে। তাছাড়া তিনি কাঠ দিয়ে বুদ্ধমূর্তি তৈরি করে থাকেন। তাঁর তৈরিকৃত বুদ্ধমূর্তি দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী লোকেরা ক্রয় করে থাকেন। তাঁর ভাস্কর্য দেশ-বিদেশের অনেক পর্যটকরাও কিনে নিয়ে যাচ্ছে। তাছাড়া তিনি গয়ালের শিং, মহিষের শিং, হরিণের শিং, ধনেশ পাখির ঠোঁট দিয়ে নানা ধরনের রুচিশীল শোপিজ তৈরিতে বদ্ধপরিকর। তাঁর ভাস্কর্য ও কারুকার্যগুলো দেখলে মনে হয়

যেনো সবই জীবন্ত। হ্নং ফ্রী মারমার ভাস্কর্য সবগুলোই কাঠের। তবে তাঁর ভাস্কর্য বা মূর্তিগুলো কখনো পোকায় ধরে না বা নষ্ট হয় না। এর কারণ হলো, বছরে এমন একটা সময়ে তিনি কাঠ সংগ্রহ করেন যখন গাছ সম্পূর্ণ পরিপক্ব থাকে। তাই তার ভাস্কর্যগুলো কখনো পোকা ধরে না বা ঘুনে খায় না। কাঠগুলোকে তিনি প্রথমে ভালো করে রৌদ্রে শুকিয়ে রাখেন। কাঠ ভালোভাবে শুকানোর পর কাঠের উপর খোদাই করে তিনি ভাস্কর্য তৈরি করেন। হ্নং ফ্রী মারমা জানান, বর্তমানে বান্দরবানে আগের মতো বন নেই, তাই গাছও আগের মতো অহরহ পাওয়া যায় না। যেগুলো পাওয়া যায় তাও চড়া দামে ক্রয় করতে হয়। আগেতো জঙ্গলে গেলে গাছ পাওয়া যেতো। এখন যে মূর্তিগুলো বানাই তা সবগুলোই গাছ কিনে বানাতে হয়। বর্তমানে এ পেশা থেকে তিনি মাসে গড়ে ৩০/৪০ হাজার টাকা রোজগার করে ৭-৮ জনের সংসার চালান। তিনি আরও জানান, বর্তমানে তাঁর ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি সবগুলো মান্ধাতা আমলের। যদি আধুনিক যন্ত্রপাতি পাওয়া যেতো তাহলে আরও দ্রুত ও সুন্দরভাবে কাজ করা যেতো।

তিনি ভবিষ্যতে একটি শোরুম ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালু করার স্বপ্ন দেখেন। যাতে এলাকার বেকার ছেলেমেয়েরা এ কাজ শিখে অর্থোপার্জন করতে পারে।

কারুশিল্পী অংক্যচৌ মারমা

অংক্যচৌ মারমা বান্দরবানের একজন কীর্তিমান কারুশিল্পী। তিনি উ ওয়ে গ্য ও মাখ্যইংসিং-এর সংসারে ১৯৭৯ সালে বান্দরবান পার্বত্য জেলার কুহালং ইউনিয়নের মাঝের পাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মায়ানমারের রাজধানী ইয়াংগুনের আর্ট কলেজ থেকে ১৯৯৮ সালে চিত্র ও ভাস্কর্য বিষয়ে ডিপ্লোমা ডিগ্রি লাভ করেন। গত ১১-১২ বছর ধরে কারু ও ভাস্কর্য শিল্পকে পেশা হিসেবে নিয়ে তিনি জীবন ও জীবিকা নির্বাহ করছেন। তিনি কাঠ ও লোহা-সিমেন্ট দিয়ে ভাস্কর্য তৈরি করতে সমানভাবে পারদর্শী। শৈল্পিক দক্ষতায় তাঁর তৈরি কাঠের ভাস্কর্য অতি সুন্দর ও জনপ্রিয় হিসেবে বান্দরবানের বাইরেও সুখ্যাতি লাভ করেছে। কাঠ দিয়ে যে কোনো ভাস্কর্য তৈরিতে তিনি সিদ্ধহস্ত।

অংক্যচৌ মারমা

অংক্যচৌ এর শিল্পকর্ম

বর্তমানে সারাদেশে তাঁর তৈরি কাঠের ভাস্কর্যের চাহিদা রয়েছে বলে তিনি জানান। তাছাড়া বান্দরবানে বেড়াতে আসা অনেক বিদেশি পর্যটকও তাঁর তৈরি কাঠের ভাস্কর্য কিনে নিয়ে যান বলে তিনি জানিয়েছেন। তিনি কাঠ দিয়ে বুদ্ধ, রাধা-কৃষ্ণ, বিভিন্ন প্রাণী, নারীমূর্তি ইত্যাদি ভাস্কর্য তৈরি করে থাকেন। তিনি দেশের বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে বিভিন্ন মানুষের বিভিন্ন ধরনের চাহিদামতো শিল্পকর্ম করে থাকেন। যারা এই শিল্পের মূল্য বোঝে এবং শিল্পবোধসম্পন্ন মানুষেরাই তাঁর শিল্পকর্ম ক্রয় করে বলে তিনি জানান। এই পেশায় তিনি মাসে গড়ে ৩০-৪০ হাজার টাকার মতো আয় করেন।

অংক্যচৌ মারমা জানান, বান্দরবানে এই শিল্পকর্মে সহযোগিতা করার মতো তেমন কোনো লোক পাওয়া যায় না। অনেকে এই শিল্পের মর্যাদাও বোঝে না বলে তিনি মনে করেন। তাঁর ভবিষ্যতের স্বপ্ন হলো—বান্দরবানে একটি চারুকলা একাডেমি প্রতিষ্ঠা করা। যে প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বান্দরবানের পরবর্তী প্রজন্ম এই শিল্পে দক্ষতা অর্জন করে এই শিল্পের আরও প্রসার ও উন্নতি সাধন করবে। তিনি চান এই শিল্প ও এই শিল্পের শিল্পীদেরকে সকলেই সম্মান ও শ্রদ্ধার চোখে দেখুক।

অংক্যচৌ মারমা তাঁর কাঠের ভাস্কর্য শিল্পকর্ম নিয়ে দেশের রাজধানী ঢাকায় দুটি প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেছেন। ২০১০ সালে 'প্রবর্তনা'র আয়োজনে বসুন্ধরা সিটিতে একবার এবং জাতীয় জাদুঘরে আরেকবার তাঁর তৈরি কাঠের শিল্পকর্ম নিয়ে প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেন। এরইমধ্যে দেশের বেশ কয়েকটি টিভি চ্যানেলে তাঁর শিল্পকর্ম নিয়ে প্রতিবেদন এবং সাক্ষাৎকার প্রচারিত হয়েছে।

খংতম

খংতম হলো বাঁশ ও বেতের তৈরি একপ্রকার ঢাকনাযুক্ত ঝুড়িবিশেষ। এই খংতম পোক্ত বেত ও পাকাপোক্ত বাঁশ থেকে পাতলা বেত তুলে তৈরি করতে হয়। এই খংতমে পোক্ত জাতবেত (মোটা) দিয়ে তৈরি চারটি পায়া থাকে এবং একটি ঢাকনা থাকে। এই ধরনের ঝুড়ি প্রত্যেক আদিবাসী সমাজে দেখা যায় এবং এগুলোকে বিভিন্ন আদিবাসী বিভিন্ন নামে ডাকে। তবে খংতম হলো ম্রো আদিবাসী শব্দ। এই খংতমে সাধারণত মূল্যবান দলিল-দস্তাবেজ, গহনা, মূল্যবান কাপড়-চোপড়সহ নানা ধরনের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র রাখা হয়।

ধান মাপার আড়ি

এই ঝুড়িটি সম্পূর্ণ বেতের তৈরি। এটি শুধু আদিবাসী নয়, স্থানীয় বাঙালিরাও এই আড়ি দিয়ে ধান ও চাল মাপে। এক আড়ি সমান ১৬ সের। এই আড়ি সাধারণত আদিবাসী কারিগররা তৈরি করে থাকেন। এই অঞ্চলের মানুষ ধান, চালসহ নানা ধরনের দানাজাতীয় শস্য মাপার জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী হিসেবে ব্যবহার করে। এই আড়িটি নিত্যব্যবহারে অত্যন্ত প্রয়োজনহেতু স্থানীয় বাঙালিরাও এটি তৈরি করে।

বীজ রাখার পাত্র

এই পাত্রটি বাঁশ বেত দিয়ে তৈরি করা হয়। প্রথমে এটিকে ঝুড়ির মতো করে বানানো হয়। দেখতে তিনকোণা ঝুড়ির মতো। এই ঝুড়ির মধ্যে বিভিন্ন ফসলের বীজ রাখা হয়।

ঐ ঝুড়িতে ফসলের বীজ রাখলে পাশে দুই কোনে বীজগুলো জমে থাকে আরও নীচে একটি কোণ থাকে সে কোণ থেকে বীজের জন্য প্রয়োজনীয়তা আদ্রতা পাওয়া যায়। যারফলে বীজগুলো শুকনো থাকে এবং নষ্ট হয়না। সাধারণত জুমে ফলানো বিভিন্ন ফসলের বীজ এই পাত্রে রাখা হয়।

পইদাং

পইদাং হলো সম্পূর্ণ বেত দিয়ে তৈরি এক প্রকার টেবিল বিশেষ। গণ্যমান্য ব্যক্তি, সমাজপতি, ধর্মীয় পুরোহিতদেরকে এই টেবিলে ভাত খাওয়ানো হয়। এই পইদাং পার্বত্য চট্টগ্রামে সকল আদিবাসী সমাজে দেখা যায়। সাধারণত এই টেবিল দৈর্ঘ্যে দুই থেকে আড়াই হাত, প্রস্থে দেড় থেকে দুই হাত এবং এর উচ্চতা এক হাত হয়। এই টেবিলকে আদিবাসী সমাজে আভিজাত্যের প্রতীকও বলা চলে। এই পইদাং বিশিষ্ট অতিথিদের আপ্যায়নের টেবিল হিসেবেই অধিক পরিচিতি।

ওয়াপম

ম্রো ভাষার ওয়াপম মানে মুরগির খাঁচা। এই খাঁচাটি সম্পূর্ণ বাঁশের পাতলা বেত দিয়ে তৈরি। দূরদূরান্তে যাওয়ার সময় এই খাঁচায় মুরগি ভরে নেওয়া হয়। যাতে খাঁচার ভেতর সবসময় বাতাস ঢুকে এবং মুরগি ঠিক মতো নিঃশ্বাস নিতে পারে এবং মুরগির কোনো অসুবিধা না হয়। এছাড়াও এই খাঁচা পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীরা বিভিন্ন জিনিসপত্র রাখার জন্যও ব্যবহার করে থাকে।

মানচা

মানচা হলো ম্রোদের এক প্রকার থুরং। এই ঝুড়িটি বেত ও বাঁশের তৈরি। এই ঝুড়িটি শুধু ম্রো আদিবাসীরাই ব্যবহার করে। বিয়ে হওয়ার পর কনে যখন প্রথমবারের মতো স্বামীকে নিয়ে বাপের বাড়িতে যায় তখন এই মানচা পিঠে করে নিয়ে যেতে হয়। এই মানচা ম্রো সমাজের ঐতিহ্যের প্রতীক।

খংতম ম্রোদের থুরুং (ঝুড়ি)

ধান মাপার আড়ি

ফসলের বীজ রাখার পাত্র

পইদাং (অতিথি আপ্যায়নের টেবিল)

ম্রোদের ওয়াপম (মুরগির খাঁচা)

মানচা ম্রোদের বিয়ের থুরুং

কারুশিল্পীর সাথে প্রধান সমন্বয়কারী চৌধুরী বাবুল বড়ুয়া

কারুশিল্পীর তথ্য নিচ্ছেন সংগ্রাহক সিংইয়ং ম্রো

কাঠের তৈরি লোকশিল্প

লোকপোশাক-পরিচ্ছদ

বান্দরবান পার্বত্য জেলায় আদিবাসী ও বাঙালি জনগোষ্ঠী একই সাথে বসবাস করার ফলে গৃহনির্মাণে যেমনি বৈচিত্র্য দেখা যায়, তেমনি পোশাক-পরিচ্ছদে বৈচিত্র্যের ছাপ বিদ্যমান। বাঙালিরা সাধারণত প্যান্ট-শার্ট, লুঙ্গি, ধুতি, পায়জামা, পাঞ্জাবি, শাড়ি, শেলোয়ার-কামিজ ইত্যাদি পরে। এ জেলায় আদিবাসীর সংস্কৃতিতে যেভাবে মায়ানমারের সংস্কৃতি প্রভাবিত হয়েছে তেমনি বাঙালির সংস্কৃতিতেও মায়ানমারের সংস্কৃতির প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। মায়ানমারের বাঙালি মহিলারা ভুপাত্তি নামে থামি ও ব্লাউজ পরে। তেমনি এ জেলার কিছু কিছু বাঙালি মহিলাকেও ভুপাত্তি পরিধান করতে দেখা যায়। অপরদিকে আদিবাসীদের ঐতিহ্যবাহী পোশাক-পরিচ্ছদে নিজস্ব শিল্পের নৈপুণ্যের স্বাক্ষর পাওয়া যায়। তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ দেখে সহজেই তাদের পৃথক করা যায়, সে কোন আদিবাসী। আদিবাসী পুরুষদের পরিধেয় বস্ত্রের তেমন বৈচিত্র্য বা বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত না হলেও মহিলাদের পোশাক বুননের সময় নিজস্ব বিশেষ বিশেষ কারুকার্য প্রাধান্য পেয়ে থাকে। তবে বর্তমানে আদিবাসী পুরুষরা বাঙালিদের মতোই লুঙ্গি, প্যান্ট, জামা পরতে শুরু করেছে।

ম্রো আদিবাসীর পোশাক-পরিচ্ছদ

ম্রোদের পোশাক-পরিচ্ছদের মধ্যে *দং* (নেংটি কাপড়), *ওয়ানক্লাই* (লুঙ্গিজাতীয় মেয়েদের পরনের কাপড়), *লাপং* (পাগড়ি), *ওয়ানচা* (মেয়েদের বুকের কাপড়), *করমা*, (জামা) ও *তাপং* বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। *দং* হলো পুরুষদের পরনের কাপড়। এটি স্থানীয় হাট-বাজার থেকে ক্রয় কর হয়। সাদা কাপড়কে দৈর্ঘ্যে ৬ হাত, প্রস্থে ২ হাত কেটে নেংটি আকারে তৈরি করে ম্রো পুরুষরা পরিধান করে। মেয়েরা 'ওয়ানক্লাই' নামে নিজেদের তৈরি কাপড় পরিধান করে। এ কাপড় সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক উপাদানে তৈরি করা হয়ে থাকে। জুমের কার্পাস তুলা থেকে নিজেদের বানানো চরকি-চরকা দ্বারা তুলার বিচি ছাড়িয়ে বিশেষ উপায়ে সুতা তৈরি করা হয়। এরপর জুমের উৎপাদিত *স্রাম* নামক এক প্রকার উদ্ভিদকে হাঁড়ির পানিতে রেখে কয়েকদিন পঁচিয়ে রাখতে হয়। সেই পানি যখন কালো রঙ ধারণ করে সেই কালো রঙের জলে সুতাকে একরাত ভিজিয়ে রাখলে সুতার রঙ সম্পূর্ণ কালো হয়ে যায়। এই কালো রঙের সুতা দিয়ে ম্রো মহিলারা কোমর তাঁতে বুনে পরনের কাপড় ৯ ইঞ্চি চওড়া '*ওয়ানক্লাই*' তৈরি করে থাকে। এ *ওয়ানক্লাই*-এর পিছন দিকে বিশেষ ধরনের কারুকার্য করা হয়। কোমরের মাপ অনুযায়ী ম্রো রমণীরা ইহার দৈর্ঘ্য নির্ধারণ করে। করমা (জামা) পুরুষ-মহিলা উভয়েই পরিধান করে। তবে জুমে কাজ করার সময়েই এ ধরনের জামা সাধারণত পরিধান করে থাকে।

মশা-মাছি ও রোদের উত্তাপ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তারা করমা পরিধান করে। এখনও অনেক ম্রো পুরুষ-মহিলা উভয়েই লম্বা চুল রাখে। চুলে যাতে ময়লা-আবর্জনা না পড়ে তার জন্য সর্বক্ষণ *লাপং* ব্যবহার করে। এই কাপড়টিও স্থানীয় হাট-বাজার থেকে ক্রয় করা হয়।

ম্রো মেয়েরা *ওয়ানচা* নামে এক প্রকার কাপড় গায়ের চাঁদরের মতো ব্যবহার করে। এটি তাদের নিজেদের তৈরি কাপড় নয়। বাজার থেকে ক্রয় করা রঙিন কাপড়। ম্রো মেয়েরা শিশুদেরকে কাঁধে ঝুলিয়ে নেওয়ার জন্য কোমর তাঁতে এক প্রকার মোটা কাপড় তৈরি করে তা ব্যবহার করে। ম্রো ভাষায় এ কাপড়কে *তাপুং* বলে।

ত্রিপুরা আদিবাসীর পোশাক-পরিচ্ছদ

ত্রিপুরা পুরুষরা তাদের ঐতিহ্যবাহী পোশাক-পরিচ্ছদ হিসেবে নিজস্ব তাঁতে তৈরি করা গামছা পরিধান করে। তাছাড়া ত্রিপুরা পুরুষরা ধুতিও পরিধান করে। অনেকে মাথায় সাদা কাপড় জড়ায়। মহিলারা কোমর তাঁতে তৈরি এক প্রকার কাপড় '*রেনাই*' পরিধান করে। ত্রিপুরা বিভিন্ন গোত্রের নারীরা ভিন্ন ভিন্ন ডিজাইনে '*রেনাই*' পরিধান করে। বক্ষবন্ধনী হিসেবে ত্রিপুরা মহিলারা কোমর তাঁতে তৈরি কাপড় '*রিসা*' পরিধান করে। সাধারণত এসব রিসা দৈর্ঘ্যে তিন হাত, প্রস্থে এক হাত পর্যন্ত হয়ে থাকে। এ *রিসা*'তে বিভিন্ন ধরনের ফুল ও প্রজাপতির নক্সা দেখা যায়।

রিনাই সম্পূর্ণ সাদা-কালো সুতা দিয়ে ডোরাকাটা নক্সায় তৈরি করা হয় এক ধরনের পোশাক। এতে আর অন্য কোনো কারুকার্য থাকে না। হাঁটুর সামান্য নীচ অবধি রিনাই পরিধান করা হয়। উসুই নারীরাই এ ধরনের *রিনাই* পরিধান করে থাকে। উসুইদের *রিসা* রঙিন সুতা দিয়ে হরেক রকমের নক্সাখচিত করে তৈরি করা হয়। উসুই পুরুষ ও মহিলারা কোমর তাঁত তৈরি জামা '*জুম্মাছিলুম*' পরিধান করে থাকে। অনেকে মাথায় সাদা কাপড়ও জড়ায়।

মারমা আদিবাসীর পোশাক-পরিচ্ছদ

মারমা পুরুষরা মোটা কার্পাস তুলার সুতা দিয়ে তৈরি বেশ উন্নতমানের চমৎকার রঙ ও ডিজাইন করা ঐতিহ্যবাহী পোশাক-পরিচ্ছদ ব্যবহার করে। পুরুষরা মোটা সুতা দিয়ে নিজস্ব তাঁতে তৈরি লুঙ্গি এবং গায়ে মোটা কাপড়ের তৈরি কলারবিহীন জামা পরিধান করে। অনেক পুরুষকে মাথায় '*খবং*' (পাগড়ি) পরিধান করতে দেখা যায়। মহিলারা নিজস্ব কোমর তাঁতে তৈরি বিভিন্ন ধরনের নক্সার খচিত 'থামি' পরিধান করে। বয়স্ক নারীরা ব্লাউজ জাতীয় ফুলহাতার জামা '*আংগি*' ব্যবহার করে আর যুবতী নারীরা হাফহাতার বিভিন্ন রঙের '*আংগি*' পরিধান করে। বিভিন্ন ধরনের কাজ করার সময় মেয়েরা সাদা কাপড়ের '*খবং*' মাথায় জড়িয়ে রাখে। বর্তমানে মিয়ানমার থেকে আসা নানা ধরনের লুঙ্গি, থামি ও ব্লাউজ সুলভমূল্যে স্থানীয় হাট-বাজারে পাওয়া যায়। এই পোশাকগুলোই মারমারা সচরাচর ব্যবহার করে থাকে।

চাকমা আদিবাসীর পোশাক-পরিচ্ছদ

চাকমা মেয়েরা কোমর তাঁতে নানা ধরনের নক্সাখচিত পরনের কাপড় বুনে। কোমর তাঁতে তৈরি কাপড়ে একদিকে 'চাবুগি' বা আঁচলা তৈরি করা হয়। তাঁতের তৈরি পরনের কাপড়ে জেইদ চাবুকি, বিজনফুল, চোখ চাবুগি, ধান ছড়া ইত্যাদি নানা ধরনের চাবুগির নক্সা তোলা হয়। চাকমা মেয়েরা সাধারণত পিনন, খাদি ও ব্লাউজ পরিধান করে। চাকমা মেয়েদের পিনন সাধারণত কালো রঙের হয়, তবে কালো পিননে লাল পাড় থাকে। লাল রঙের রঙিন পাড়টা উপরে ও নীচে চার ইঞ্চি চওড়া থাকে। 'খাদি' নামক বক্ষবন্ধনী দৈর্ঘ্যে সাড়ে তিন হাত এবং প্রস্থে দেড় হাত লম্বাবিশিষ্ট রঙ-বেরঙের নক্সা ও ফুল তুলে বানানো হয়। শুধু লাল রঙের উপর বিভিন্ন নক্সা ও ফুল তুলে 'রাঙা খাদি' নামে এক প্রকার কাপড় বানানো হয়। এই কাপড়টি চাকমা মেয়েদের অত্যন্ত প্রিয় খাদি। বেশিরভাগ যুবতী মেয়েরাই এই খাদিটি পরিধান করে। এছাড়া জুমের কাজ করার জন্য বিশেষ ধরনের জামা 'জুম্মাছিলুম' কোমর তাঁতে বুনে ব্যবহার করে। এ জুম্মাছিলুমে কোনো নক্সা বা কারুকার্য থাকে না। জুমের কাজে যাওয়ার সময় চাকমা পুরুষ ও মহিলা উভয়ই এ জুম্মাছিলুম পরিধান করে। চাকমা পুরুষদের অনেকেই ধুতি, গামছা, লেংটি ইত্যাদি পরিধান করে থাকে।

তঞ্চঙ্গ্যাদের পোশাক-পরিচ্ছদ

তঞ্চঙ্গ্যাদের ঐতিহ্যবাহী পোশাক-পরিচ্ছদ অত্যন্ত মার্জিত, রুচিসম্পন্ন ও বৈচিত্র্যপূর্ণ। তঞ্চঙ্গ্যাদের পোশাক-পরিচ্ছদের মধ্যে পিনন, খাদি, খবং, ফা-ধরি, জুম্মাছিলুম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কোমর তাঁতে বুনানো চাকমা মেয়েদের বক্ষবন্ধনী সদৃশ্য ফুলখাদি ও রাঙাখাদি তঞ্চঙ্গ্যা মেয়েরা পরিধান করে। তঞ্চঙ্গ্যা মহিলারা মাথায় পাগড়ি হিসেবে কোমর তাঁতে বুনা সাদা কাপড় পরিধান করে। এ কাপড়ের দু'প্রান্তে কারুকার্য করা থাকে। 'খবং' তৈরি হয় দৈর্ঘ্যে সাড়ে তিন হাত এবং প্রস্থে আধা হাত মাপে। পুরুষরা যে 'খবং' ব্যবহার করে তাতে কোনো কারুকার্য থাকে না। 'ফা-ধরি' হলো কোমর তাঁতে বানানো এক প্রকার বক্ষবন্ধনী বিশেষ। এ ধরনের পোশাক সাধারণত তঞ্চঙ্গ্যা মহিলারাই ব্যবহার করে। গামছার মতো চওড়া ফা-ধরির দু'প্রান্তে হালকা রঙের হরেক রকমের নক্সা ও কারুকার্য করা থাকে। তঞ্চঙ্গ্যা মহিলাদের পিননকে কোমরের সাথে শক্ত করে বেঁধে রাখার জন্য ফা-ধরি ব্যবহার করা হয়। জুম্মাছিলুম হলো এক প্রকার ফুলহাতা জামা। তঞ্চঙ্গ্যা মহিলাদের জুম্মাছিলুমে কাঁধে ও কলারে বৈচিত্র্যময় কারুকার্য করা থাকে। তবে পুরুষদের ব্যবহৃত জুম্মাছিলুমে কোনো নক্সা বা কারুকার্য থাকে না। তাছাড়া তঞ্চঙ্গ্যা পুরুষরা কোমর তাঁতে বুনানো গামছাও পরিধান করে।

চাকদের পোশাক-পরিচ্ছদ

চাকদের সমাজিক রীতিনীতি মারমা ও চাকমা সমাজের সাথে প্রায় মিল থাকলেও চাক সমাজে মারমা সমাজের রীতির প্রভাব বেশি। কিন্তু চাক আদিবাসী নারীদের থামি (পরনের কাপড়) ও চাকমা রমণীদের পিননের মধ্যে মিল রয়েছে। কালো রঙের মোটা সুতার ফাঁকে ফাঁকে লাল সুতা ও দুই পাশে এক ইঞ্চি পরিমাণ লাল সুতা দিয়ে চাক নারীদের এই থামি

তৈরি করা হয়। চাক ভাষায় রমণীদের ব্যবহৃত থামিকে 'নাফি' এবং পুরুষ ব্যবহৃত লুঙ্গিকে 'শামু' বলে। আর ব্লাউজকে 'তাছুলং পুজু', শার্টকে 'তাছুব্রাই পুজু' বলে। প্রত্যেক চাক রমণী দুটি করে 'রাংকেং' ব্যবহার করে। একটি চুল বাঁধার কাজে আরেকটি বক্ষবন্ধনী বাঁধার কাজে। পূর্বে চাক পুরুষরা নয়হাতি ধুতি পরতো। এর নাম "তাহুতংপাংহে" আর মাথায় ব্যবহৃত পাগড়িকে বলা হয় 'ধাপং' 'লাহ্রেকপুজু' নামে এক প্রকার বিশেষ ধরনের নিজস্ব তৈরি জামা চাক পুরুষরা পরিধান করে।

খিয়াংদের পোশাক-পরিচ্ছদ

খিয়াংরা নিজস্ব তাঁতে পুরুষদের পোশাক-পরিচ্ছদ, মেয়েদের বক্ষবন্ধনী ও মাথার পাগড়ি তৈরি করে। খিয়াং পুরুষগণ নিজেদের তৈরি লুঙ্গি ও এক ধরনের জামা পরিধান করেন। হাট-বাজারে ও বাইরে যাওয়ার সময় পুরুষরা কোমর তাঁতে বুনা জামা ও ধুতি পরিধান করেন। ধুতি পরার প্রথা হিন্দু, বৌদ্ধ এবং পার্বত্য অঞ্চলের চাকমা ও ত্রিপুরাদের মধ্যে প্রচলিত।

পাংখোয়াদের পোশাক-পরিচ্ছদ

পাংখোয়া মেয়েরা কোমরের নীচে পরার জন্য নিজেদের হাতে তৈরি এক ধরনের স্কার্ট পাংখোয়া ভাষায় যাকে 'কেংজেল ভেল' বা একপার্ট কাপড় বলে এবং দেহের ঊর্ধ্বাংশে পরার জন্য 'করভ' বা টপ ব্লাউজ ব্যবহার করে। বিশেষ দিনে সাজের জন্য সাদা কাপড় বা 'পোয়ান ঙৌ' পরিধান করে থাকে। পাংখোয়া মেয়েরা হাতের কাজে খুবই পারদর্শী। নিজেদের ব্যবহারের জন্য সমস্ত কাপড় পাংখোয়া মেয়েরা চমৎকারভাবে ফুলের নক্সা দিয়ে নিজেরাই তৈরি করে। জুমে উৎপাদিত কার্পাস তুলার সুতার সাথে নানা রঙের সুতা দিয়ে কোমর তাঁতে তৈরি 'পোয়ানপুই' নামের একপ্রকার কাপড় পাংখোয়া পুরুষরা পরিধান করে। কোমরের নীচে পরিধানের জন্য 'রেন তে রেং' অর্থাৎ নেংটি কাপড় বা একপার্ট কাপড় যা দৈর্ঘ্যে ৩-৪ ফুট এবং প্রস্থে আধা ফুট চওড়া হয়। বিশেষ দিনে পরার জন্য ব্যবহৃত হয় 'চং নাক পোয়ান' বা জমকালো পোশাক। এই পোশাকে অনেক কারুকাজ করা থাকে।

লুসাইদের পোশাক-পরিচ্ছদ

পুয়ানরোপুই : এগুলো মেয়েদের এক ধরনের পরনের কাপড় (থামি)। সাধারণত ধনী পরিবারের মেয়েরা এ ধরনের কাপড় পরিধান করে থাকে। এটি অত্যন্ত মূল্যবান ও দামি কাপড়। এটি তৈরি করতে আনুমানিক ২-৩ মাস সময়ের প্রয়োজন হয়। এই পুরো থামিটি বিভিন্ন রঙের সুতা দিয়ে নিখুঁতভাবে বিভিন্ন নক্সা করা এবং সাধারণ থামির চেয়ে এর ওজন দ্বিগুণ হয়। তাছাড়া এই থামি তৈরি করতে বিভিন্ন রঙের সুতা ক্রয় করতে হয়। এ সুতা অনেক দামি হওয়ায় সুতা ক্রয় করতে অনেক টাকার প্রয়োজন হয়। এটি তৈরি করতে সময়সাপেক্ষ ও দামি সুতা ক্রয় করতে না পারায় বেশিরভাগ লুসাই মেয়ে এ

ধরনের কাপড় বুনতে চায় না। তাই শুধু সৌখিন ব্যক্তিরাই এ ধরনের কাপড় বুনে ব্যবহার করে। কাপড় ও ডিজাইন অনুসারে বর্তমানে এর আনুমানিক মূল্য ৫ থেকে ১০ হাজার টাকা।

১. পুয়ানচেই ও করচেই : এই পোশাক বিশেষ বিশেষ দিনে লুসাই মেয়েরা পরে থাকেন। যেমন– বিবাহের সময় কনের পোশাক হিসেবে বা বিশেষ ধরনের নৃত্যের সময় বিশেষ পোশাক হিসেবে এই পোশাক মহিলারা ব্যবহার করে থাকে। পোশাকটি সাদা থামির উপর কালো, লাল, সবুজ, সোনালি ও হলুদ রঙের সুতা দিয়ে বিশেষ ধরনের নক্সা দ্বারা তৈরি।

২. ঐতেখের : এই থামিটি সাদা ও কালো চেক দিয়ে তৈরি। এই পোশাকটি কোনো বিশেষ অনুষ্ঠান, নৃত্যানুষ্ঠান ও বিবাহ অনুষ্ঠানে কনের পোশাক হিসেবেও ব্যবহৃত হয়।

খুমী পোশাক-পরিচ্ছদ

খুমী মহিলারা সাধারণত নিজেদের হাতে তাঁতে বুনা 'নেনা' (থামি) পরিধান করে। খুমী মহিলাদের ব্যবহৃত থামি ১৫-১৬ ইঞ্চি লম্বা এবং বিভিন্ন রঙে ও নকশায় তৈরি করা হয়। এটি সাধারণত চতুর্দিকে পুঁতিরমালা দিয়ে অলংকৃত করা। খুমী মহিলারা মাথায় সাদা পাগড়ি, চুলে খোঁপা, বাহুতে পিতলের বালা, কানে রূপা দিয়ে তৈরি বড়ো ধরনের দুল, পায়ে খাড়ু ও কোমরে বিছা ব্যবহার করে। খুমী মহিলারা নিজেদের ব্যবহারের জন্য কম্বল বুনে। খুমী পুরুষদের ঐতিহ্যবাহী পোশাক হচ্ছে নেংটি ও লুঙ্গি। তবে অধিকাংশ খুমী পুরুষ এখন আর নেংটি ব্যবহার করে না। খুমী পুরুষরাও সাধারণত লম্বা চুল রাখে এবং কানে এক ধরনের দুল পরে।

বম পোশাক-পরিচ্ছদ

প্রকৃতি প্রেমী বমদের পোশাক-পরিচ্ছদ খুব একটা নেই। গহীন অরণ্যে প্রকৃতির সঙ্গে এরা মিলেমিশে একাকার হয়ে থাকে। বম আদিবাসীদের পোশাক-পরিচ্ছদ সম্পর্কে নিম্নে দেওয়া হলো :

১. রেনতে : এগুলো পুরুষদের পোশাক, দৈর্ঘ্যে দশ হাত, প্রস্থে ৬-৮ ইঞ্চি। এটি পুরুষদের নেংটিজাতীয় পোশাক।

২. লাইকর : পুরুষদের এক ধরনের জামা। নিজেদের তাঁতে সুতা দিয়ে প্রস্তুত করা জামা।

৩. মিপা করদহ্ : এগুলো পুরুষদের পরনের জামা। এই জামার রঙ হয় সাদা অথবা কালো।

৪. উপং : এগুলো এক ধরনের মাথার পাগড়ি। লম্বায় ৫-৬ হাত হয়। এই পাগড়ি সাদা রঙের হয়।

৫. নুনাও করদুম : এগুলো মেয়েদের পরনের জামা। এর রঙ কালো।

৬. নুফেন : মেয়েদের স্কার্টজাতীয় পোশাক। পিননের মতো। তবে এই কাপড়টি হাঁটুর উপর পর্যন্ত লম্বা হয়।

বম পোশাক (মহিলা) খুমী পোশাক (মহিলা) চাক পোশাক (মহিলা)

খেয়াং পোশাক (মহিলা)

চাকমা পোশাক (মহিলা)
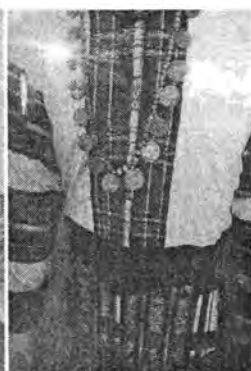
লুসাই পোশাক (মহিলা)

মারমা পোশাক (পুরুষ)

ম্রো পোশাক (মহিলা)

লোকস্থাপত্য

বান্দরবান পার্বত্য জেলায় গ্রাম-পাড়ার চিত্র বাংলাদেশের সমতল জেলা থেকে একটু ভিন্ন। আবার বিভিন্ন নৃ-গোষ্ঠীর ঘরবাড়ি বাঙালিদের থেকে আলাদা ও ভিন্ন ধরনের। এখানকার পাহাড়ি পরিবেশ, ঘরবাড়ি তৈরির কাঁচামাল সংগ্রহ ও অর্থনৈতিক টানাপোড়েন সব মিলিয়ে প্রাকৃতিক পরিবেশে এখানকার ঘরবাড়ি ভিন্নরূপ লাভ করেছে যা সমতল ভূমি থেকে পাহাড়ে আগত পর্যটককে আকৃষ্ট না-করেই পারে না। জেলার উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের শহরে কাঠ-টিনের দোকানপাট কিছু থাকলেও গ্রাম এলাকার চিত্র ভিন্ন। এখানকার বসবাসকারী বাঙালিদের ৫০% ঘরবাড়ির মাটির ভিত ও দেয়াল, আর বেশিরভাগ ঘরের ছাউনিই টিনের। তবে বনছনের ছাউনিও কম নয়। অল্প আয়ের মানুষেরা টিনের ছাউনির সাথে ছনবন কিংবা বিভিন্ন গাছ ও বাঁশের পাতা দিয়ে বারান্দা অথবা রান্নাঘর তৈরি করে। জ্বালানির সংকট, জুমচাষ ও রাবার বাগান সৃজনের ফলে ছননল খাগড়াসহ বিভিন্ন ঘরের ছাউনী সামগ্রী বিলীন হতে চলেছে। উল্লেখ্য, এই জেলায় পাহাড়ি এলাকাসমূহে এক সময় মুজ (Brownlowia elata Rooxb) গাছের প্রাধান্য ছিল। এখন তা বিপুপ্তির পথে। এ গাছের কাঠও ব্যবহারযোগ্য। প্রাকৃতিকভাবে জন্ম নেওয়া এই গাছের পাতা খুবই ঘন। পাতা ঝরে যায় খরা মৌসুমে। ঝরাপাতা বিক্রি করে দিয়ে কেউ কেউ অর্থোউপার্জনও করে থাকেন।

পাহাড়িদের ঘরবাড়ি মানে কাঠ-বাঁশের বহু প্রকোষ্ঠবিশিষ্ট মাচাংঘর। বাঁশ-কাঠ দুর্মূল্য হেতু এবং মানুষের আর্থিক উন্নয়নের সাথে সাথে পরিবর্তিত হচ্ছে বাঙালিদের মাটির দেয়াল আর পাহাড়িদের বাঁশ-কাঠের ঘরবাড়ি। এর বদলে তৈরি হচ্ছে টিন-কাঠের ঘর কিংবা ইমারত। তদ্রূপ আদিবাসীদের ঘরবাড়ি নির্মাণের স্থাপত্যেও শিল্পবোধ ও রুচিতে আধুনিকতার ছোঁয়া লেগেছে।

আদিবাসীদের মাচাংঘর

এ জেলায় আদিবাসী ও বাঙালি জনগোষ্ঠীর বসবাসের ফলে ঘর নির্মাণের ব্যাপারে বৈচিত্র্যতা লক্ষ্য করা যায়। বাঙালিরা সাধারণত চার চালাবিশিষ্ট ঘর নির্মাণ করে। ঘর মাটি ও বাঁশের বেড়া দিয়ে তৈরি। আর ধনী পরিবারের লোকেরা পাকাঘর নির্মাণ করে থাকে। মধ্যবিত্তরা আধাপাকা টিনের ঘর নির্মাণ করে। অপরদিকে আদিবাসীরা সাধারণত মাচাংঘর নির্মাণ করে বসবাস করে। আবার বিভিন্ন আদিবাসীদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন গৃহনির্মাণ শৈলী দেখা যায়। আদিবাসীরা সাধারণত গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনযাপন করে। বেশিরভাগ আদিবাসী অরণ্যাবৃত্ত গভীর বনে বসবাস করে। মাটি থেকে উঁচু করে গাছের খুঁটির উপর তারা মাচাং তৈরি করে বসবাস করে। ঘরে ওঠার জন্য কাঠের খাঁজকাটা সিঁড়ি ব্যবহার করে। এ ঘরগুলোর ছাউনি ছন অথবা বাঁশপাতা দিয়ে তৈরি। বাঁশপাতায় সহজে আগুন ধরে না বলেই অনেক আদিবাসী বাঁশপাতা দিয়ে ঘরের ছাউনি দিয়ে থাকে।
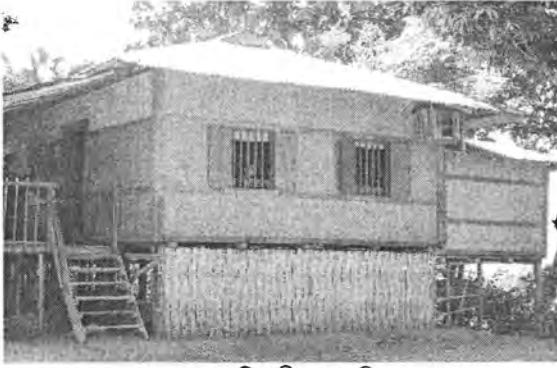
বম আদিবাসীদের বাড়ি

ম্রো আদিবাসীদের বাসগৃহ

খুমী আদিবাসীদের বাসগৃহ

প্রত্যেক আদিবাসীর ঘর স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের দাবিদার। আদিবাসীরা সবাই মাচাংঘর নির্মাণ করলেও এক এক আদিবাসীর ঘরবাড়ির নির্মাণশৈলী ও অভ্যন্তরীণ কক্ষ বিন্যাস পদ্ধতি ভিন্ন ভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। চাকমা ও তঞ্চঙ্গ্যা আদিবাসীরা নদীর তীরে সমতল স্থানে ঘরবাড়ি নির্মাণ করে। তারা সাধারণত পাহাড়ের কোল ঘেঁষে মাটি থেকে দু'তিন হাত উঁচুতে মাচাংঘর নির্মাণ করে। অপরদিকে ম্রো ও ত্রিপুরা আদিবাসীরা মাটি থেকে ১০-১২ হাত উঁচুতে মাচাংঘর নির্মাণ করে থাকে। ম্রো আদিবাসীরা অতিথিদের বিশ্রামকক্ষে বাঁশের দেয়ালে অসংখ্য শিকারি জীবজন্তুর মাথার খুলি সাজিয়ে রাখে। এটি তাদের শৌর্য-বীর্যের ও ঐতিহ্যের প্রতীক। এতে গৃহের বীরত্ব প্রকাশ পায়। ঘরের সম্মুখ দেয়ালে বিভিন্ন হাতিয়ার রাখার ব্যবস্থা থাকে। আর ঘরের এককোণে খাবারপানি ও হাঁড়ি-পাতিল রাখার ব্যবস্থা থাকে।

কোনো কোনো আদিবাসীর মাচাংঘরে গৃহস্বামী-স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের জন্য পৃথক পৃথক কক্ষের ব্যবস্থা আছে। অনেক আদিবাসীদের মাচাংঘরে সবাই মিলে একসঙ্গে একটি খোলা কক্ষেই খাওয়া-দাওয়া, বিশ্রাম ও শয়ন করে। বাড়িতে খাদ্যশস্য ও শস্যের বীজ রাখার জন্য বিশেষ স্থান বা কক্ষ রাখা হয়। আর মাচাংঘরেই বিশেষ কোনো সু-বিধাজনক স্থানে রান্নাবান্নার জন্য চুলা স্থাপন করা হয়।

হিংস্র বন্য জীবজন্তুর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য প্রত্যেক আদিবাসীর মাচাং ঘরের নীচে গৃহপালিত পশু শূকর, ছাগল, হাঁস-মুরগির খোয়াড় তৈরি করে এবং মাচাং-এর নীচে জ্বালানি কাঠ মজুত করে রাখে। কোনো কোনো আদিবাসী ঘরে ওঠার জন্য ঘরের পেছন দিক থেকে, আবার কোনো কোনো আদিবাসী ঘরের সম্মুখ ভাগ থেকে ঘরে ওঠার সিঁড়ি রাখে। আদিবাসীরা ঘরবাড়িতে খুব বেশি জানালা রাখে না। ঘরের জানালা বেশি রাখা হলে ভূতপ্রেত বা কোনো অপশক্তি ঘরে প্রবেশ করে বলে তারা বিশ্বাস করে।

লোকসংগীত

লোকসংস্কৃতির একটি জনপ্রিয় অঙ্গ হচ্ছে লোকসংগীত বা লোকগান। লোকসংগীতে বাংলার লোকসংস্কৃতির ভাণ্ডার যেমন সমৃদ্ধ ও পরিপূর্ণ ঠিক তেমনি আদিবাসীদের লোকসংগীতও বৈচিত্র্যময়, নান্দনিক ও ঋদ্ধ। লোকসংগীতে সাধারণত মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, প্রেম-ভালোবাসা, বিরহবেদনা ও সুখ-দুঃখের কাহিনি বিধৃত হয়। সংগীত তাই মানুষের জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বহু লোকসংগীতের কোনো গীতিকারের সন্ধান মেলেনি। কোনো কোনো গান আখ্যানভিত্তিক, ছন্দময় এবং সুকোমল সুরবিন্যাসে গাওয়া। এই লোকসংগীতের মূল বৈশিষ্ট্য হলো : অনুশীলনের কোনো বিধিবদ্ধ ব্যবস্থা নেই। স্বভাব দক্ষতাই হলো গায়কের বৈশিষ্ট্য। কেবল কানে শুনেই এ সংগীত লোকের মুখে মুখে প্রচলিত। সাধারণত এজাতীয় সংগীতের কথা বা বাণী গায়কের নিজের মুখে মুখে রচিত। তাই এ গানের মধ্যে কোনো কৃত্রিমতা নেই। সামাজিক জীবনের জন্য বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে এ সংগীত বৈচিত্র্যময়। এ সংগীত বিষয়, ভাব, রস আর সুরের দিক দিয়ে অত্যন্ত সমৃদ্ধ। এ জেলায় রয়েছে বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীর নানামুখী সাংস্কৃতিক জীবন। আদিবাসীদের বৈচিত্র্যময় জীবনধারা ও বৈচিত্র্যময় নান্দনিক সংস্কৃতি দেশের মূলধারার সংস্কৃতির একটি অনুপম সংযোজন।

১. খুমী লোকসংগীত

গানের কথা

কাম থাং থাং লে ময় পুই ই
যাই উং আঁটেং আমু ওয়ই
কাম থাং থাং লে ময় পুই ই
যাই উং আঁটেং আম পো ওয়ই
রি রুং তাবেং সিনা আতাং তাবেং সিনা
মি ওয়াই লাম য়ি তেউ বা
আমসো লামরি নি পৈ
সা খাং লামরি লাং অ্।

অনুবাদ

বিখ্যাত পর্বত শৃঙ্গের যে মানবীরা রয়েছে নিভৃতে
বিখ্যাত পর্বত চূড়ায় যে মানবেরা রয়েছে নিরালায়

সবাই এক সাথে থাকি মোরা ।
একতা থাকার বিধান
মানবজাতির রীতি
এই অঙ্গিকার নিয়ে মোরা
এগিয়ে যাবো আজীবন ।

ঘুম পাড়ানি গান (খুমী)

আমু আমপো মা চে য়ো?
উলি কেও তাই তে
উলি কেও তাই খালৈ
আতি হাই না ?
উলি তেং ওয়াং চেনা
তুই চো আমনি ভো চে খালৈ
আতি হাই না ?
খুমী চৈ কো হাই না
খুমী চৈ কো হ্লা লৈ আতি হাই না ?
খু নৈ লেং তাই য়া
ছি কাই নয় লেং খি য়াই ।

অনুবাদ

তোমার মা-বাবা কোথায় গেছে?
সাদা ইঁদুরের গর্ত খুঁড়তে গেছে।
সাদা ইঁদুর দিয়ে
কি করবে?
ইঁদুর দিয়ে জিনিস কিনবো।
তারপর বোন ও পিসির কাছে বেড়াতে যাবো
বোন-পিসির কাছে গিয়ে
কি করবে?
গুলি খুঁজবো।
গুলি দিয়ে কি করবে?
অরণ্য মানবী
বাঘিনীকে মারবো।

২. ম্রো লোকসংগীত

ম্রোদের লোকসংগীত মূলত কবি গানের মতো। প্রতিটি গানই অতি দীর্ঘ হওয়ায় ম্রো লোকসংগীতকে মহাকাব্যের মতোই মনে হয়। একবার শুরু হলে সহজে শেষ হয় না। 'প্লংরাও মেং' লোকসংগীতটি ১০-১২ লাইনে লেখা হলেও শুধুমাত্র সংগীতের ভাবের সূচনাটা উপস্থাপন করা হয়েছে। এগুলো শেষ হতে প্রায় ঘণ্টাখানেক সময়ের প্রয়োজন হয়। এর কারণ ম্রো সমাজে প্রতিটি গানে একটা করে উপমা দিয়ে গাওয়া হয়। এখানে একটা 'প্লংরাও মেং' (ভালোবাসার গান) দেওয়া হলো। এ গানে এক দুঃখিনী নারীর ব্যর্থজীবনের অতৃপ্তি ও বেদনার কথা বলা হয়েছে। মা-বাবা, ভাই-বোন নিয়ে পূর্ণাঙ্গ একটি পরিবারে সে বেড়ে উঠতে পারেনি বলে তার মনে জন্ম নেয় অতৃপ্তি বেদনা। কাহিনিটি এভাবে সূত্রপাত হয় : জন্মের পরপরই তার মা-বাবা মারা যায়। সে তার মামার বাড়িতে বড় হয়। কিন্তু মা-বাবা নেই বলে তাকে কে বিয়ে করবে? তার মাংতাং (পনের টাকা) কে দেবে? দুটি শূকর দিয়ে তাকে শ্বশুরবাড়িতে কে দিয়ে আসবে? কারণ ম্রো সমাজে কনের পিতা অথবা ভাই কনেকে কনের শ্বশুরবাড়িতে দিয়ে আসতে হয়। আর বরের পক্ষ থেকে পাওনা কনের পনের টাকা কনের পিতা অথবা ভাই কনের শ্বশুরের কাছ থেকে গ্রহণ করতে পারবে। গানে এক দুঃখিনী কনের ব্যর্থজীবনের অতৃপ্তি ও দুঃখ-বেদনার কথা নিহিত রয়েছে। এজাতীয় গান ম্রো যুবক-যুবতীরা 'চাম্পুয়া' (আড্ডা আসর) আসরে পরিবেশন করে থাকে। এ গান 'রিনাপ্লুং' বাজিয়ে পরিবেশন করা হয়।

কথা

ক্রুকপাও দি দুনিপ্রেন কই
সংতই রুরাম সঙদা সু-সম লাইনম
মোনাম উতাং নাম উপ্য তুংকেং দই
মোনাম পাতাং নাম পাপ্য তুংকেং দই
নাম উ রিংলত নাম পা রিংলত
সং কদ্য কমক্লক তিংপুক
মাছং লক রোয়া দই।
মোক্লাং থিরুই মোক্লাং থিপং
তাইসিন খম প্য
নিদং তাপং সেটসী কিয়ংরেং ইয়া
তুম ক্লাংথী নিয়ং ক্যাং
পা লাংথাক তিং রিয়া তা
রিয়াসং বনলন।

অনুবাদ

মহানন্দ সুন্দর এ ভুবনে
ভূমিষ্ট হয়েছি আমি অনুতপ্ত হয়ে
জন্মের পর মা-বাবার মুখ দেখিনি
জনমদুঃখী মাতৃহারা আমি;
পিতৃহারা এক দুঃখিনী কন্যা।
মানুষ বলে ভাবেনি কেউ আমায়
মানুষ বলে গণ্য করেনি আমাকে,
ভাইয়ের স্নেহ বোনের ভালোবাসা
এক দুপুরেই হনন করেছে অপদেবতারা
সেতো, সেই বহুকাল আগে।
তাইতো তুমিও আমায় দেখে
আঁড়ি পেতেছো বারবার
পাশ কাটিয়েছো অনন্তকাল।

৩. খিয়াং লোকগীতি

বেরেক চও থ্রহোমও
লুংখিং লুংখিয়াং নেমেই ন তি-এই
তেকতেলেন লা থিং পোক স্ চে
কেইবে লেক চলা হেউ সুই সতিং কিখিন নু
সুগ্লু সেই অং চং ফোই বে-ই
লংবয়হ্ থ্রাওং চং হো বে-ই
সকি খো ওং চং চেল বে-ই
অঙ তেউয়া বেন লু-আক হইহ্
উই থেই তেউয়া ওং পুমাক হইহ্
গুসিম তেউয়া লানসু তেউয়া
লুখিং লুখিয়াং নেত্রে ন্ তি-এই।

অনুবাদ

জ্যোৎস্নার আলোর মতো ভাই আমার
একা একা তুমি রয়েছো
কাঠঠোকরা পাখির কাঠ ঠোকরানো শব্দ
মনে হচ্ছে বনে তুমি লাকড়ি সংগ্রহ করছো।

আমলকীর পাতায় ধানগুলি শুকোতে দিও
পাখির পালক দিয়ে ধানগুলি ঝেড়ে নিও
হরিণের মতো পাগুলি নেড়ে যেও
কাকের ঝাঁকের মাঝে একটি বকের মতো
শিকারি কুকুর মাঝে একটি বানরের মতো
নির্জন পাহাড়ের শত্রুর মতো
একা একা রয়েছো তুমি।

৪. পাংখোয়া লোকসংগীত

রং খোয়াল লুং দি, কানান তং জান নেই...
মেল কিন ভু আ, নাং নি মেল কিন ভু
নাং নি মেল তৌ পার ইন রা হোয়াই,
পারতিন রা হোয়াই, লিয়া ভোয়াই ও এইই
লিয়ান ভোয়াই ও চো নিল বেই কা সন,
নিল লৌ খম্ সে, কা নিল খাম চাং সে
নি হুক লাই আম রেল নি জান না,
চাল ভম্ হোক লাই আন রেল ইন জান নেই...

মর্মার্থ

পরদেশি অচেনা যুবকরূপে
অতিথির ছদ্মবেশে আজ সন্ধ্যায়
তোমার ঘরে বেড়াতে আসবো...
তুমি আমায় চিনতে পারবেতো রূপসী?
আমাকে চিনতে পার বা নাই পার
আমার কিছুই যায় আসে না।
শুধু আমি আজ তোমাকে পেতে চাই! চাই!!
ফুলের মতো সুন্দর তোমার রূপ
এই অপরূপ রূপ যেন সারাজীবন অমর হয়ে থাকে।

৫. বম লোকসংগীত

'Nan duh thu sim lah u, Nun duh la sak u, অর্থাৎ : 'মিনতি করি কহিও না কথা, গাহিও গান পরান ভরিয়া।' এটি একটি প্রাচীন গাথা। বম আদিবাসীদের সমাজজীবনে তাই এতো গান। এমন কোনো লৌকিক উৎসব আচার-অনুষ্ঠান নেই যেখানে নৃত্যগীত নেই। প্রাত্যহিক জীবনের সুখ-দুঃখ, প্রাণের আর্তি, বিরহব্যথা, দৈনন্দিন জীবন সমস্যা,

সমাজের মানুষের মনের কথা, প্রেম-ভালোবাসা, মনের আশা-আকাঙ্ক্ষা সমস্তই প্রকাশ পায় লোকসংগীতে। প্রেমিক-প্রেমিকার বিরহবেদনা, প্রেম-অনুরাগ, সখ্যতা আদান-প্রদান হয় সুরের মাধ্যমে। *'রিরৎ'* (এক প্রকার এক তারা), *'মিমীম'* (ধানের নাড়া দিয়ে তৈরি বাঁশি) আর *'জলপাল'* (এক প্রকার বাঁশি) বাঁজিয়ে যে সুর সৃষ্টি হয় তাতে বিরহবেদনা ও বিচ্ছেদের ব্যথা মূর্ত হয়ে ফুটে ওঠে। কথা নেই আছে শুধু সুর।

বিয়ের গান (Lawi la) : বিবাহ উৎসবে বিভিন্ন গীত পরিবেশন করা হয়। নিম্নে একটি বিয়ের গান দেয়া হলো–

বম ভাষা

নেম জিয়ার মার লেইলাক বাক আ টুম্
টুয়ান্দ ঃ সেনচিয়ার নু তুসুন চু
আ লুং তুম বালপা রুন ইন সুং
টুয়ান রেল লাই কা রেল লাই আতি।
ওম বাং অ্যাই রুয়াং খাত ওম উ ল
ফাং বাং অ্যাই কাওখাত ওম উ ল
দঃ তে নান রুন টুয়ান রেল উ ল।
আ কে কার দিনয়িান আ ময়ে
অয়বিয়ল ঠিলাই তৱা আ নঙা ঃ
সেই তিম আ হয়নু লু চুঙা ঃ
আ কম রুয়াল নিঃআ দুং আন্ জুল।
আ দুং মায়া রেল নু রেল পা
আ লাইয়া সেন চিয়ারনু মৌনু
আ দুঃবালপা ইনলেই আ লয়ে।

অনুবাদ

ধীর পায়ে সিঁড়ি বেয়ে নামে ঐ রূপসী কন্যা
চলিছে আজি রিনিঝিনি
বাঁধিবারে ঘর প্রাণবন্ধুর।
লাউ যেমন ধরে এক লতায়
ধান যেমন আসে এক শীষে
বাঁধিয়ো ঘর এক হৃদয় বৃন্তে।
চরণ ফেলিয়া যায় কন্যা ধিকি ধিকি
জোড়া পুঁতির মালা গলায় ঝনঝনিয়ে
পিছে পিছে তার সঙ্গী সখির দল
আগে সখা পিছে সখা
মধ্যে রূপকন্যা রূপখানি মেলিয়া
চলিছে আজি মন মানুষের কাছে।

৬. মারমা লোকগীতি

১. কাপ্যা : মারমা সমাজে সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না দিয়ে রচিত কাপ্যা সংগীত। এ লোকগীতিতে মারমাদের অতীত ও বর্তমান জীবনধারা ফুটে ওঠে। মহাপুরুষদের জীবনকাহিনিকে বর্ণনা করে এজাতীয় গান রচিত হয়েছে। এ কাহিনিভিত্তিক কাপ্যার মধ্যে 'পাইংদাইং মাংসা', 'সাইংদ্‌য়েংসু' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এ ধরনের লোকসংগীত সাধারণত গ্রাম অঞ্চলে বেশি প্রচলিত। মারমারা কাজ করার সময় এবং শিশুকে ঘুম পাড়ানোর সময় কাপ্যা লোকগীতি গেয়ে থাকে। আবার অনেক সময় প্রতিযোগিতামূলক কাপ্যা গাওয়া হয়। তখন যুবক-যুবতীরা পরস্পরের সৌন্দর্যের বর্ণনা করে প্রশংসামূলক কাপ্যা গেয়ে থাকে।

২. সাইঙগ্যাইত্ : এগুলো মারমাদের এক প্রকার দলীয় লোকসংগীত। বিভিন্ন উৎসবে মারমারা নারী-পুরুষ দলগতভাবে এ গান পরিবেশন করে। জারিগানের মতোই একজন দলনেতা প্রথমে গান শুরু করে, এরপর তালে তালে একই সুরে ও ছন্দে সমবেতভাবে অন্যরাও ঐ গান গেয়ে যায়। যুবক-যুবতীরা পরস্পরকে প্রশংসা করে অথবা ব্যঙ্গ করে সুরে-ছন্দে এ সংগীত পরিবেশন করে থাকে। এ গানের সাথে 'বুঙ' ও 'পাইত' (এক প্রকার ছোটো ও বড়ো ঢোল) 'চেহ্' (এক প্রকার বাঁশি) ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করা হয়। একদল অন্য দলকে উদ্দেশ্য করে বিভিন্ন ধরনের উপমার বিবরণ দিয়েও এ গান রচনা করা হয়। এই গানের নির্দিষ্ট সুর-ছন্দ রয়েছে। ঐতিহ্যবাহী সাংগ্রাইং-এর অনুষ্ঠান মৈত্রী পানিবর্ষণ অনুষ্ঠানে এই গানটি বেশি গাইতে দেখা যায়। এসময় যুবক-যুবতীরা দলগতভাবে সাঙগ্যাইত্ গেয়ে একদল অন্য দলের যুবক-যুবতীদের পানি বর্ষণের জন্য উৎসাহিত করে এবং নিজেরাও আনন্দ-ফূর্তি করে।

৩. লুংদি : এগুলো মারমাদের একটি দলীয় লোকসংগীত। কোনো একটি দল কোনো প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হলে দলগতভাবে গ্রামের প্রতিটি ঘরে ঘরে গিয়ে লুংদি গীত গেয়ে পুরস্কারস্বরূপ চাঁদা গ্রহণ করে। প্রাপ্ত পুরস্কারগুলো দলের মধ্যে সমানভাবে ভাগ করে নেয় অথবা সবাই মিলে ভোজ খেয়ে আনন্দ-ফূর্তি করে কিংবা ঐ পুরস্কার দিয়ে ক্যাংঘরে প্রয়োজনীয় জিনিস কিনে দান করে। লুংদি লোকসংগীতের একটি নির্দিষ্ট সুর রয়েছে। সিদ্ধার্থের শৈশব, যৌবন এবং গৃহত্যাগের কাহিনি নিয়ে মূলত এ সংগীত রচিত হয়েছে। এ সংগীত এখনো মারমাদের গ্রামে বা পাড়ায় প্রচলিত আছে।

৪. সাখ্রাঙ : এটি মারমাদের কাহিনিভিত্তিক এক ধরনের লোকসংগীত। এ লোকগীতি মারমা গ্রামাঞ্চলে সন্ধ্যাবেলা বা রাতের বেলায় গাইতে দেখা যায়। এটি মূলত গৌতম বুদ্ধের জীবনচরিত ও বুদ্ধত্ব লাভের বিভিন্ন পর্বকে নিয়ে রচিত। যেমন : 'সইতাথানু সাখ্রাঙ', 'ককানু সাখ্রাঙ' ইত্যাদি। বৌদ্ধ জাতক অনুসারে গৌতম বুদ্ধ আগের জন্মগুলোতে মানুষ ও বিভিন্ন প্রাণীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এভাবে বোধিসত্ত্বদের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জীবনকাহিনি নিয়ে এ ধরনের লোকসংগীতগুলো রচিত হয়েছে।

৫. রদুহ্ : ছন্দময় সুকোমল সুর বিন্যাসে এজাতীয় লোকসংগীত গাওয়া হয়ে থাকে। সুখময় জীবন গঠনের শিক্ষা এই লোকসংগীতে রয়েছে। এখানে প্রধানত অতীতের

মহাপুরুষ, ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক গুরু, সুশীল চরিত্রের সমাজ নেতাদের গুণকীর্তন থাকে এবং তাদের জীবন থেকে শিক্ষা নিয়ে সুন্দর ও সৎচরিত্রের জীবন গড়ার ইঙ্গিত থাকে। কোনো কোনো রদুহ্ হচ্ছে নিঃসঙ্গ ভারাক্রান্ত হৃদয়ের গান। এই রদুহ্র সুর যদিও দুঃখজনক তবুও এর সুরে ছন্দেও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রয়েছে এবং এটি চিত্তাকর্ষক।

৭. চাকদের লোকগীতি

নববর্ষকে বরণ উপলক্ষে বাংলাদেশে সব সম্প্রদায়ের লোকদেরই অনুষ্ঠানাদি আয়োজনের ঘাটতি নেই। চাক সম্প্রদায়ের মাঝেও বর্ষবিদায় এবং বরণ এ দুটির জন্য আমেজের স্পন্দন শোনা যায়। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার পোশাক-পরিচ্ছদ, খাওয়া-দাওয়ার ধুমধাম ইত্যাদির কর্মকাণ্ডে তা ফুটে ওঠে। খাওয়া-দাওয়া, এপাড়া-ওপাড়া বেড়ানো, রকমারি অনুষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে নববর্ষের সাংগ্রাইং।

সাংগ্রাইং উৎসবের চাক লোকগান :

চাকভাষা

১. লাইংগা বাইনো নাং ---------(ঐ)
নাং বাইনাকো নিংয়াক
ক্রুকি ক্রুকি মাকতা প্যাগো প্যাকো
ছাংগ্রাই ছাগামাক্---(২)
ছাংগ্রাই হ্রাইনাকো লাইংগা বাইনো
লাইংগা বাইনো নাং ---------(ঐ)
ছাংগ্রাই এগা আস্য আরং লাংমোজিং
মিক চিক্‌তাইক পোওয়াপোজিঙ (২)
স্নিংনেংয়া রিয়াক্ নেংছা
প্যাগাজিক লাইংগা বাইংনো না---(২)
লাইংগা বাইনো নাং ---------(ঐ)

অনুবাদ

নববর্ষ দিনে বেড়াতে এসো
ও প্রিয়, আমার বাড়িতে
তুমি আসলে দু'জনে মিলে
হাসি-খুশি আনন্দে ঘুরবো
আনন্দ করবো এইদিনে
নববর্ষে যেন সুখ শান্তি পাই
এই শুভ দিনে এসো
আমরা আনন্দ করবো।
নববর্ষের দিনে বেড়াতে এসো ---ও প্রিয়।

লোকবাদ্যযন্ত্র

লোকসংগীত, লোকনাট্য ও লোকনৃত্যের বিভিন্ন অনুষ্ঠানেই মূলত লোকবাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করা হয়। তাছাড়াও পাহাড়ি জনগোষ্ঠীদের বিয়ে, মৃত্যু ও অন্যান্য অনুষ্ঠানেও লোকবাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর অনেক ধরনের বিচিত্র ও আকর্ষণীয় লোকবাদ্যযন্ত্র রয়েছে। এসব বাদ্যযন্ত্রের প্রায় সবগুলোই স্থানীয়ভাবে পাহাড়ি জনগোষ্ঠীরা তৈরি করে থাকে। বাদ্যযন্ত্রের নির্মাণ, মেরামত সবকিছুই স্থানীয় লোকেরা করে থাকেন

ম্রো লোকবাদ্যযন্ত্র

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বা অন্যান্য অনুষ্ঠানাদির আয়োজনের জন্য কতগুলো লোকবাদ্যযন্ত্রের প্রয়োজন রয়েছে। ম্রোদের লোকবাদ্যযন্ত্রের মধ্যে প্লুং (বাঁশি) বিশেষ উল্লেখযোগ্য :

১. প্লুং (বাঁশি) : ম্রো সমাজের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় ও জনপ্রিয় লোকবাদ্যযন্ত্র হলো প্লুং (বাঁশি)। গো-হত্যার অনুষ্ঠানে নৃত্যের জন্য এ বাদ্যযন্ত্র অত্যাবশ্যকীয়। তাছাড়া গান করার সময় 'রিনা প্লুং' নামে এক প্রকার বাঁশি বাজানো হয়। জঙ্গলের ডলু বাঁশ ও 'সাঙ্কু' নামে এক প্রকার 'পামজাতীয় গাছের বাকল দিয়ে এই প্লুং তৈরি করা হয়। সাঙ্কু শালকে রৌদ্রের মধ্যে শুকিয়ে ধারালো ছুরি দিয়ে কেটে হারমোনিয়ামের 'রিদ' আকারে প্রথমে রিদ তৈরি করা হয়।

তারপর শুকনা ডলু বাঁশের একপ্রান্তের ছিদ্রে মোম দ্বারা আটকিয়ে রাখা হয়। অতপর তিঁতা লাউয়ের খোলসের ভেতরে রিদ লাগানো বাঁশের নলিগুলো ঢুকিয়ে মোম লাগিয়ে প্লুং তৈরি করা হয়। লাউয়ের মুখে ফুঁ দিলে ভেতরে বাতাস প্রবেশ করে। এই বাতাসে রিদ-এর কম্পন হলে শব্দ সৃষ্টি হয়। যে কেউ ইচ্ছা করলে প্লুং তৈরি করতে পারে না। এ প্লুং তৈরি করতে হলে সুদক্ষ কারিগরের প্রয়োজন।

২. প্লাই প্লুং (নৃত্যের বাঁশি) : এজাতীয় বাঁশি শুধু গো-হত্যার অনুষ্ঠানে নৃত্য পরিবেশনকালে ব্যবহৃত হয়। প্লাই প্লুং-এর এক সেটে থাকে ২০-২৫টি বাঁশি। এক সাথে যখন এই বাঁশিগুলো বাজানো হয় তখন পাহাড়ি নির্জন বনভূমি এই বাঁশির আওয়াজে মনে হয় কেঁপে ওঠে। এজাতীয় বাঁশি বাজানো হয় তাল সৃষ্টির মাধ্যমে। এই বাঁশির তালে তাল মিলিয়ে ম্রো মেয়েরা নৃত্য পরিবেশন করে।

৩. রিনা প্লুং (কলেরা বাঁশি) : এই বাঁশি শুধু গানের আসরে বাজানো হয়। এই বাঁশি আবিষ্কারের পেছনে একটি কিংবদন্তি কাহিনি রয়েছে। ম্রো সমাজে আদিকালে রিনা প্লুং প্রচলন ছিলো না। তিংতে এবং ত্র নামে বাদ্যযন্ত্র দিয়ে তখন গান পরিবেশন করা হতো। প্রবীণদের বিস্তৃত বচন থেকে জানা যায় যে, ১৯৪৫ সালে ২য় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে ম্রো অধ্যুষিত অঞ্চলে কলেরা মহামারীর প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়। তখন বহু ম্রো কলেরা রোগে

মারা যায়। সেই সময়ে রিংক্লাং নামে এক ম্রো যুবকও কলেরা রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। তার মৃতদেহ সৎকারের জন্য শ্মশানে নিয়ে যাওয়ার পথে সে আলৌকিকভাবে পুনর্জীবিত হয়ে ওঠে। পুনর্জীবন ফিরে পেয়ে তার বেঁচে ওঠার কাহিনি সকলের সামনে এভাবে বর্ণনা করলো : "আমি যখন মৃত্যুবরণ করেছিলাম তখন সবকিছু যেনো স্বপ্নের মতো মনে হয়েছে। আমি সমুদ্র পাড়ে একা একা দাঁড়িয়ে কাদের জন্য যেনো অপেক্ষা করছিলাম। তাকিয়ে দেখলাম আশপাশে কোনো মানুষ নেই। তারপর হঠাৎ দেখতে পেলাম দূর থেকে একটি জাহাজ আমার দিকে ছুটে আসলো। নিকটে গিয়ে দেখি, জাহাজের ভেতর অনেক লোক। বয়সে সবাই তারা আমার সমবয়সী তরুণ-তরুণী। সবার পরনের পোশাক ছিল সাদা রঙের। কেউ গান গাচ্ছে, কেউ বাঁশি বাজাচ্ছে, কেউবা আবার হাসি-ঠাট্টা করছে। এক ব্যক্তি আমাকে তাদের জাহাজে উঠিয়ে নিলো এবং সে আমাকে এক প্রকার বাঁশি দিলো। আর বাঁশিটা কিভাবে বাজাতে হয় তাও সে আমাকে শিখিয়ে দিলো। অদ্ভুত সেই বাঁশির সুর। যার সাথে জীবনে কোনো দিন আমার পরিচয় হয়নি সে এই অদ্ভুত বাঁশিটি আমাকে দিলো। আমি ওর কাছে বাঁশি বাজানো শিখে ফেললাম। জাহাজের ভেতর এতই লোক ছিল যে, যৎসামান্য বসার স্থান বন্দোবস্ত করার কোনো জো ছিলো না। তবু জাহাজের পাতাটনকে আকঁড়ে ধরে বসেছিলাম এমন সময় হঠাৎ আমার পা ফসকে গিয়ে পড়ে গেলাম অথৈ সমুদ্রের জলে। মনে হলো যেনো ঘুম থেকে জেগে উঠেছি। আমি চোখ খুলতেই দেখি আপনারা আমাকে শ্মশানে নিয়ে যাচ্ছেন।" রিংক্লাং-এর সমস্ত কথা সবাই অবাক বিস্ময়ে শুনলো। জীবন ফিরে পাওয়ায় রিংক্লাংকে আর দাহ করা হলো না। বাড়ি ফিরে এসে রিংক্লাং স্বপ্নে জাহাজের ভেতর পাওয়া সেই অদ্ভুত বাঁশিটি তৈরি করে ফেললো। যার কারণে এ বাঁশির নাম 'রিনা প্লুং' অর্থাৎ কলের বাঁশি। রিনা অর্থ–কলেরা আর প্লুং অর্থ–বাঁশি। এই বাঁশি শুধু গানের আসরে বাজানো হয় আর আনন্দঘন মুহূর্তে যুবক-যুবতীরা এ বাঁশি বাজায়।

ম্রোদের ঐতিহ্যবাহী বাঁশি

৪. তম্মা : তম্মা মানে ঢোল। দুই হাত লম্বা একটুকরা কাঠ কেটে গোলাকার করে ছেঁচে নেওয়া হয়। এরপর গোলাকার কাঠের টুকরা উভয় মুখ বাটালি দিয়ে কেটে ভেতরে ফাপা করা হয়। এরপর উভয় মুখে পশুর চামড়া এঁটে দিয়ে তম্মা বানানো হয়।

৫. পুরুই : পুরুই হলো বাঁশের বাঁশি। ভলু বাঁশের লম্বা নলে একপ্রান্তে চার আঙ্গুলের ব্যবধান রেখে ছিদ্র করা হয়। এই ছিদ্রের বরাবর বাঁশের নলীর ভিতর মৌমাছির মোম দিয়ে আঁটকানো হয়। এরপর এই ছিদ্র থেকে আবার ৫ আঙ্গুল ব্যবধান রেখে দুই আঙ্গুল পর পর ছয়টি ছিদ্র রাখা হয় যাতে বাঁশির সুরের স্বরলিপি তোলা যায়।

মারমাদের লোকবাদ্যযন্ত্র

১. বুঙ : মারমাদের নিজস্ব তৈরি ছোটো আকারের এ ঢোলকে মারমারা বুঙ বলে। এগুলো লম্বা প্রায় ১০ ইঞ্চি ও প্রস্থে ৭ ইঞ্চি হয়ে থাকে। মারমারা যে কোনো অনুষ্ঠানে এই বাদ্যযন্ত্রটি অন্যান্য বাদ্যযন্ত্রের সাথে বাজিয়ে থাকে। কাঠ ও পশুর চামড়া দিয়ে মারমা কারিগররা এ বুঙ তৈরি করে। এই বাদ্যযন্ত্রের নির্মাণশৈলী অত্যন্ত চমৎকার ও এ বুঙ বেশ মজবুত হয়ে থাকে।

২. পেহ্ : এই বাদ্যযন্ত্রটি বুঙ এর চেয়ে আকৃতিতে বড়ো। এগুলো এক প্রকার ঢোল। সাধারণত পেহ্ দুই ফুট লম্বা ও এক ফুট চওড়া হয়ে থাকে। হাতের পরিবর্তে কাঠি দিয়ে মারমা বাদকরা এই পেহ্‌তে ঢোলের বোল তোলে। এই বাদ্যযন্ত্রটি কাঠ ও পশুর চামড়া দিয়ে মারমারা তৈরি করে।

৩. ক্রি-চয় : মারমাদের ঐতিহ্যবাহী বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে ক্রি-চয় অন্যতম। এগুলো কাঠ ও কাঁসা দিয়ে তৈরি করা হয়। কাঠের একটি গোল চাকতির উপর ১৫-২০টি তার যুক্ত করা থাকে। দুটি কাঠের কাঠির সাহায্যে এজাতীয় বাদ্যযন্ত্রের সুর তোলা হয়।

৪. খ্রে খ্রং : এগুলো বাঁশের ফাল থেকে তৈরি করা হয়। সাধারণত ৪-৫ ইঞ্চি লম্বা হয়। পাতলা বাঁশের ফালের মধ্যম অংশ সরু চিকন একটি অংশ রেখে দু'দিকে কেটে ফেলা হয়। বহির অংশ চিকন অংশের সাথে অবিচ্ছিন্ন থাকে। এগুলো মুখের শ্বাস-প্রশ্বাস দিয়ে বাজাতে হয়। এটিতে অত্যন্ত মিষ্টি ও মিহি সুর সৃষ্টি হয়। সহজে বহনযোগ্য ও সুরের আওয়াজ ছোটো বলে যুবক-যুবতীদের মধ্যে এর কদর বেশি।

৫. হ্নী : এগুলো এক প্রকার বাঁশি। অনেকটা ক্লেনেট এর মতো। তবে ফুঁ দেওয়া জায়গাটি আকারে ছোটো হয়। অপর অংশের কলকির মতো চোঙাটি হ্নী-এ নীচে ঝুলানো থাকে। এগুলো বাজানোর সময় সামান্য দোল দেয়, ফলে সুরের ব্যঞ্জনা পরিলক্ষিত হয়।

৬. ড্রুংখ্লং : এগুলো তৈরি করতে বড়ো বাঁশের গীটের উভয় প্রান্ত থেকে কেটে ফেলা হয় এবং গীটের অন্ত অংশে বাঁশের ভিতর খোল পর্যন্ত কেঁটে ফেলা হয়। ফালটা কাটার উপর নির্ভর করবে এই যন্ত্রের সুর বা আওয়াজ। এগুলো দু'হাতে দুটি কাঠি দিয়ে বাজাতে হয়।

৭. টুংখং : এগুলো ভুংখ্লং এর মতো। তবে এটি গাছ দিয়ে তৈরি হয়। বাঁশের খোল অংশ করার জন্য গাছকে বাটালি দিয়ে খোল করা হয়। খোলের আকারের উপর এর আওয়াজ নির্ভর করে। ইহা বিপদসংকেত হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

৮. লাক্ খু/ওয়ালাক্ খোওয়া : এগুলো বড়ো বাঁশের তৈরি। সাধারণত ৩-৪ ফুট লম্বা হয়। বাঁশের খোলের অংশ যত বড়ো হবে তত শব্দ বা আওয়াজ হবে। ঠোঁট দিয়ে বাজাতে হয়।

৯. পাইক্তালাহ/ওয়াইখ্রাইক : শুকনা বাঁশের ফাল দিয়ে এই বাদ্যযন্ত্র তৈরি করা হয়। এই ফালগুলো একটির সাইজ থেকে অন্যটির সাইজ একই রকম নয়। গাছের তক্তায় এমনভাবে বসানো হয় একটির শব্দের সাথে অন্যটির মিল নেই। তবে এই শব্দগুলো যাতে ধারাবাহিক থাকে সেভাবে তৈরি করা হয়। কাঠি দিয়ে বাজাতে হয়।

১০. সাইংজুওয়ে : এগুলো পিতলের তৈরি। অনেকটা শিংওয়ালা গরুর মাথার মতো। মধ্য অংশে রশি দিয়ে ঝুলানো হয়। শিং-এর মতো অংশ কাঠি দিয়ে বাজানো হয়। এই সইংজুওয়ে-এর ছোটো বড়োর উপর নির্ভর করবে এর শব্দ ও আওয়াজ।

১১. জোঃরওং : এগুলো পিতলের তৈরি এক প্রকার বাদ্যযন্ত্র। থালার মতো বড়। ভেতর অংশ খোলা। এগুলো দুটি অংশ খোল কেন্দ্রের দুই অংশে দুটি বড়ো ও শক্ত সুতা দিয়ে বেঁধে হাতে ধরার উপযোগী করা হয়। দুই হাতে দুটিকে মুখোমুখি করে বাজানো হয়। খোলের পরিমাণের উপর নির্ভর করে শব্দ বা আওয়াজ হয়।

ত্রিপুরা লোকবাদ্যযন্ত্র

১. শিমুর : এগুলো ত্রিপুরা আদিবাসীদের ঐতিহ্যবাহী বাঁশি। বাঁশের তৈরি সাধারণ বাঁশির চেয়ে এগুলো কিছুটা দীর্ঘাকৃতি হয়ে থাকে এবং অধিক ছিদ্রযুক্ত হয়ে থাকে। ত্রিপুরারা তাদের ঐতিহ্যবাহী গরাইয়া নৃত্যে এবং বিভিন্ন পূজা-পার্বনে এই শিমুর বাজিয়ে থাকে। বাদকরা এই শিমুর চমৎকার সুর তুলে শ্রোতাদের সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

২. খাইং : এগুলো ত্রিপুরা আদিবাসীদের এক প্রকার ঢোল। এই ঢোল সাধারণত দৈর্ঘ্যে দুই থেকে আড়াই হাত এবং প্রস্থে এক হাতের বেশি হয়ে থাকে। বড়ো এক খণ্ড গামার গাছকে মাঝখানে ছিদ্র বা খোদাই করে ফাঁকা করা হয়। দু'প্রান্তে পশুর চামড়া টানিয়ে বন্ধ করে ত্রিপুরারা তাদের কারিগরি দক্ষতায় এজাতীয় ঢোল তৈরি করে।

৩. খা-অম : এগুলো খাইং-এর মতো ত্রিপুরাদের ঐতিহ্যবাহী ঢোলজাতীয় বাদ্যযন্ত্র। অনেক সময় ঢোলবাদক হাতের পরিবর্তে বাঁশের কঞ্চি বা কাঠের কাঠি দিয়ে খা-অম বাজিয়ে থাকে। এগুলো কাঠ এবং পশুর চামড়া দিয়ে তৈরি। এগুলো গরাইয়া পূজা ও মৃতসৎকার অনুষ্ঠানে বাজানো হয়ে থাকে।

৪. ফকির দাঙ্গাইস : ত্রিপুরা আদিবাসীদের ঐতিহ্যবাহী একতারাজাতীয় একটি বিশেষ বাদ্যযন্ত্র। কাঠ খোদাই করে সাধারণত একতারার মতোই এই বাদ্যযন্ত্রটি তৈরি

করা হয়। বাদ্যযন্ত্রটির ঠিক মাঝখানে একটি তার লম্বালম্বিভাবে স্থাপন করা হয়। উক্ত তারে কাঠি বা হাত দিয়ে সুন্দর সুন্দর সুর তোলা হয়।

৫. সেঁদা : ত্রিপুরাদের নিজস্ব কারিগরি দক্ষতায় নির্মিত এই ঐতিহ্যবাহী বাদ্যযন্ত্রটি একটি ব্যতিক্রমধর্মী গিটারবিশেষ। সাধারণত ২-৩ হাত লম্বা ও দেড় হাত চওড়া একখণ্ড কাঠকে খোদাই করে এই বাদ্যযন্ত্রটি তৈরি করা হয়। ফাঁকা স্থানটিকে চামড়া দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়। এতে তিনটি তার সংযুক্ত করা হয়। বাজানোর পদ্ধতি সাধারণ গিটারের মতোই।

৬. চং প্রেই : এজাতীয় বাদ্যযন্ত্র ত্রিপুরার বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ব্যবহার করে থাকে। প্রায় আড়াই হাত লম্বা কাঠকে সুন্দরভাবে খোদাই করে গিটারের মতোই তিনটি তার যুক্ত করে এই বাদ্যযন্ত্রটি তৈরি করা হয়। এই বাদ্যযন্ত্রের প্রথম তারটি দিয়েই বেশি সুর তোলা হয়। প্রথম তারটির নীচে ৫টি ছোটো কাঠি মোম দিয়ে আঁটকিয়ে রাখা হয়।

বম লোকবাদ্যযন্ত্র

১. খোয়াং (ঢোল) : এগুলো কাঠ ও চামড়া দিয়ে তৈরি করা হয়। গামারি কাঠকে শুকিয়ে মাঝখানে ফাঁকা করা হয়। তারপর ফাঁকা করা কাঠের দু'মুখে পশুর চামড়া দিয়ে বন্ধ করে ঢোল তৈরি করা হয়। এগুলো দৈর্ঘ্যে দুই হাত হয়ে থাকে।

২. ডারসন (কাসার থালা) : এই বাদ্যযন্ত্রটি একপ্রকার কাসার থালা। তবে বমদের বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে বিশেষ করে শোকের সময় শোক প্রকাশ করতে এই বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

৩. রিরৎ (একতারা বিশেষ) : তিতা লাউয়ের খোলকে মাঝখানে কেটে ফালি করা হয়। এরপর এক প্রকার জঙ্গলা পামজাতীয় গাছের আঁশ তার হিসেবে ব্যবহার করে টানানোর পর রিরৎ তৈরি করা হয়।

৪. মিমিম (বাঁশি) : এই বাদ্যযন্ত্রটি ধানের নাড়া দিয়ে তৈরি করা হয়। ধান কাটার পর ধানের নাড়াকে উভয় প্রান্তে গিরা রেখে কেটে বিশেষ কারিগরি দক্ষতায় এ মিমিম তৈরি করা হয়। নাড়ার মাঝখানে অতি সূক্ষ্মভাবে ধারালো ছুরি দিয়ে কেটে এক প্রকার রিদ তৈরি করা হয় আর একপ্রান্তে মুখে ফুঁ দিয়ে বাতাস ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। এই বাতাসে বাঁশির রিদকম্পন সৃষ্টি হলে বাঁশির আওয়াজ বের হয়।

৫. দারখোয়াং (কাসার ঘণ্টা) : এই বাদ্যযন্ত্রটি অধিকাংশ আদিবাসীদের কাছে দেখা যায়। এগুলোকে বড়ো ধরনের কাসার ঘণ্টাও বলা যায়। বম আদিবাসীরা কোনো শোক অনুষ্ঠানে এই বাদ্যযন্ত্রটি বাজিয়ে শোকসন্তপ্ত পরিবারকে সমবেদনা জানায়।

৬. সিয়াকিরদেং (শিং) : এই বাদ্যযন্ত্রটি গয়ালের শিং। শিং-নৃত্যানুষ্ঠানে বাজনা হিসেবে এই শিং ব্যবহার করা হয়। শিং-নৃত্যে শিকারি যখন কোনো শিকার পায় তখন

শিকার করা জন্তুর মাথার খুলি মাঝখানে রেখে তার চারপাশে এই শিং ঠুকাঠুকি করে আওয়াজ তোলে। নৃত্যশিল্পীরা তাল মিলিয়ে নৃত্য পরিবেশন করে।

৭. পোলাং (বাঁশি) : এগুলো বাঁশের তৈরি এক প্রকার বাঁশি। বাঁশ দিয়ে এই বাঁশি তৈরি করা হয়। এটি সাধারণ বাঁশির মতো।

৮. জলপাল (বাঁশি) : এগুলোও এক প্রকার বাঁশি। তবে এগুলো ডলু বাঁশ দিয়ে বৃহৎ আকারে তৈরি করা বাঁশি। এই বাঁশি যখন বাজানো হয় তখন নিস্তব্ধ বনভূমিতে এক গম্ভীর পরিবেশের সৃষ্টি হয়।

৯. তিংখ্রাং : এগুলো বাঁশের তৈরি দোতারা। বাঁশের মাঝখানের অংশ থেকে ছুরি দিয়ে চিকন সুতার মতো করে বের করে নিয়ে ছোটো কঞ্চি দিয়ে উঁচু করা হয় যা গিটারের স্ট্রিং-এর মতো বাজানো হয়।

১০. থেইখাং : এই লোকবাদ্যযন্ত্রটি একপ্রকার সাধারণ বাঁশি এই বাঁশিটি বাঁশ দিয়ে তৈরি

খুমী লোকবাদ্যযন্ত্র

১. তেওতেং : এগুলো বাঁশের তৈরি এক প্রকার বাদ্যযন্ত্র। মিতিঙ্গ্যা বাঁশের চামড়া থেকে ছুরি দিয়ে মসৃণভাবে কেটে ছয়টি তার তৈরি করা হয়। এর দৈর্ঘ্য সাধারণত এক থেকে আড়াই হাত লম্বা হয়। এই বাদ্যযন্ত্রটি খুমীরা বিভিন্ন গানের সাথে বাজিয়ে থাকেন।

২. আলুং : জুমের উৎপাদিত তিঁতা লাউয়ের খোল দিয়ে এই বাদ্যযন্ত্রটি তৈরি করা হয়। এই বাদ্যযন্ত্রটি খুমীদের গো-হত্যানুষ্ঠানে (আরেং চাইনা') বাজানো হয়। তিঁতা লাউয়ের খোলকে মাঝখানে ছিদ্র তৈরি করে সেই ছিদ্রের ভেতর বাঁশের একপ্রান্তে 'রিদ' লাগানো বাঁশের পাইপ ঢুকিয়ে মোম লাগিয়ে দেওয়া হয়, লাউয়ের খোলসের মুখে ফুঁ দিলে যাতে বাতাস বের না হয়। তাই যখন লাউয়ের মুখে ফুঁ দেবে তখন ফুঁ-এর বাতাসে বাঁশের আটকানো রিদ বেজে উঠে শব্দ উৎপন্ন হয়।

৩. পিপিং/আতং : এই বাদ্যযন্ত্রটি হলো ঢোল। এই ঢোলকে অঞ্চলভেদে খুমীরা বিভিন্ন নামে অভিহিত করে। অনেকে পিপিং আর আবার অনেকে আতং বলে। প্রথমে গামারি গাছকে দৈর্ঘ্যে ২ হাত লম্বা করে কেটে মাঝখানে ফাঁকা করে খোদাই করা হয়। এরপর দুইপ্রান্তে পশুর চামড়া দিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হয়। এই বাদ্যযন্ত্রটি বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ব্যবহার করা হয়। আরেং চাইনা (গো-হত্যা) অনুষ্ঠানে এবং মানুষের মৃত্যুর সময় এই ঢোল বাজানো হয়।

৪. ত্রো : এই বাদ্যযন্ত্রটি একপ্রকার বেহালা। একটুকরা গাছকে মাঝখানে খোদাই করে দুটি তামার তার টানানো হয়। বেহালার মতোই এটি বাজানো হয়। বিভিন্ন গানের অনুষ্ঠানে অথবা গানের প্রতিযোগিতায় এই বেহেলা বাজানো হয়।

মারমা লোকবাদ্যযন্ত্র (ঢোল) খা-অম (ত্রিপুরাদের লোকবাদ্যযন্ত্র ঢোল)

৫. ছাড়া : এই বাদ্যযন্ত্রটি পিতলের তৈরি। এটি স্থানীয় বাজার থেকে ক্রয় করা হয়। এটি এক প্রকার ঝুনঝুনি। খুমী আদিবাসীরা বিভিন্ন পূজা-পার্বণ ও অনুষ্ঠানে অন্যান্য বাদ্যযন্ত্রের সাথে এই ছড়া বাজিয়ে থাকেন।

৬. আমে : এই বাদ্যযন্ত্রটি কাঁসার বাসন। স্থানীয় বাজার থেকে খুমীরা এই কাঁসার থালাগুলো ক্রয় করে বাদ্যযন্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে। এই বাদ্যযন্ত্রটির একসেটে তিনটি থালা থাকে। তাই এই বাদ্যযন্ত্র বাজাতে তিনজন লোকের প্রয়োজন হয়।

৭. ব (তুরি) : এই বাদ্যযন্ত্রটিও স্থানীয় বাজার থেকে খুমীরা ক্রয় করেন। এগুলো মূলত কাঁসার তৈরি তুরি। এই বাদ্যযন্ত্রটি খুমীদের আরেং চাইনা (রাজ উৎসবে) বাজানো হয়।

সেঁদা (ত্রিপুরা লোকবাদ্যযন্ত্র)

লোকউৎসব

উৎসবই হচ্ছে জাতির প্রাণ, জাতির সৃষ্টির চৈতন্য। যে জাতির উৎসব নেই, সেই জাতির প্রাণও নেই। সে জাতি নিষ্প্রাণ জাতি। মানুষ তার জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত নানা অনুষ্ঠান ও আচার-আচরণ পালন করে। এই অনুষ্ঠান ও আচারের বৃহত্তর, সামগ্রিক ও সমষ্টিগত রূপ হলো উৎসব। বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশ। কৃষিপ্রধান সমাজে চাষাবাদ, মাটি, শস্য প্রভৃতি অনুষঙ্গ অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ। সেজন্য দেখা গেছে, কৃষি জীবনের সঙ্গে সঙ্গে গড়ে উঠেছে নানারকম বিশ্বাস, সংস্কার। এসব বিশ্বাস আর সংস্কারের কিছুটা সামাজিক রূপ থেকে গড়ে উঠেছে বিভিন্ন পালা-পার্বণ, দেবতা পূজন এবং অনুষ্ঠান-উৎসব। পালা-পার্বণ যখন জাতি-ধর্ম-শ্রেণি-নির্বিশেষে সার্বজনীন মানুষের জীবনযাপনের সঙ্গে অনুসৃত হয় এবং সকল মানুষের কল্যাণকর বলে প্রমাণিত হয় তখনই উৎসবের জন্ম। বান্দরবান পার্বত্য অঞ্চলের পাহাড়ি জনগোষ্ঠীরা মূলত উৎসবমুখর। বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও উৎসব এদের জীবনযাত্রার সাথে মিশে আছে। আনন্দ-উল্লাসের মাধ্যমেই এরা তাদের জীবনযাত্রাকে উৎসবমুখর রাখে। প্রতিটি পাহাড়ি জনগোষ্ঠীরই জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ কিংবা ধর্মীয় অনুষ্ঠানকে ঘিরে অনুষ্ঠান-উৎসবের আয়োজন রয়েছে। সেসব উৎসবে তাদের কৃষ্টি-সংস্কার ঐতিহ্য থাকে। ফসল তোলার আনন্দে কিংবা নবান্নের ঘ্রাণে যখন বাড়ির আঙ্গিনা থাকে সুবাসিত তখন পাহাড়ি কৃষকেরা থাকে নানা ধরনের উৎসবে উদ্ভাসিত। জীবন্ত ও প্রাণবন্ত আদি সংস্কৃতির স্বাভাবিক সম্যকচিত্র ওইসব উৎসবে সুন্দর ও সাবলীলভাবে উপস্থাপিত হয়। এখানে বান্দরবান অঞ্চলের উল্লেখযোগ্য কিছু লোকউৎসব ও অনুষ্ঠানের বর্ণনা দেয়া হলো :

১. মারমা লোকউৎসব : সাংগ্রাইং

মারমা সমাজে সামাজিক ও ধর্মীয় উৎসবের মধ্যে সাংগ্রাইং উৎসব অন্যতম। এপ্রিল মাসের মাঝামাঝিতে এ উৎসবটি অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। সাংগ্রাইং-এর প্রথম দিনে কিছু নির্দিষ্ট কর্মসূচি পালন করা হয়। যেমন :

১. তরুণ-তরুণীরা সবাই মিলে বৌদ্ধ মন্দির পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে। এই কাজটিকে মারমারা একটি পবিত্র কাজ হিসেবে মনে করে।

২. মারমারা সবাই মিলে বৌদ্ধ মন্দিরে যায় এবং পঞ্চশীল ও অষ্টশীল গ্রহণ করে থাকে।

৩. বৌদ্ধ-ভিক্ষুর কাছ থেকে ধর্মীয় দেশনা ও উপদেশ শোনে।

৪. বুদ্ধমূর্তিকে নতুন চীবর দান করে।

৫. বিহারে টাকা-পয়সা দান করে ও বিশ্বের সুখ-শান্তি কামনায় প্রদীপ জ্বালায়।

৬. বৌদ্ধ-ভিক্ষুদেরকে ছোয়াইং (খাবার) দান করে।

এদিনে বিহারের বুদ্ধমূর্তিগুলোকে শোভাযাত্রাসহকারে নদীর তীরে নিয়ে গিয়ে স্নান করানো হয়। এ শোভাযাত্রায় বৌদ্ধ-ভিক্ষু, বোমাং রাজা, স্থানীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ ও

সাধারণ জনগণ অংশগ্রহণ করে। বুদ্ধমূর্তিকে নিয়ে যাওয়ার সময় নানা ধরনের বাদ্যযন্ত্র বাজানো হয়। লোকজন চন্দনের জল ও ডাবের পানি সাথে করে নিয়ে যায়। বুদ্ধমূর্তিগুলোকে বাঁশের নির্মিত সুসজ্জিত একটি মঞ্চে রাখা হয়। এরপর ভক্তরা চন্দন ও ডাবের পানি বুদ্ধমূর্তিগুলোর উপর ঢেলে দেয়। এই ঢেলে দেওয়া পানি লোকজন সংরক্ষণ করে রাখে। এই পানি খেলে নানা ধরনের রোগব্যাধি নিরাময় হয় বলে তাদের বিশ্বাস। স্নানের পর বুদ্ধমূর্তিগুলোকে ইতোপূর্বে দায়কদের দানকৃত নতুন চীবর পরানো হয়। একইভাবে আবার বুদ্ধমূর্তিগুলোকে বিহারে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। এরপর বিকেলে বিহারে গিয়ে শীল প্রার্থনা করে ধর্মোপদেশ শুনে থাকে এবং প্রদীপ জ্বালানো হয়। পরবর্তী দু'দিনে আরও কিছু কর্মসূচি পালিত হয়। যেমন :

১. বিশেষ খাদ্যদ্রব্য ও বিভিন্ন প্রকার পিঠা তৈরি করা,

২. বৌদ্ধ-ভিক্ষুদের জন্য ছোয়াইং দান এবং বয়োজ্যেষ্ঠ ও প্রতিবেশীদের জন্য বিশেষ খাবার প্রেরণ,

৩. বয়োজ্যেষ্ঠদের শ্রদ্ধা, সম্মান ও পূজা করা,

৪. মৈত্রী পানিবর্ষণ এবং

৫. মন্দিরে প্রার্থনা করা হয়।

মৈত্রী পানিবর্ষণ সাংগ্রাইং উৎসবের একটি বিশেষ আকর্ষণীয় অনুষ্ঠান এ অনুষ্ঠান একটা বড়ো মাঠে একটি মণ্ডপ তৈরি করে করা হয়। মণ্ডপের দু'দিকে দুটি বড়ো পানি ভর্তি নৌকা রাখা হয়। একটি নৌকার পাশে একদল তরুণী ও আরেকটি নৌকার পাশে একটি তরুণ দল অবস্থান নেয়। যখন খেলা শুরু হয় তখন উভয় দল তাদের প্রতিপক্ষ দলের দিকে নৌকায় রাখা পানি ছুড়তে থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত পানি না ফুরায়। নৌকার পানি ফুরিয়ে গেলে তাতে পুনরায় পানি ভরানো হয়। একটা ব্যাচ শেষ হলে আরেকটা নতুন ব্যাচ এসে এই পানিখেলা করে। মূলত মারমারা বিশ্বাস করে পরবর্তী বছরের সমস্ত যন্ত্রণা, দুঃখ, দুর্ভাগ্য এবং মালিন্য এই পানিতে ধুয়ে-মুছে যাবে এবং অনাবিল সুখ-শান্তির একটি বছর শুরু হবে।

২. চাক লোকউৎসব : সাংগ্রাইং

সাংগ্রাইং উৎসব পালনের মধ্য দিয়ে চাকরা সকল হিংসা-বিদ্বেষ ভুলে গিয়ে একে অন্যকে সম্ভাষণ জানায় এবং সমস্ত সংকীর্ণতা ভুলে গিয়ে অহিংসা ধর্মে দীক্ষিত হয়ে বৌদ্ধ বিহারে ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি করে। জ্ঞানী-গুণী ও প্রবীণ ব্যক্তিদের শ্রদ্ধা ও সম্মান নিবেদন করে চাকরা পুরানো বছরকে বিদায় এবং নববর্ষকে স্বাগত জানায়। চাকদের সাংগ্রাইং উৎসব বর্মী সনের দিন ও তারিখ অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হয়। সাংগ্রাইং চলাকালীন সময়ে ভিক্ষুদের 'ছোঁয়াইং'(ভাত ও নানা ধরনের তরকারি) রান্না করে দান করা হয়ে থাকে। মাছ, মাংস, শাকসবজি ও ভাত দিয়ে যে খাদ্য সামগ্রী ভিক্ষু, শ্রমন ও উপাসক-উপাসিকাদেরকে দান করা হয় তাকে চাক ভাষায় 'ছোঁয়াইং'বলে।

প্রাক-সাংগ্রাইং : সাংগ্রাইং-এর আগমনী বার্তার সাথে সাথে চাকদের প্রতিটি পাড়ায় বয়ে যায় ছেলেমেয়েদের আনন্দের বন্যা। ঘরে ঘরে বিছানাপত্র, কাপড়চোপড়

পরিষ্কার ও ঘরদোর পরিষ্কারের কাজে সকলের ধুম পড়ে যায়। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলে মিলে একত্র হয়ে রাস্তা-ঘাট, ধর্মীয় ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান, বৌদ্ধবিহার, জাদি, পালিটোল ইত্যাদি সংস্কার ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কাজে লেগে যায়। নানাবিধ কাজের পাশাপাশি কিশোর-যুবা, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা সবাই নানা রঙের নতুন কাপড় কিনতে ব্যস্ত থাকে। সাংগ্রাইং আগমনের পূর্বাভাষে চাক শিশু-কিশোরদের মাঝে আনন্দ-উল্লাসের মধ্যে তাদের মনের ভাব প্রবলভাবে প্রকাশ পায়। এরা বিভিন্ন ধরনের আতশবাজি ফুটিয়ে আনন্দ-উল্লাস করে।

পাইংছোয়েত : সাংগ্রাইং উৎসবের প্রথম দিনকে চাকরা 'পাইংছোয়েত' (ফুল দিবস) বলে। ফুল চাকদের কাছে খুবই পবিত্র জিনিস। এইদিনে আনন্দমুখর পরিবেশে ছোটো ছোটো ছেলেমেয়ে ও যুবক-যুবতীরা দল বেঁধে জঙ্গল থেকে নানা ধরনের ফুল সংগ্রহ করে আনে। 'কাইনকো পাইং' (নাগেশ্বর ফুল) চাকদের খুব প্রিয় ও ঐতিহ্যবাহী ফুল তাই এদিনে চাক যুবক-যুবতীরা দলবদ্ধ হয়ে জঙ্গলে গিয়ে কাইনকো পাইং সংগ্রহ করে। বিকেলে বৌদ্ধবিহারে গিয়ে কাইনকো পাইংগুলো বুদ্ধ পূজার পাত্রে সুন্দরভাবে সাজিয়ে ভগবান বুদ্ধের নিকট দান করে সারা বছরের জন্য সুখ-শান্তি ও মঙ্গল কামনা করে থাকে। এইদিন সকালে চাক বয়স্করা উপসথ (অষ্ট শীল) গ্রহণ ও উপবাস যাপনের জন্য প্রয়োজনীয় দানীয় সামগ্রী নিয়ে তিনদিনের জন্য বিছানাপত্রসহ বৌদ্ধবিহারে অবস্থান করে। এই উপসথ শীল পালনকারীদেরকে চাকরা 'ফনবুকছিলা' বলে। এই সময় ধর্মালয়ে সারিবদ্ধভাবে ভক্তি ও শ্রদ্ধাচিত্তে দায়ক-দায়িকা, উপাসক-উপাসিকাগণ পবিত্র মনে ধ্যানে মগ্ন থাকে।

আক্যাই : সাংগ্রাইং-এর দ্বিতীয় দিনকে চাকরা 'আক্যাই' বা মূল সাংগ্রাইং বলে। এদিন খুব ভোরে বৌদ্ধবিহারে ভিক্ষু, শ্রমন এবং উপাসক-উপাসিকাদের জন্য 'আরুন হোয়াইং' পরিবেশন করা হয়। এদিনে পাড়ার যুবক-যুবতীগণ বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র বাঁজিয়ে বৌদ্ধ মন্দিরে শ্রমন ও বয়স্ক উপাসক-উপাসিকাদেরকে প্রণাম জানিয়ে গোসল করায়। এসময় পাড়ার বয়স্ক লোকদেরকেও ঘরে ঘরে গিয়ে গোসল করানো হয়। তখন তারা আশীর্বাদস্বরূপ যুবক-যুবতীদেরকে কিছু টাকা দিয়ে থাকে। এদিনে দ্বিতীয়পর্বে বিকেল বেলায় পাড়ার প্রতিবেশী, ছেলেমেয়ে, ছোটো-বড়ো সবাই একস্থানে একত্রিত হয়ে শৃঙ্খলার সাথে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে বুদ্ধপূজা ও পঞ্চশীল গ্রহণের উদ্দেশ্যে বিহারের অভিমুখে রওনা হয়। তখন পাড়ার যুবকগণ বিভিন্ন বাজনা বাজাতে থাকে। তখন যুবতীদের হাতে থাকে নাইংছা-ই (চন্দনের পানি), দুধ, তারাবৈ (চাল, কলা, নারিকেল, সুপারি, চা পাতা, মোমবাতি, দেশলাই ইত্যাদি)। তখন ছোটো ছোটো ছেলে ও যুবকরা বিভিন্ন ধর্মীয় গান পরিবেশন করে। বৌদ্ধবিহারে পৌঁছার পর বিহারের চারদিকে তিনবার প্রদক্ষিণ করা হয়। তখন বিভিন্ন ধরনের আতশবাজি ফোটানো হয়। পরে যুবতীদের আনা 'নাইংছা-ই' ও দুধ দিয়ে বুদ্ধ 'মূর্তিকে স্নান করানো হয়। তারপর বৌদ্ধ-ভিক্ষুদের কাছ থেকে 'আবাছিলা' (পঞ্চশীল) গ্রহণ করে এবং দানীয় সামগ্রী 'তারাবৈ' ও 'প্যাডেসা' (কল্পতরু) গুলো বৌদ্ধ-ভিক্ষুর নিকট ধর্মীয় বিধি মোতাবেক দান করা হয়। এই দানের মাধ্যমে জন্ম-জন্মান্তরে ও নতুন বছরের জন্য সুখ-শান্তি ও

উন্নতি কামনা করা হয়। এদিনে সারারাত ধরে নানা ধরনের বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়ে থাকে।

আপ্যাইং : মূল উৎসবের পরবর্তী দিনকে চাকরা 'আপ্যাইং' বলে। এদিনে নববর্ষ উপলক্ষে বিভিন্ন রকমের পিঠা-পুলি, সেমাই ও বিভিন্ন মিষ্টান্ন তৈরি করে বৌদ্ধবিহারে ভিক্ষু, শ্রমণ ও উপাসক-উপাসিকাদেরকে দান এবং পাড়া-প্রতিবেশী ও আমন্ত্রিত অতিথিদেরকে আপ্যায়ন করা হয়। এদিন থেকে বেশ কয়েকদিন ধরে ছোটো-বড়ো সবাই মিলে বিভিন্ন পাড়ায় ঘুরে ঘুরে বুদ্ধ পূজা করে। এ নিয়মকে চাক ভাষায় 'ফারা রিক্ক্যো' বলা হয়। তখন যুবতী ও গৃহিণীরা মূল সাংগ্রাইং দিনের মতো চন্দন, দুধ, মোমবাতি ইত্যাদি নিয়ে যায়। বৌদ্ধবিহারে পৌছলে সবাই মিলে গান ও বাজনা বাজিয়ে তিনবার বৌদ্ধবিহার প্রদক্ষিণ করে। এরপর বুদ্ধমূর্তি, ভিক্ষু, শ্রমন ও উপাসক-উপাসিকাদেরকে স্নান করানো হয়। এরপর পঞ্চশীল গ্রহণ করা হয়। এই দিনে বিভিন্ন পাড়ার যুবক-যুবতীদের মধ্যে পানিখেলা হয়।

আনাইবুক পোয়ে : চাকদের লোকউৎসব

আনাইবুক পোয়ে (নবান্ন উৎসব) চাকদের অন্যতম লোকউৎসব। প্রায় সকল চাকদের ঘরে ঘরে বছরে একবার নতুন ফসল ঘরে তোলার পর এই উৎসব পালন করা হয়। চাকদের অনেকে জুমচাষী আবার অনেকে হালচাষেও নির্ভরশীল। তাই সচরাচর জুমচাষীরা ভাদ্র মাসে আনাইবুক পোয়ের আয়োজন করে থাকে। যে কোনো চাষাবাদের আগে বা কাজ শুরুর প্রথম দিন এবং ফসল তোলার অর্থাৎ ধান কর্তনের প্রথমদিন জ্যোতিষীর গণনা ও তন্ত্রের শুভ দিনক্ষণ দেখে তারা কাজ শুরু করে থাকে। নবান্ন উৎসবে আত্মীয়স্বজন পাড়া-প্রতিবেশীদের সাধ্যমতো নিমন্ত্রণ করে খাওয়ানো হয়।

উৎসবে শূকরের মাংস, মুরগির মাংস ও বিভিন্ন ধরনের তরিতরকারি রান্না করা হয়। পাড়ার যুবক-যুবতীরা আনন্দমুখর পরিবেশে রান্না করে প্রথমে বৌদ্ধবিহারে ছোয়েং দেওয়ার পরপরই আমন্ত্রিত অতিথিদের ঐ রান্না করা খাবার পরিবেশন করা হয়। আমন্ত্রিত গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ নবান্ন উৎসবের ভাত খাওয়ার আগে যে ঘরে নবান্ন উৎসব আয়োজন করা হয় সেই ঘরের অনাগত দিনের জুম বা কৃষি কাজে আরও উত্তরোত্তর ভালো ফসল ফলনের কামনা করে আতিথেয়তা গ্রহণ করে থাকেন। নবান্ন উৎসবে চাক আদিবাসীদের নিজস্ব তৈরি মদও পরিবেশন করা হয়।

৩. খিয়াং লোকউৎসব

খিয়াং জনগোষ্ঠীর মধ্যে অনেক ঐতিহ্যবাহী লোকউৎসব রয়েছে। এরমধ্যে অন্যতম হচ্ছে হেনেই, হ্ন উহ্ পেই, ওপেলা, সৈত্যবীল, বুগেলে, উ-খ্ পেই, লাংকানহ্ পেই ইত্যাদি। নিম্নে এসব উৎসবের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হলো :

১. হেনেই

হেনেই অনুষ্ঠানটি একাধিক পরিবারের লোকজন একজোট হয়ে উদ্‌যাপন করে থাকে। সাধারণত জুমের ধান রোপণের সময় বা জুমের ধান কর্তনের পরেও হেনেই অনুষ্ঠানের

আয়োজন করা হয়ে থাকে। অনুষ্ঠানটি বছরে অন্তত তিনবার আয়োজন করা হয়। এ উৎসবকে নবান্ন উৎসবও বলা হয়ে থাকে। গ্রামের লোকজন তাদের সুবিধামতো একত্রিত হয়ে কোনো ছড়া বা খালের ধারে গরু বা মহিষ বলি দিয়ে এই অনুষ্ঠানটি পালন করে। উক্ত গরু বা মহিষের মাংস রান্না করে রীতিমতো পূজার্চণা দিয়ে পাড়াবাসী সকলে মিলেমিশে ভোজে অংশগ্রহণ করে। এ সময় কেউ কেউ মদ পান করে আনন্দে মেতে ওঠে।

২. সৈত্যবিল

এটি গ্রামবাসীদের একটি খাওয়া-দাওয়ার উৎসব। গ্রামবাসীরা সকলে মিলে পরিমাণ মতো চাল ঢেঁকিতে গুঁড়া করে। চালের গুঁড়া, নারিকেল, গুড়, আখ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস একটি গামলা বা হাঁড়িতে ভালোভাবে মিশিয়ে সৈত্যবিলের খাদ্য তৈরি করতে হয়। এসব মিশানো জিনিসকে খিয়াং ভাষায় সৈত্যবিল বলে। সেই মিশ্রিত জিনিসের ভেকচি বা গামলার চারপাশে লোকেরা বসে, সে গামলা হতে খাবার নিয়ে তৃপ্তিসহকারে একসাথে খায়।

৩. বুগেলে

জুমে ধানের বীজ বপনের পর দেবতার উদ্দেশ্যে এই 'বুগেলে' অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। যখন জুমে ধানের চারা ওঠে তখন তারা জুমে শূকর বলি দিয়ে বুগেলে অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকে। দেবতারা জুমচাষিদের দেওয়া বুগেলে পূজায় সন্তুষ্ট হয়ে যাতে জুমের ফসলাদির ভালো ফলন দেয় এবং ঐসব ফসলকে রক্ষা করে তার জন্যই এই অনুষ্ঠানের আয়োজন। এ পূজার উদ্দেশ্য হচ্ছে জুমের ধান, তুলা ও অন্যান্য ফসল ভালোভাবে বন্যপ্রাণী থেকে রক্ষা পেয়ে যেন অধিক ফলন হয়। শুকর জবাই করে গ্রামের আত্মীয়স্বজনদের নিয়ে এই ভোজে সবাই অংশগ্রহণ করে। এই ভোজে মদ ও মাংস দিয়ে খাওয়াদাওয়া চলে।

৪. কান ফোড়ানো উৎসব

খিয়াংরা কন্যার জন্মের কয়েক মাস পরে কান ফোড়ানো উৎসবের আয়োজন করে। এই উপলক্ষে অতিথিদের নিমন্ত্রণ করে আপ্যায়ন করা হয়।

৪. খুমী লোকউৎসব

নিসা য়ানা (পাড়া বন্ধ পূজা)

বছর শেষে জুমের উৎপাদিত ফসল ঘরে নিয়ে আসার ২-৩ মাস পর খুমীরা এই উৎসবটি করে থাকে। এ পূজা তারা প্রত্যেক বছর চৈত্র মাসে করে থাকে। পাড়ার কারবারি যিনি পাড়াপ্রধান হিসেবে থাকেন বা রোয়াজা পূজার সাতদিন আগে পাড়াবাসীর পূজা করার উদ্দেশ্যে এক ঘরোয়া সভা আহ্বান করেন। সভায় পূজার খরচের চাঁদা প্রদানের জন্য প্রতি পরিবারের কর্তা উপস্থিত থাকেন। পাড়াবাসীর দেওয়া চাঁদার টাকা দিয়ে পূজার

উৎসবের জন্য একটি ছাগল, একজোড়া কবুতর, একজোড়া হাঁস, একজোড়া ডিম এবং একটি মর্দা শূকর কেনা হয়। সাধারণত যে ঝিড়ি থেকে পাড়াবাসীরা খাবার জন্য এবং বিভিন্ন কাজের ব্যবহারের জন্য পানি আনয়ন করে সে ঝিড়িতে এই পূজা করা হয়। পূজার দিন প্রথমে একটি পূজার স্থান বাছাই করা হয় এরপর সেখানে ধানের গোলার প্রতিকৃতি তৈরি করা হয়। এই ধানের গোলায় বালি অথবা মাটি দিয়ে ভরাট করা হয়। এই গোলায় মাটি বা বালি ভরাট করার আগে পাড়ার মুরব্বিরা মন্ত্র পাঠ করেন। এই ঝিড়ির রক্ষাকারী দেবতার উদ্দেশ্যে মন্ত্রটি পাঠ করা হয় যেনো ঐ ঝিড়ির দেবতার আশীর্বাদে তাদের জুমে ফসল ভালো হয়। তারপর একজোড়া হাঁস, একজোড়া কবুতর জবাই করে, একজোড়া ডিম ভেঙে এবং বিভিন্ন ধরনের ধানের খৈ মুড়ি সেই ধানের গোলার উপরে যত্নসহকারে ছিটানো হয়। এই পূজায় পাড়ার প্রত্যেক পরিবার থেকে কমপক্ষে একজন করে উপস্থিত থাকতে হয়। পূজার অনুষ্ঠানে যাওয়ার সময় সঙ্গে মরিচ, লবণ, হলুদ, আদা, মদ ইত্যাদি নিয়ে যেতে হয়। এগুলো দিয়ে হাঁস ও কবুতর জবাই করার পর ঝিড়ির পাশে রান্না করে মদের সাথে সেখানে খেয়ে আসতে হয়। কারণ পূজার অবশিষ্ট কোনোকিছু পাড়ায় নিয়ে যাওয়া সম্পূর্ণভাবে নিষেধ। খাবার শেষ হলে সবাই বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হয়। এরপর পাড়ার কারবারির বাড়ির উঠানে একটি মর্দা শূকর জবাই করা হয়। জবাই করা শূকরের মাংস প্রত্যেক পরিবার সমানভাবে ভাগ করে নিয়ে যায়। এ পূজার পরপরই দু'দিন-দু'রাত পাড়া বন্ধ রাখা হয়। তখন পাড়াবাসি কেউ কোনো প্রকারে পাড়ার বাইরে যেতে পারবে না এবং বাইরের লোকজনও কোনো প্রকারে পাড়ার ভেতর প্রবেশ করতে পারবে না। এই দু'দিনের প্রথম দিনটি পাড়াবাসির মঙ্গলের জন্য এবং দ্বিতীয় দিনটি সকল গৃহপালিত পশুপাখির মঙ্গলের জন্য পাড়া বন্ধ করে রাখা হয়। তারা বিশ্বাস করে যে, বন্ধদিনের দেবতার আশীর্বাদে তাদের গৃহপালিত পশুপাখিরা বনের জীবজন্তুর আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবে।

৫. ম্রো লোকউৎসব

১. চাংক্রান পই (সাংগ্রাইং উৎসব)

চৈত্র সংক্রান্তি ও নববর্ষকে ঘিরে বিভিন্ন অনুষ্ঠানাদিকে পাহাড়ি জনগোষ্ঠীরা সাধারণত বৈসাবি বলে থাকে। একে ত্রিপুরা ভাষায় বৈসুক, মার্মা ভাষায় সাংগ্রাইং এবং চাকমা ভাষায় বিঝু বলে। এ উৎসবকে বৈসাবি ছাড়াও পার্বত্যবাসীগণ আরও বিভিন্ন নামে অভিহিত করে থাকেন। যেমন— ম্রো ভাষায় চাংক্রান, খুমী ভাষায় সাংগ্রায়, তঞ্চঙ্গ্যাগণ বিহু ইত্যাদি। এই উৎসবটি শ্যাম (থাইল্যান্ড), ভিয়েতনাম, লাওস, কম্বোডিয়া, ভারত, মিয়ানমার প্রভৃতি দেশেও মানুষেরা পালন করে থাকে। মায়ানমারে 'Thinyan' নামে এবং থাইল্যান্ডে 'Songkram' নামে এ উৎসব পরিচিত। মূলত সাংগ্রাইং, চাংক্রান, সাংগ্রায়, Songkram ইত্যাদি শব্দ এসেছে মগদের শব্দ 'সংক্রমণা' বা 'সংক্রমণ' থেকে। যার অর্থ মিলন, সন্ধি বা যোগাযোগ। বিদায়ী বছরের সর্বশেষ মাস চৈত্রের শেষ দিনটির সাথে নতুন বছরের প্রথম মাসের প্রথম দিনটির মিলন, সন্ধি বা যোগাযোগের মাধ্যমে তিথিটি উদ্‌যাপিত হয় বলে এই উৎসবকে চৈত্র সংক্রান্তিও বলা হয়।

সাংগ্রাইং উৎসবের সাথে পাহাড়িদের জুমচাষের সম্পর্ক ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সাংগ্রাইং উৎসবের পূর্বে পাহাড়ে অবশ্যই জুমের জমি আগুনে পোড়াতে হয়। ম্রো জনগোষ্ঠী সাংগ্রাইং উৎসব পালনের জন্য বার্মিজ বর্ষপঞ্জি অনুসরণ করে থাকে। অনেকে আবার জঙ্গলের এক প্রকার বনৌষধি ফুলের গাছকে অনুসরণ করে। উক্ত ফুলের পাতা আম পাতা সদৃশ। এই গাছ প্রায় ৫-৬ ফুট উঁচু হয়। অতি সুগন্ধি এবং সুশ্রী এই গাছের ফুল অনেকটা হাসনাহেনা ফুলের মতো। চৈত্রের শেষে এ ফুল ফোটে। যখনই এ ফুল ফোটে তখনই ম্রো জনগোষ্ঠী সাংগ্রাইং উৎসব এসেছে বলে মনে করে। যারফলে এ ফুলটির নাম রাখা হয় 'চাংক্রান পাউ' (সাংগ্রাইং পুষ্প)। সাংগ্রাইং উৎসব শুরু হওয়ার এক সপ্তাহ পূর্ব থেকে গৃহিণী ও যুবতীগণ পরিবারের যাবতীয় কাপড়-চোপড় ছড়ায় গিয়ে ধৌত করে। সাংগ্রাইং উৎসবের দিনে নিজেকে সাজানোর জন্য ম্রো যুবকগণ রঙ-বেরঙের কাগজের ফুল দ্বারা বিভিন্ন ধরনের সাজসরঞ্জাম তৈরি করে। রংসী ও মাংসী (লাল ও সবুজ রং) দ্বারা পরিধেয় কাপড় রঙ করায়। যুবতীগণ নানা ধরনের শিরোভূষণ, কণ্ঠাবরণ, বাহুভূষণ, হাতের চুড়ি, কোমর বন্ধনি, পদাভরণ ও আঙ্গুষ্ঠাভরণ পরিচ্ছন্ন করে এবং বিভিন্ন ধরনের পুঁতি দ্বারা নানা ধরনের অলংকার তৈরি করে। আর পরিবারের কর্তাগণ নিজ নিজ গৃহ পরিষ্কার, মেরামত ও সাজানোর কাজে ব্যস্ত থাকে। ম্রো জনগোষ্ঠী সাংগ্রাইং উৎসব তিন দিনব্যাপী পালন করে থাকে। উৎসবের পূর্ব রাত্রে প্রবীণগণ অষ্টশীল গ্রহণ ও উপবাস যাপনের লক্ষে বুদ্ধ বিহারে (সাতাং সুং কীম) ধর্মালয়ে তিন দিনের জন্য বিছানাপত্র নিয়ে অবস্থান করেন।

১.১ চাংক্রানী ওয়ান (সাংগ্রাইং এর প্রথম দিবস)

সাংগ্রাইং-এর প্রথম দিবসকে ম্রো ভাষায় 'চাংক্রানী ওয়ান' (প্রথমা সাংগ্রাইং) বলা হয়। যুবক-যুবতীরা খুব ভোরে উঠে ফুলের উপর কীটপতঙ্গ উপবেশন করার আগে পবিত্র ফুলগুলো ছিঁড়ে পূজার পাত্রে বা ফুলদানিতে সাজিয়ে বুদ্ধ মূর্তির বেদীর সামনে উপবেশন করে প্রার্থনা নিবেদন করে। আর গৃহের কর্তাগণ নিজ নিজ গৃহের 'ফ্রাচাং' (ফরাঃ জাং)-এর 'ছোয়াইং' এবং নব প্রস্ফুটিত পুষ্প দ্বারা ফুলের বেদী সাজিয়ে গৃহের পবিত্রতা আনয়নের লক্ষে ভগবান বুদ্ধের নিকট সভক্তিতে প্রার্থনা করে। আনুমানিক সকাল ৮ ঘটিকা হতে পাড়াবাসী সকলেই সারিবদ্ধভাবে 'সাতাং সুং কীমে' 'ছোয়াইং' প্রদান করে এবং বুদ্ধ মূর্তির বেদীতে মোমবাতি জ্বালিয়ে শ্রদ্ধাভরে প্রণাম জানিয়ে প্রার্থনা করে। এইদিন সকালে 'সোয়াবাই হম' (হলুদ ভাত) এবং 'খাক কান' (তিতা তরকারি) রান্না করে খাওয়া হয়। এ খাবার খেলে পুরাতন বছরের সব দুঃখ মুছে যায় বলে ম্রোদের বিশ্বাস। সাংগ্রাইং শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অর্থাৎ মোট তিন দিবস বয়োজ্যেষ্ঠগণ অষ্টশীল এবং নবীনগণ পঞ্চশীল পালন করে।

১.২ চাংক্রান পা-নি (সাংগ্রাইং-এর দ্বিতীয় দিবস)

ম্রো ভাষায় এ চাংক্রানের দ্বিতীয় দিনকে 'চাংক্রান পা-নি' (মূল সাংগ্রাইং) বলা হয়। উক্তদিনেও প্রথম দিনের মতোই ধর্মীয় কার্যক্রম চলে। এদিন সকালে যুবতীদের পিঠা তৈরির কাজে ধুম পড়ে যেতে দেখা যায়। এদিন গৃহিণী ও যুবতীগণ প্রতিবেশীদেরকে

পিঠা খাওয়ার দাওয়াত করে। পুরুষরা বৌদ্ধ বিহারে ধর্মীয় কার্যাদি সম্পন্ন করে 'তাকেট' (বাঁশের ঠেলা) প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। বিভিন্ন এলাকা থেকে ম্রো যুবকগণ এসে এ খেলায় অংশগ্রহণ করে। এ খেলায় শুধুমাত্র পুরুষরা অংশগ্রহণ করতে পারে। তিন হাত লম্বা একখণ্ড বাঁশের দু'প্রান্তের দু'জন যুবক বগলে আগলে ধরে ঠেলাঠেলির মাধ্যমে এ খেলা করে। যে খেলোয়াড় প্রথমে ভূ-পাতিত হবে সে খেলোয়াড়কে পরাজিত বলে ধরে নিতে হয়। তাকেট প্রতিযোগিতা শেষ হলে যুবক-যুবতীগণ 'ক্লুপাউ' (এক প্রকার জংলি ফুলের কলি) সংগ্রহের জন্য জঙ্গলে যায়। সংগ্রহের পর ফুলের কলিগুলোকে পানি ভর্তি গামলার মধ্যে সাজিয়ে মাচাং-এর উপর রাখা হয়। মৃদু বাতাসে রাতে ফুলের কলিগুলো আস্তে আস্তে ফুটতে থাকে।

১.৩ চাংক্রান নীচুর (সাংগ্রাইং এর তৃতীয় দিবস)

সাংগ্রাইং-এর তৃতীয় দিনকে ম্রো ভাষায় 'চাংক্রান নীচুর' (সাংগ্রাইং-এর শেষদিন) বলা হয়। রাতে সাজিয়ে রাখা 'ক্লুপাউ' কলি পরের দিন ফোটার পর যুবক-যুবতীগণ চুলের খোঁপা, কান ও গলায় সেই ফুলের মালা পরে নিজেকে নৃত্যের সাজে সাজে। এই দিনেও পূর্বের দিনের মতো ধর্মীয় কর্মকাণ্ড চলে। ম্রো যুবকগণ বাঁশি (প্লুং) বাজায়, যুবতীগণ তালে তালে তাল মিলিয়ে বুদ্ধ বিহার চতুর প্রদক্ষিণ করতে করতে নৃত্য পরিবেশন করে। এই নৃত্যানুষ্ঠানকে 'ক্লুবং প্লাই' (পুষ্প নৃত্য) বলা হয়। এই অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয় মূলত নবপ্রস্ফুটিত ফুল দিয়ে নতুন বছরকে স্বাগত জানানোর জন্য। উল্লেখ্য যে, ক্লুপাউ ফুলকে ম্রো সমাজে সবচেয়ে পবিত্র ফুল মনে করা হয়। পুরোনো বছরের দুঃখ-গ্লানি মুছে ফেলে নতুন বছরে নতুন আশা-উদ্দীপনায় ক্লুপাউ ফুলের সুবাসের মতো পবিত্রতা বয়ে আনাই এই নৃত্যানুষ্ঠানের উদ্দেশ্য। এই অনুষ্ঠান সকাল ৮টায় শুরু হয়ে দুপুর ১২টা পর্যন্ত এবং বিকাল ৫টায় পুনরায় শুরু হয়ে রাত ৮টা পর্যন্ত চলে।

ম্রো সমাজে এ 'ক্লুপাউ' ফুলকে নিয়ে একটি কিংবদন্তি আছে। কিংবদন্তিটি এইরূপ : ক্লুপাউ ম্রো সমাজে সবচেয়ে পবিত্র ফুল। এ ফুলকে কখনোই ভাই-বোন একসাথে মিলে ছিঁড়তে পারেনা। ভাই-বোন মিলে ছিঁড়লে নাকি দুর্ঘটনায় মারা যায়। অনেকদিন আগে কোনো এক ম্রো গ্রামে অনাথ দুই ভাই-বোন বাস করতো। ভাইয়ের স্নেহ ও বোনের ভালোবাসা এমন যে, একে অপরকে না দেখলে সামান্যক্ষণও থাকতে পারতো না। কিছুক্ষণের সময়টাকে তাদের বহুকাল মনে হতো। বড়ো ভাই একদিন অজান্তে এক মায়াবি রাক্ষসীকে বিয়ে করে। একদিন ঐ রাক্ষসীর স্বামীর ছোটো বোনকে খাওয়ার লোভ হলো। যেমন করে হোক ছোটো বোনের মাংস দিয়ে তার ক্ষুধা নিবারণ করবে। রাক্ষসীটি স্বামীর কাছে ছোটো বোনকে খাওয়ার আবদার করলো। আবদার পূরণ না হলে সমস্ত গ্রামবাসীকে খেয়ে ফেলবে বলে সে স্বামীকে হুমকি দিলো। তাতে কোনো উপায় না দেখে স্বামী বাধ্য হয়ে নিজের বোনকে মেরে ফেলার জন্য ক্লুপাউ ফুল পাড়বে বলে ফুসলিয়ে বোনকে বনে নিয়ে গেলো। বড়ো ভাই গাছের উপর থেকে ফুল ছিঁড়ে নীচে ফেলে আর ছোটো বোন খুশিতে ফুলগুলো তুলে নেয়। এক সময় বড়ো ভাই বোনকে মেরে ফেলার উদ্দেশ্যে গাছের ডাল কেটে বোনের উপর নিক্ষেপ করলে বোনটি মারা যায়। বড়ো ভাই বোনের লাশ বাড়িতে এনে স্ত্রী রাক্ষসীর হাতে তুলে দেয়। খুশিতে স্বামীর বোনের মাংস

খেয়ে রাক্ষসী ক্ষুধা নিবারণ করলো। এই কিংবদন্তি কাহিনির বিশ্বাসে ম্রোরা আজও ভাই-বোন মিলে এক সাথে ক্লুপাউ ফুল পাড়ে না।

২. চিয়াসদ পই (গো-হত্যা উৎসব)

গো-হত্যা অনুষ্ঠান ম্রো সমাজের সবচেয়ে বড়ো সামাজিক অনুষ্ঠান। বাড়ির লোকজনের রোগমুক্তির কামনায়, গৃহের শান্তি ও জুমে উচ্চ ফলনের আশায় 'থুরাই' (সৃষ্টিকর্তা)কে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে তাকে নিবেদন করে এই উৎসব করা হয়। সাধারণত এই উৎসব আয়োজন করা হয় ডিসেম্বর, জানুয়ারি অথবা ফেব্রুয়ারি মাসে অর্থাৎ কাজের বিশ্রামের সময় যখন ম্রোদের বাৎসরিক ফসল উত্তোলনের কাজ শেষ হয়ে যায়। গ্রামবাসী মিলে পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট একটি উৎসব পরিচালনা কমিটি গঠন করে অনুষ্ঠানের যাবতীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করে। অনুষ্ঠান পরিচালনা কমিটিকে ম্রো ভাষায় 'রিয়াচাওয়া' বলে।

এই অনুষ্ঠান আয়োজনে একসপ্তাহ পূর্ব থেকে বাঁশ এনে ঐ বাঁশ দিয়ে 'ছিট' (একপ্রকার ফুল) তৈরি করে। ছিট দিয়ে গ্রামের মধ্যখানে 'লিম্পু'তে মাচাং সদৃশ্য একটি পাতাটন তৈরি করা হয়। এর নীচে গরু বাঁধার জন্য বাঁশ দিয়ে পিঞ্জর সদৃশ্য একটি ঘের তৈরি করা হয়। অনুষ্ঠানের দিনে সন্ধ্যায় ঐ ঘেরে গরু বাঁধান হয়। আর অন্যদিকে অনুষ্ঠান আয়োজনের একদিন আগে যুবক-যুবতীরা দলে দলে বন-জঙ্গল হতে বুনো কলাপাতা সংগ্রহ করে। ম্রোদের কলাপাতা ব্যবহার তাদের ঐতিহ্যরূপে স্বীকৃত এবং তাদের ঐতিহ্যেরই অনন্য প্রকাশ। যে কোনো অনুষ্ঠানে ম্রোরা কলাপাতার উপর খাবার সাজিয়ে পরিবেশন করে। অপরদিকে অনুষ্ঠানের খাবারের জন্য পাড়ার যুবতীরা ধান ভানার কাজে অনুষ্ঠানের আয়োজককে সহযোগিতা করে। অনুষ্ঠান আয়োজকের ঘরের সাথে সংযোগ করা ছাউনিবিহীন মাচাং-এর সাথে বরাখ বাঁশে 'ছিট' সাজিয়ে এন্টিনার সাদৃশ্য 'দংলু কাউ' (খুঁটি) স্থাপন করা হয়।

অনুষ্ঠান আয়োজনের এক সপ্তাহ আগে থেকে আত্মীয়স্বজনদের অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য নিমন্ত্রণ করা হয়। জামাই পক্ষের আত্মীয়স্বজনরা খাঁচা ভরা মোরগ-মুরগি নিয়ে অনুষ্ঠানে যোগদান করতে আসে আর মামার পক্ষের আত্মীয়স্বজনরা শূকরের মাংস, হাঙ্গর মাছের শুঁটকি নিয়ে অনুষ্ঠানে যোগদান করে। প্রথমদিনে আমন্ত্রিত অতিথিদের সামাজিক নিয়মনীতিতে আপ্যায়ন করা হয়। এ সমস্ত আপ্যায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করে 'রিয়াচা' কমিটি। উল্লেখ্য যে, অনুষ্ঠান শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত রিয়াচা কমিটির সদস্যরা কোনো আমিষজাতীয় খাদ্যবস্তু গ্রহণ করতে পারে না। এ ধরনের নিয়ম পালনের মাধ্যমে রিয়াচা কমিটিকে অনুষ্ঠান পরিচালনা করতে হয়। অবশ্য তাদের জন্য অনুষ্ঠান শেষে ভুরিভোজের ব্যবস্থা থাকে। গো-হত্যা অনুষ্ঠানের হত্যা করা গরুর মাংস সকল মানুষ অর্থাৎ ব্যক্তি নির্বিশেষে খেতে পারে। সামাজিকভাবে তাতে কোনো বিধিনিষেধ থাকে না।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলে আমন্ত্রিত অতিথি, স্বগোত্রীয় লোকজন, নিকট আত্মীয়স্বজন ও গ্রামবাসী অনুষ্ঠান আয়োজনকারীকে সম্মানস্বরূপ এক বোতল করে মদ উপহার প্রদান করে। তখন মদ্যপানের আসর বসে। ম্রো ভাষায় এ আসরকে বলা হয় 'তাঅই'। আবাল-

বৃদ্ধ-বনিতা সবাই এ আসরে শরিক হতে পারে, তাতে কোনো বাধানিষেধ নেই। এ আসর সমাপ্ত হলে শুরু হয় নৃত্যানুষ্ঠান। সারারাত ধরে নৃত্যানুষ্ঠানে নৃত্য পরিবেশন করা হয়।

গো-হত্যা উৎসবের দিন সকালে গৃহকর্তা একহাতে ধারালো বল্লম, মদ ও আদার জল মুখে নিয়ে গরুর গায়ে ফুঁ দেয় এবং মন্ত্র উচ্চারণ করে। 'হে থুরাই (সৃষ্টিকর্তা) আজ তোমার জন্য গো-হত্যা অনুষ্ঠানের আয়োজন করছি। আজ থেকে যেনো আমার গৃহের কোনো মানুষের রোগব্যাধি না হয়'। মন্ত্র পড়া শেষ হওয়ার সাথে সাথে গৃহকর্তা গরুর ডান পার্শ্বে হৃৎপিণ্ড বরাবর বল্লম দিয়ে খোঁচা মারে। মৃত্যুর জন্য গরু যখন ছটফট করতে থাকে তখন বল্লম দিয়ে জিহ্বা বের করে এনে কেটে 'লিং' (গরু বাঁধার খুঁটি)-এর উপর জিহ্বাটি গেঁথে রাখা হয়। হত্যা করা গরুর মাংস রান্না করে সবাই মিলে আহার করে। সন্ধ্যা হলে পুনরায় যুবক-যুবতীরা খালি গরুর ঘরের চত্বরে যেখানে গরুকে বেঁধে রেখে হত্যা করা হয়েছিলো সেখানে নৃত্য পরিবেশন করে। ঘুরে ঘুরে নয়বার নৃত্য পরিবেশন করার পর তারা আয়োজকের গৃহে এসে নৃত্যের সমাপ্তি ঘটায়। পরদিন সকালে আমন্ত্রিত অতিথিরা গরুর মাংস নিয়ে যার যার ঘরে ফিরে যায়। ম্রোদের গো-হত্যা অনুষ্ঠান আয়োজনের পেছনে একটি কিংবদন্তি রয়েছে: 'একদিন থুরাই তাঁর সৃষ্ট মানবজাতিকে সঠিক পথে নিয়ে আসার উদ্দেশ্যে বর্ণমালা ও ধর্মগ্রন্থ প্রদান করবেন বলে ঠিক করলেন। তিনি বর্ণমালা ও ধর্মগ্রন্থ গ্রহণের জন্য ভূ-মণ্ডলের সকল জাতির নেতাগণকে তাঁর কাছে উপস্থিত থাকার আহ্বান জানান। তখন কর্মব্যস্ততার কারণে ম্রো জাতির নেতা থুরাই-এর নিকট যথাসময়ে উপস্থিত থাকতে না পেরে বর্ণমালা ও ধর্মীয় গ্রন্থ গ্রহণ করতে পারেনি। অন্যান্য জাতির নেতাগণ যখন বর্ণমালা ও ধর্মীয় গ্রন্থখানা নিয়ে ফিরে আসলো তখন ম্রো প্রধান থুরাই-এর আহ্বানকৃত স্থানে উপস্থিত হন। ততক্ষণে থুরাই স্বর্গের উদ্দেশ্যে ফিরে চলে গেলেন। ম্রো প্রধান আর থুরাই-এর দেখা পেলেন না এবং বর্ণমালা ও ধর্মীয় গ্রন্থও নিতে পারলেন না।

পরদিন প্রাতে থুরাই গরুর মাধ্যমে ম্রোদের কাছে বর্ণমালা ও ধর্মীয় গ্রন্থ পাঠালেন। গ্রন্থে বারোমাসিক চাষাবাদ, ধর্মীয় নীতিমালা, সামাজিক-সাংস্কৃতিক নিয়মনীতি ইত্যাদি সম্পর্কে উল্লেখ ছিলো। গরু থুরাই-এর কথামতো বর্ণমালা ও গ্রন্থখানা নিয়ে পৃথিবীতে রওনা দিলো। সময়টা ছিল গ্রীষ্মকাল। প্রখর রোদে গরু হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত হয়ে পথিমধ্যে এক প্রকাণ্ড বটবৃক্ষের ছায়ায় গ্রন্থের উপর মাথা রেখে শুয়ে বিশ্রাম নিলো। বিশ্রাম নিতে গিয়ে তার অজান্তে ঘুম আসলো। যখনই তার ঘুম ভাঙলো ততক্ষণে বিকাল ঘনিয়ে গেলো। আর অন্যদিকে গরু ক্ষুধার জ্বালায় কোনো উপায় না দেখে বর্ণমালা ও গ্রন্থখানা খেয়ে ফেললো। বর্ণমালা ও গ্রন্থখানা খেয়ে ফেলার পর গরু ম্রোদের কাছে গিয়ে বললো, 'থুরাই তোমাদের উপর প্রচণ্ড ক্ষোভ ও রাগ করেছে, তাই কোনো বর্ণমালা ও গ্রন্থ না দিয়ে তোমাদেরকে কিছু পরামর্শ দেওয়ার জন্য তিনি আমাকে পাঠিয়েছেন। আর তোমরা আমার নির্দেশ মোতাবেক কাজকর্ম সম্পাদন করবে। বছরে জুমে তিনবার আগাছা পরিষ্কার করবে আর একবার মাত্র ফসল উত্তোলন করবে'।

ম্রোদের কাছে এভাবে উল্টাপাল্টা মিথ্যা কথা বলে গরু চলে গেলো। গ্রন্থে লেখা ছিল এভাবে, বছরে বহুবার ফসল উত্তোলন করা যাবে এবং একবার মাত্র জুমের

আগাছায় নিড়ানী দিতে হবে বা পরিষ্কার করতে হবে। গরু ফিরে গেলে থুরাই গরুকে ম্রোদের কাছে সঠিকভাবে বর্ণমালা ও ধর্মীয় গ্রন্থ পৌঁছে দিয়েছে কিনা প্রশ্ন করলো। তখন গরু অগোছালোভাবে জবাব দিতে থাকে। তাতে থুরাই বুঝতে পারলো গরু ম্রোদের কাছে সঠিকভাবে বর্ণমালা ও ধর্মীয়গ্রন্থ পৌঁছায়নি। তাই তিনি পরে গরুকে স্বর্গ থেকে পৃথিবীতে বিতাড়িত করে এই বলে অভিশাপ দিলো, 'যতদিন ম্রো জাতি বর্ণমালা ও ধর্মীয় গ্রন্থ পাবে না ততদিন তোমাদেরকে (গরুকে) ম্রোরা নির্যাতন ও কষ্ট দিয়ে মারবে। তোমাদের শাস্তি হবে ম্রোদের গ্রামের মধ্যখানে (লিম্পুতে) ঘেরে আবদ্ধ করে তোমাদের ঘেরের চতুর্দিকে ঘুরে ঘুরে তারা সারারাত নেচে আনন্দ-ফূর্তি করবে আর প্রত্যুষে তোমাদেরকে বল্লম খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে হত্যা করবে। আর তোমাদের প্রাণ ত্যাগের মুহূর্তে বর্ণমালা ও গ্রন্থ খেয়ে ফেলার জন্য তোমাদের মিথ্যা আশ্রিত জিহ্বা কেটে খুঁটিতে গেঁথে রাখবে। এটাই হচ্ছে তোমাদের মিথ্যার উপযুক্ত শাস্তি।

বর্তমানে মেনলে ম্রে কর্তৃক ম্রোদের বর্ণমালা ও ক্রামা ধর্ম আবিষ্কারের পর ক্রামা ধর্মাবলম্বী ম্রোরা গো-হত্যা পরিত্যাগ করেছে। যার কারণে বর্তমানে গো-হত্যা অনুষ্ঠান অনেকাংশে কমে গেছে। ধর্ম ও বর্ণমালাপ্রাপ্ত হয়েছে বলে বর্তমানে ক্রামা ধর্মাবলম্বীদের কাছ থেকে গরু প্রজাতি মুক্ত।

৩. ঔয়ারী নাট (জুম পূজা)

ম্রো আদিবাসীদের 'ঔয়ারী নাট' (জুম পূজা) হচ্ছে অপদেবতার উদ্দেশ্যে নিবেদন করা এক প্রকার পূজা। ধানকাটার মৌসুমে কোনো ঘরে যদি কেউ রোগাক্রান্ত হয় তাহলে জুমের অপদেবতার বাসস্থানে জুম কাটা হয়েছে বলে ম্রোরা বিশ্বাস করে। যার কারণে অপদেবতা জুমচাষীদের গৃহলোকের উপর রাগান্বিত হয়ে প্রতিশোধ নিতে লোকদের রোগাক্রান্ত করেছে বলে ম্রোদের ধারণা। এসব অপদেবতারা কানা, খোঁড়া, নেংটা, হাজার মাথা এক লেজওয়ালা ভূত, হাজার লেজে এক মাথাওয়ালা ভূত ইত্যাদি হয়ে থাকে। জুমের সমস্ত বাৎসরিক ফসল উত্তোলনের পরিসমাপ্তির পর ঐসমস্ত অপদেবতাকে উদ্দেশ্য করে এই ধরনের জুম পূজা করা হয়। পূজার নির্দিষ্ট দিনের একদিন আগে এই পূজার আয়োজক গ্রামের সকল পরিবার থেকে একজন করে পূজায় নিমন্ত্রণ করে। ততধিক ব্যক্তি হলেও কোনো আপত্তি নেই। পূজার একদিন আগে পাহাড়ি ছড়া হতে চিংড়ি মাছ, কাঁকড়া, শামুক ইত্যাদি সংগ্রহ করা হয় এবং তার সাথে হাঙ্গর মাছের শুঁটকি রান্না করে নিয়ে যাওয়া হয়। অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি শেষ হলে পূজার দিনে প্রত্যুষে আমন্ত্রিত সবাই শূকর, মোরগ-মুরগি, ঢোল-বাজনা, হাঁড়ি-পাতিল, কলাপাতায় ভাতের মোচা ইত্যাদি প্রয়োজনমতো সঙ্গে করে নিয়ে যায়। জুমে পৌঁছে সবাই টংঘরে ওঠে এবং কে কি কাজ করবে সেই কাজের দায়দায়িত্ব ভাগাভাগি করে। তারপর যার যার দায়িত্ব অনুসারে কেহ বাঁশ সংগ্রহ করে, কেহ লাকড়ি আবার কেহ কলাপাতা সংগ্রহ করে আনে। আবার কেহ কেহ পূজার বেদী তৈরির জন্য বাঁশ দিয়ে 'ছিট' (বাঁশের ফুল) তৈরি করে।

ছিট দিয়ে দুটি পূজার বেদী তৈরি করা হয়। একটি জুমের টংঘরের মাচাং-এর উপর এবং অপরটি মাটির উপর। মাটির উপর স্থাপনকৃত পূজার বেদীটি অত্যন্ত

কারুকার্যমণ্ডিত বাঁশের ছিট দিয়ে তৈরি। পূজার বেদীতে একগুচ্ছ ধানের চারা, একগুচ্ছ আদার পাতা, একগুচ্ছ গাঁদা ফুল ও জুমের সমস্ত ফলের অবশিষ্ট ফসল রাখা হয়। অপরদিকে মাচাং-এর উপর স্থাপনকৃত পূজার বেদীতে আদা, চিংড়ি মাছ, উঁইপোকার ঢিবির মাটি, ধানের খৈ রাখা হয়।

তারপাশে আরও ১০টি ক্ষুদ্রাকৃতি পূজার বেদী সাজানো হয়। পূজার বেদীর পার্শ্বে কল্কি, বাঁশের পাইপ ঢুকিয়ে কাঁচা মদ পান করার পাত্র সাজানো হয়। তার পাশে আরও কচুপাতার উপর ধানের বীজ রেখে আরও আলাদাভাবে দুটি পূজার বেদী সাজানো হয়। পূজা পরিচালনার জন্য একজন ওঝা থাকেন। ম্রো ভাষায় ওঝাকে 'ওয়ামা' বলা হয়। এসব পূজার বেদী তৈরি শেষ হলে ওয়ামা মাটিতে পূজার বেদীর চত্বরে নৃত্য পরিবেশনের জন্য বাদক দলকে আমন্ত্রণ জানান। বাদক দল সেখানে উপস্থিত হলে 'ওয়ামা' কাঁচা মদ মুখে পুরে নিয়ে ফুঁ মেরে বাদ্যযন্ত্রের উপর ছিটিয়ে দেয় আর সাথে সাথে বাদক দল বাজনা বাজাতে শুরু করে এবং মাঝে মাঝে ওয়ামার সাথে সুর মিলিয়ে 'হিউ-হিউ-হিউ' ধ্বনি তোলে।

ম্রো আদিবাসীদের ঔয়ারী নাট

তারপর ওয়ামা মন্ত্র উচ্চারণ করে— 'কানাভূত, খোড়াভূত, নেংটাভূত, হাজার মাথা এক লেজওয়ালা ভূত, হাজার লেজের এক মাথাওয়ালা ভূতসহ এ জুমের যতো ধরনের অপদেবতা আছে, সবাই চলে এসো! আজ তোমাদের জন্য মানত করা পূজার আয়োজন করা হয়েছে। এসে দেখে যাও। উপস্থিত হও, দর্শন করো এবং খাও। এই বলে ওয়ামা অপদেবতাদেরকে পূজায় খাবার খেতে আহ্বান জানায়। এরপর আনুষ্ঠানিকতার প্রথম পর্ব শেষ হয়। প্রথম পর্ব শেষ হলে একটি খাবারের আয়োজন করা হয়। চিংড়ি মাছ, কাঁকড়া, শামুক ও হাঙ্গর মাছের তরকারি দিয়ে আহারের এ পর্ব শেষ হয়।

প্রথম পর্বের খাবার শেষ হলে গৃহকর্তা একটি মোরগকে গলা টিপে হত্যা করে। মোরগের প্রাণ ত্যাগের পূর্ব মুহূর্তে ধান কাটার কাঁচি দিয়ে মোরগের মুখ আড়াআড়িভাবে

কেটে মোরগ থেকে রক্ত ঝরানো হয়। এ মোরগের রক্ত সমস্ত পূজার বেদীতে ছিটিয়ে দেওয়া হয়। মোরগ জবাই শেষ হলে এবার শুকর বলির পালা। শুকর বলি করার পূর্বে ওয়ামা পুনরায় মন্ত্র উচ্চারণ করে–'কানাভূত, খোড়াভূত, নেংটাভূত, হাজার লেজের এক মাথাওয়ালা ভূত, হাজার মাথার এক লেজওয়ালা ভূতসহ জুমের যতো ধরনের ভূত আছে– দেখে যাও। আজ তোমাদের উদ্দেশ্যে মানত করা পূজার আয়োজন করা হয়েছে'। ওয়ামার মন্ত্র পড়া শেষ হলে পূজা বেদীর পাশে বল্লম দিয়ে শুকরকে হত্যা করা হয়। তারপর শূকর ও মোরগের মৃতদেহ কচুপাতা দিয়ে ঢেকে রেখে পূজার বেদীতে কিছুক্ষণ রাখা হয়। এরপর ওয়ামার নির্দেশক্রমে গৃহকর্তা কাঁচা মদ ও আদার জল মুখে পুরে নিয়ে শুকর ও মোরগের মৃতদেহের বাম দিক উল্টিয়ে ফুঁ দেয়। শুকর ও মোরগ বলি দেওয়ার পর শূকরের কলিজা, কিডনি, ভুঁড়ি, শূকরের চতুর্পায়ের নখ ও কান দুটি কেটে পৃথকভাবে রান্না করা হয়। রান্না শেষ হলে ওয়ামা গৃহকর্তাকে নিয়ে রান্না করা তরকারি পূজার বেদীতে সাজিয়ে পূজার মানত করা স্থানে গিয়ে অপদেবতাদেরকে খাওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানায়। তখন ওয়ামা শেষবারের মতো মন্ত্র উচ্চারণ করে বলে–'কানাভূত, খোড়াভূত, নেংটাভূত, হাজার লেজের এক মাথাওয়ালা ভূত, হাজার মাথার এক লেজওয়ালা ভূতসহ জুমের যতো ধরনের ভূত আছে–সবাই এখানে চলে এসো। তোমাদের উদ্দেশ্যে মানত করা পূজার আয়োজন করে তোমাদের জন্য খাবার এনেছি। এসো, খাও এবং পান করো। যাদের কাঁকড়া প্রয়োজন তাদের জন্য কাঁকড়া এনেছি, যাদের হাঙর মাছের প্রয়োজন তাদের জন্য হাঙর মাছের শুঁটকি এনেছি, আর যাদের শূকরের কলিজা, কিডনি, রক্ত, কান প্রয়োজন তাদের জন্য কলিজা, কিডনি, রক্ত, কান ইত্যাদি এনেছি। তোমাদের প্রয়োজনমতো তোমরা খাবার খেয়ে নাও। এরপর থেকে আর যেনো কোনো গৃহলোকের উপর তোমাদের কু-নজর না পড়ে। ওদের যাতে কোনো রোগব্যাধি ও ক্ষতি না হয়।' মানত করা পূজারস্থানে ওয়ামা ও গৃহকর্তা ব্যতিত কেউ যেতে পারে না। ওয়ামা সেখান থেকে ফিরে এলেই খাবার শুরু হয়। সবার খাবার শেষ হলে ঘরে ফেরার পালা। ঘরে ফেরার সময় সবাইকে সাজানো পূজার বেদী থেকে মদ মুখে নিয়ে পূজার বেদীতে ফুঁ দিতে হয়। বেদীতে ফুঁ দেওয়ার সময় ওয়ামা পূজার বেদী থেকে তুলো নিয়ে সবার মাথায় গুজে দেয়। এর অর্থ হলো, পূজায় অংশগ্রহণকারীদের উপর যাতে অপদেবতাদের নজর না পড়ে। তারপর সবাই বাজনা বাজাতে-বাজাতে গ্রামে ফিরে যায়। পাড়ায় আয়োজকের ঘরে পৌঁছলে পূজায় অংশগ্রহণকারীরা আয়োজকের বাড়িতে সরাসরি ঢুকতে পারে না। সেসময় আয়োজকের উঠানে প্রথমে বাদক দলকে এক কলসি কাঁচা মদ পরিবেশন করতে হয়। তারপর তারা সবাই ঘরে উঠতে পারবে। এরপর আনন্দে হৈ চৈ এবং ই হু হু উ ধ্বনি করে উল্লাস করতে করতে আয়োজকের ঘরে সাবই প্রবেশ করে। আর এর সাথে সাথেই এই অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

পূজার উপকরণ

১. প্রধান ওয়ামা (ওঝা)– ১ জন

২. সহকারী ওয়ামা (ওঝা)– ১ জন (তবে তার কোনো ভূমিকা নেই, নামে মাত্র সহকারী)

৩. শূকর– ১ টি

৪. মোরগ– ১টি
৫. শামুকের তরকারি
৬. কাঁকড়ার তরকারি
৭. হাঙর মাছের শুঁটকির তরকারি
৮. কাঁসার বাসন–(বাদ্যযন্ত্র রূপে ব্যবহৃত)– ৩টি
৯. ঢোল– ১টি।
১০. মাটির কলসি (ছোটো)– ৩টি
১১. হাঁড়ি-পাতিল (প্রয়োজন মাফিক)
১২. কলসি (প্রয়োজন মাফিক)
১৩. কলারপাতা
১৪. থ্রুং (ঝুড়ি) প্রয়োজনানুসারে
১৫. তুলা (কার্পাস)
১৬. সুতা (প্রয়োজনানুসারে)
১৭. পূজার বেদী :
    ক. মাটির উপর বড়ো ১টি
    খ. মাচাং এর উপর ১২টি

৬. পাংখোয়া পূজা-পার্বণ ও লোকউৎসব

১. সুয়াল রুন : পাংখোয়া সমাজেও অন্যান্য সমাজের মতো পূজা-পার্বণ ও উৎসব আয়োজনের প্রচলন আছে। সেসব উৎসবের মধ্যে সুয়াল রুন পূজাটি অন্যতম। এটি খুবই সংবেদনশীল এক প্রকার পূজা। যে গ্রামে পূজা করা হবে সে গ্রামে সেদিন কেউ প্রবেশ করতে পারে না। এমনকি তাদের সাথে ব্যাগ বা লাগেজ থাকলেও সাথে নিয়ে প্রবেশ করতে পারে না। সাধারণত পূজাটি দিনব্যাপী হয়ে থাকে। গ্রামে কোনো অতিথি এলেও তাকে সূর্য ডোবার আগ পর্যন্ত গ্রামের বাইরেই থাকতে হয়। পূজা সমাপ্ত হবার পর তারা গ্রামে প্রবেশ করতে পারে। এই পূজার আরও একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো– প্রতি ঘরে আস্ত মুরগি সিদ্ধ করে পরিবারের সকলে মিলে সে মুরগি ভোজন করতে হয়।

২. নাউ মারিয়াম লাক : এ উৎসবটিকে এক ধরনের সামাজিক উৎসবও বলা হয়। পাংখোয়া সমাজে এই সামাজিক অনুষ্ঠানটি বছরের শেষ দিকে পাড়ার সকল ছেলেমেয়েদের নিয়ে আয়োজন করা হয়ে থাকে। এই অনুষ্ঠান পাড়াবাসী সকল ছেলেমেয়ে, নারী-পুরুষ ও গণ্যমান্য ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হয়। মূলত শিশুদের সারা বছরের সুস্বাস্থ্য কামনা করার উদ্দেশ্যেই এই উৎসবটি করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রচুর খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়।

লোকমেলা

পইংজ্রা (রাজপুণ্যাহ) মেলা

বান্দরবান পার্বত্য জেলাকে বলা হয় বোমাং সার্কেল। এই বোমাং সার্কেলে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার কিছু মৌজাও অন্তর্ভুক্ত আছে। সার্কেলের প্রধানকে বলা হয় রাজা। বান্দরবান পার্বত্য জেলা যেহেতু বোমাং সার্কেল তাই বোমাং সার্কেলের রাজাকে বলা হয় 'বোমাং রাজা'। তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার শাসনকার্য পরিচালনার সুবিধার্থে সার্কেলকে বিভিন্ন মৌজায় বিভক্ত করে। মৌজাগুলি কয়েক গ্রাম বা পাড়া সমন্বয়ে গঠিত হয়। মৌজার প্রধানকে হেডম্যান ও পাড়া বা গ্রামের প্রধানকে কারবারি বলা হয় হেডম্যান ও কারবারিদের মাধ্যমে সার্কেলের রাজা এলাকার জুম ও গ্রোভল্যান্ড চাষকারীদের কাছ থেকে নির্দিষ্ট দিনে রাজদরবারে স্বশরীরে উপস্থিত হয়ে খাজনা আদায় করেন। খাজনা আদায়ের এই বিশেষ ঐতিহ্যবাহী অনুষ্ঠানটি মারমা ভাষায় 'পইংজ্রা' আর বাংলা ভাষায় 'রাজপুণ্যাহ' নামে অভিহিত।

প্রতিবছর জুমের ফসল তোলার পর এটি অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। কয়েকদিনব্যাপী অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানটি সাধারণত রাজবাড়ির দরবার হলের সামনে হয়। সাধারণত প্রতি বছর ডিসেম্বর, জানুয়ারি মাসে জুমের ফসল তোলার মৌসুমেই এই অনুষ্ঠান হয়। অনুষ্ঠানের দিনক্ষণ নির্ধারণের পর প্রতিটি মৌজার হেডম্যান, কারবারি ও অভিজাত ব্যক্তিদের কাছে নোটিশ দিয়ে রাজপুণ্যাহ অনুষ্ঠানে এসে 'অইং' বা উপহারসহ জুমের খাজনার টাকা পরিশোধ করে দেওয়ার জন্য আহবান জানানো হয়। এর আগে প্রতিটি হেডম্যানকে জুমচাষী পরিবারের তালিকার তৌজি প্রস্তুত করে রাখতে বলা হয়।

রাজপুণ্যাহ অনুষ্ঠানে বোমাং রাজা ও অতিথিবর্গ

রাজপুণ্যাহ অনুষ্ঠানের দিন অনুষ্ঠানের শুরুতে রাজা পঞ্চশীল গ্রহণ করে পূত-পবিত্র থাকেন। সকাল বেলায় রাজা রাজবাড়িতে ঐতিহ্যবাহী রাজকীয় পোশাক পরে আমন্ত্রিত অতিথিদের উপস্থিতিতে বয়োজ্যেষ্ঠদের কাছ থেকে শুভেচ্ছা গ্রহণ করেন। এরপর ঐতিহ্যবাহী রাজপোশাক পরেই রাজা দরবার হলের দিকে শুভযাত্রা করেন। রাজা দরবার হলের দিকে যাত্রার সময় রাজার ঐতিহ্যবাহী যন্ত্রীদল বাদ্যযন্ত্র বাজাতে থাকে. এসময় রাজার নিজস্ব সিপাই বা সৈনিকরা রাজাকে অভিবাদন জানায়। রাজা দরবারে আগমনের সময় রাজার মাথার উপর একজন লোক সোনালি ছাতা ধরে রেখে রাজাকে ছায়া প্রদান করে। রাজার যাত্রাপথে দু'ধারে সুসজ্জিত কিশোরীর দল রাজা এবং রাজার সহযাত্রী অতিথিবর্গকে ফুলের পাঁপড়ি ছিটিয়ে সম্মান জানায়। একটি নির্দিষ্ট মঞ্চে সুসজ্জিত আসনে রাজার উপবেসনের পর সকল হেডম্যান, কারবারি, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ও সমবেত বিভিন্ন পাড়া বা গ্রামের লোকজন রাজাকে অভিবাদন জানিয়ে তার পাশে বসেন এরপর তালিকা থেকে একজন ঘোষকের ঘোষণা অনুযায়ী হেডম্যানগণ মৌজার প্রজাগণের পক্ষ থেকে একে একে জুমের খাজনা প্রদান করেন। খাজনা প্রদানের সময় রাজার সম্মানার্থে উপঢৌকন হিসেবে রাজাকে মোরগ-মুরগি ও একবোতল করে মদও ঐতিহ্যগতভাবে প্রদান করা হয়। প্রতি জুম থেকে রাজা ৬.৭৫ টাকা, হেডম্যান ২.২৫ টাকা ও সরকার ২.০০ টাকা পেয়ে থাকে। ঐদিন রাতে রাজা আমন্ত্রিত অতিথিদের সম্মানার্থে একটি ভোজসভার আয়োজন করেন। এই ভোজসভার ব্যয়ভার বহনে হেডম্যান কারবারিদেরও সাধ্যমতো অংশীদারিত্ব থাকে।

অনুষ্ঠান উপলক্ষে একটি ঐতিহ্যবাহী বড় মেলা বসে। মেলা সাধারণত ৩-৭দিন স্থায়ী হয়। এই মেলায় সৌখিন দ্রব্যাদি, প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ইত্যাদি বেচাকেনা হয়। মেলায় সার্কাস, ম্যাজিক শো, পুতুল নাচ, থিয়েটার প্রদর্শনী প্রভৃতির ব্যবস্থা থাকে। এই মেলায় বন্ধু-বান্ধব, চেনা-পরিচিতজনদের মধ্যে বিভিন্ন রকমের মুখরোচক খাবারের আপ্যায়ন, খোশ-আলাপ, রসিকতা, অনেকসময় উদ্দেশ্যবিহীন এধার-ওধার ছুটে চলা ইত্যাদিতে সকলে দিবানিশী মশগুল থাকে। আদিবাসীদের দোকানগুলোতে তাদের বিভিন্ন রকমের উপাদেয় খাবার পাওয়া যায়। সেই দোকানগুলোতে আদিবাসীদের নিজস্ব তৈরি পানীয় তাদের কায়দায় পরিবেশন করার মনকাড়া এক অভূতপূর্ব দৃশ্য চোখে পড়ে। এভাবে সামগ্রিক আনন্দঘন পরিবেশে মেলা অতিবাহিত হয়। মেলা সমাপ্তের দীর্ঘদিন পরও মেলার রেশ মানুষের মনে দাগ কেটে যায়। এই মেলাকে ঘিরে প্রত্যেকের কিছু না কিছু স্মৃতি চিরঅম্লান হয়ে থেকে যায়।

রাজপুণ্যাহ মেলার আরেকটি বিশেষত্ব হলো, বিভিন্ন এলাকার অর্থাৎ সমস্ত বোমাং সার্কেলের লোকেরা এই অনুষ্ঠানে বা মেলায় দেখা-সাক্ষাৎ, আলাপ-পরিচয় এবং পারস্পরিক ভাব-বিনিময়ের সুযোগ পায়। এই মেলা রাজাকে রাজ-মহিমায় আপন সাংস্কৃতিক আবহের মধ্যে অতি ঘনিষ্ট হয়ে দেখা এবং জানার এক দুর্লভ সুযোগ সৃষ্টি করে দেয় এবং অনেকে মনে করেন রাজা দর্শন করা একটি পুণ্যের কাজ।

লোকাচার

ক. ত্রিপুরা পূজা-পার্বণ

১. গরাইয়া পূজা : ত্রিপুরাদের গরাইয়া পূজা হলো বৈসু উৎসবের অন্যতম একটি পূজা। পরিবারের সকলের মঙ্গল কামনাই হলো এই পূজার মূল উদ্দেশ্য। পারিবারিকভাবে যারা কিছুটা স্বচ্ছল তারাই এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকে। বিশেষ কিছু উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে অনেকেই মানত করে থাকেন। সেই মানত পূরণের জন্য সাধারণত এই গরাইয়া পূজা ত্রিপুরারা করে থাকেন। তবে বিশেষভাবে মানত না করে থাকলে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় না। তবে প্রতিবছর যে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে হবে এ ধরনের তেমন কোনো বিধিবিধান নেই। এই পূজা আয়োজনের উদ্দেশ্যে একটি সুনির্দিষ্ট দল গঠন করা হয়। তার মধ্যে আয়োজক পরিবারের একজন সদস্য, গ্রামের একজন সর্দার, পূজা অর্চনার জন্য অচাই (মন্ত্র পাঠকারী) ও তান্ছুই (পশু বলিদানকারী) থাকে।

২. কের পূজা : 'কের' শব্দটির অর্থ হলো গণ্ডি বা বেষ্টনি অতি প্রাচীনকাল থেকে ত্রিপুরা মহারাজারা রাজ্য ও রাজ্যবাসীকে সকল প্রাকৃতিক দুর্যোগ, মহামারী, শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য এই কের পূজার আয়োজন করতেন। পরে বাস্তবতার কারণে রাষ্ট্র সীমানার মধ্যে বিস্তৃত না রেখে অঞ্চল বা গ্রাম এলাকার সীমারেখার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয়। কের পূজা বিভিন্ন নামে অভিহিত। যেমন : গ্রামসীমার মধ্যে অনুষ্ঠিত হলে 'গ্রামমুদ্রা' অঞ্চল পর্যায়ের হলে 'মহামুদ্রা' রাষ্ট্রীয়ভাবে হলে 'রাজমুদ্রা' নামে অভিহিত করা হয়। সাধারণত বাংলাদেশের ত্রিপুরাদের মধ্যে কের পূজা হয়ে থাকে গ্রামভিত্তিক। কের পূজা গ্রামবাসীদের সমবায়ভিত্তিক এক সার্বজনীন পূজা। এই পূজায় গ্রামের সকলেই অংশগ্রহণ করে। কের পূজা একদিকে যেমন পূজা তেমনি অপরদিকে উৎসবও বটে। গ্রামবাসী বছরে দু'বার কের পূজার আয়োজন করে থাকে। একবার মহিষ বলি দিয়ে, অন্যবার শূকর ও ছাগল বলি দিয়ে এই পূজা করা হয়। এই পূজাটি সাধারণত ছড়ার গাঙে করা হয়ে থাকে। কের পূজা গ্রামের সকল শ্রেণির মানুষের এক মিলনমেলাও বটে। পূজার সময় মহিষ বলি দেবার দৃশ্য দেখার জন্য গ্রামের আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সকলে ছড়ার গাঙে চলে যায়। কের পূজার জন্য বাঁশ কেটে ও বেতের কারুকার্য করা পূজার সরঞ্জামাদি দিয়ে একটি পূজার বেদী তৈরি করতে হয়। যা দেখতে খুবই সুন্দর। কের পূজার দিনে অন্য গ্রামের মানুষেরা যে গ্রামে কের পূজা করা হয় সেই গ্রামে প্রবেশ করতে পারে না। কেউ যদি জেনে বা না জেনে গ্রামে প্রবেশ করে তাহলে তাকে পূজার নিয়ম অনুযায়ী জরিমানা দিতে হয়।

৩. সিমতৌং পূজা : সিমতৌং হলো প্রয়াত পূর্বপুরুষের মঙ্গল কামনায় তাদের উদ্দেশ্যে প্রদীপ প্রজ্জ্বলন। বৈসু সংক্রান্তির আগে বিশেষ করে বসন্তকালে ত্রিপুরারা

প্রয়াত পিতৃপুরুষদের পারলৌকিক মঙ্গল কামনায় বংশপ্রদীপ জ্বালিয়ে একটি পূজার আয়োজন করে থাকে। এ পূজার নাম সিমতৌং। সাধারণত সামর্থবান উত্তরাধিকারী ব্যক্তিরা সিমতৌং পূজার আয়োজন করে থাকে। সিমতৌং পূজা আয়োজকেরা একটি ভোজসভারও আয়োজন করে থাকেন। এ পূজার জন্য বিশেষ কারুকার্য ও আকর্ষণীয় বাঁশের চাকলা তৈরি করতে হয়। প্রতিটি চাকলায় পাঁচটি বা সাতটি প্রদীপ জ্বালানো হয়। এই পূজায় 'চোন্তাই' যখন প্রয়াত পিতৃপুরুষদের একে একে নাম ধরে সংকল্প বাক্য উচ্চারণ করে, তখন ঢোলের 'গ্রীচাং গ্রীচাং' বোলে আত্মীয়স্বজন ও অভ্যাগতরা বিশেষ ভঙ্গিমায় এই প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে। সিমতৌং পূজার দৃশ্য অতিশয় মনোরম ও অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী। সিমতৌং পূজার উপাস্য দেবতার নাম হলো 'মাতাই কতর'।

৪. চুমলাই পূজা : পারিবারিক অশান্তি দূর করে সংসারে সুখ ও শান্তি আনয়নের জন্য, যশ ও খ্যাতি বৃদ্ধির জন্য, ধন ও সম্পত্তি লাভের জন্য এবং আপদ-বিপদ থেকে পরিত্রান লাভের জন্য এ চুমলাই পূজার আয়োজন করা হয়ে থাকে। চুমলাই পূজার উপাস্য দেবতা হলো 'মুকুদ্রায়' বা 'নকসু মাতাই'। সাধারণত শরৎকালে এ পূজা অনুষ্ঠিত হয়। ভাদ্র মাসে জুম ক্ষেতের ফসল ঘরে তোলা শেষ হলে যে নবান্ন উৎসব ত্রিপুরারা করে থাকে তাই চুমলাই নামে পরিচিত। এই উৎসবকে নবান্ন উৎসবও বলা চলে। চুমলাই সিদ্ধিদাতা দেবতা, তিনি 'কাথার' অর্থাৎ পবিত্র। ত্রিপুরা সমাজে বিয়ের অনুষ্ঠানে চুমলাই পূজা অবশ্যই দিতে হয়।

খ. চাক লোকউৎসব : পূজ-হেক্কা

চাক সম্প্রদায়ের বিশ্বাস অনুসারে যে কোনো শুভ কাজের জন্য তারা মানত করে থাকেন। ছেলেমেয়েদের শিক্ষায় উন্নতি লাভ, চাকুরিতে সফলতা, জুমের ফসল যেন বন্যপ্রাণী ও পোকামাকড়ে নষ্ট না করে, সংসারের যাতে মঙ্গল হয় ইত্যাদির জন্য চাকরা সাধারণত মানত করে থাকেন। এ মানতকে চাক ভাষায় 'পূজ-হেক্কা' বলে। বাংলাদেশে সর্বত্রই সব সম্প্রদায়ের মানতের প্রচলন রয়েছে। এই পাহাড়ি জনপদে বসবাসকারী চাক সম্প্রদায়ের পূজ হেক্কা সম্পর্কে বর্ণনা করা হলো, যা বাস্তবেও চাকরা করে থাকে। পূজ হেক্কার মানত কার্যসম্পাদন করা হয় খাল-ছড়ার পানির কাছাকাছি। পূজ হেক্কাতে প্রয়োজন হয় প্রথমে ৯-১০ ইঞ্চি লম্বা দুটি বাঁশের চোঙা, যার উপরের মাথার গিঁট কেটে সরু করা হয়। চোঙার উপরের আবরণ পাতলা করে নীচ থেকে উপরের দিকে সরু ও পাতলা করে বাকল ওঠানো হয় ও পরে পছন্দমতো প্রাপ্ত ফুল প্রবেশ করানো হয়। আর বাঁশের সরু চোঙার অপর মাথার গিঁট কেটে তা সোনালি র‍্যাপিং পেপার দিয়ে মোড়ানো হয়। বাঁশের চোঙা দুটি এক বিয়ৎ (৯ ইঞ্চি) দূরে দূরে একটু কাৎ করে কাঁদামাটির ভেতর পুঁতে দিতে হয়। চোঙার মাঝখানে কলাগাছের কাঁচাপাতা রেখে তাতে ভাত রাখা হয় এবং ভাতের উপর দুটি কাঁচা ডিম রেখে দিতে হয়। তারপর একহাত লম্বা দুটি খুঁটি উক্ত চোঙার পাশাপাশি মাটিতে বাঁকা করে পুতে দিয়ে বাঁশের খুঁটির মাথায় সাদা সুতার দু'-তিনটি পেচ দিয়ে গিঁট মেরে দিতে হয়। এরপর উদ্দেশ্য হাসিলের লক্ষ্যে পূজ হেক্কা মানত করা হয়। এ কাজটি গোপনীয়ভাবে করা যায় আবার আনুষ্ঠানিকভাবে বা প্রকাশ্যে দিনে কিংবা রাতেও সম্পাদন করা যায়।

গ. ল-বনা/ল-আরেং নাই (জুম পূজা)

ল-বনা পূজাটি জৈষ্ঠ্য-আষাঢ় মাসে পালন করা হয়। এই পূজাটিও এক প্রকারের প্রকৃতি পূজা। এই পূজার উদ্দেশ্য হলো সারা বছর যে জুমে ধান চাষ করে সে কাজ করে যেনো পরিশ্রমের বিনিময়ে ভালো ধান পায়। এই পূজাটি শুধু নিজ পরিবারের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। পূজার দিনে পরিবারের সবাইকে জুমে উপস্থিত থাকতে হয়। এই পূজার জন্য একটি মুরগি ও একটি ডিম নিয়ে যাওয়া হয়। জুমের একটি বিশেষ জায়গা প্রথমে পরিষ্কার করার পর সেখানে বাঁশের খুঁটি গেঁথে একটি পূজার বেদি তৈরি করা হয়। পূজার বেদিতে বাঁশের তৈরি ছোটো খাঁচা বসানো হয়। তারপর দেবতার উদ্দেশ্যে গৃহকর্তা মন্ত্র পাঠ করে। মন্ত্র পাঠ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মুরগি কেটে মুরগির রক্ত খাঁচার উপর ছিটিয়ে দেওয়া হয়। সেই সাথে ডিমও ভেঙে দিয়ে মুরগির রক্তের সাথে মিশিয়ে খাঁচায় ছিটিয়ে দেওয়া হয়। এরপর পূজার বেদির পাশে বাঁশের খুঁটির উপর ডিমের খোসা গেঁথে দিতে হয়। তারপর জবাই করা মুরগির মাংস রান্না করে সবাই মিলে খেয়ে বাড়িতে ফিরে আসে। তবে এই পূজায় কোনো পাড়া বন্ধ কিংবা বাড়ি বন্ধ রাখা হয় না।

চো-প-না (ধান পূজা)

এই পূজাটি সাধারণত জুমের ধানগাছ যখন বাড়ন্ত অবস্থায় থাকে তখনই করা হয়ে থাকে। এই পূজার উদেশ্য হচ্ছে, পূজার সামগ্রী উৎসর্গ করে ধানের দেবতাকে সন্তুষ্ট করা। এই পূজাও শুধু নিজ পরিবারের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। তবে এ পূজায় পাড়াবাসীকেও নিমন্ত্রণ করতে পারে। এ পূজা শুধু একটি শুকর ও একটি মোরগ দ্বারা সম্পন্ন করা যায়। এই পূজার বিশেষত্ব হলো, পূজার কয়েকদিন আগে একটি জ্যান্ত টুনটুনি পাখি এবং একটি জ্যান্ত সাদা ইঁদুর জোগাড় করে নিতে হয়। জ্যান্ত টুনটুনি ও জ্যান্ত সাদা ইঁদুর না পেলে এ পূজার আয়োজন করতে পারে না। টুনটুনি ও ইঁদুর জোগাড় হয়ে গেলেই পূজার দিন ঠিক করা হয়। যেদিন পূজার আয়োজন করা হবে সেদিনে ভোরে পূজায় অংশগ্রহণকারীরা পূজার আয়োজকের ঘরে এসে জমায়েত হয় এবং জুমের উদ্দেশ্যে একসাথে রওনা দিতে হয়। জুমে পৌছলে জুমের টংঘরের সাথে সংযুক্ত করা মাচাং-এর উপর কলাপাতা বিছিয়ে জুমের ছোটো ছোটো পাথর সংগ্রহ করে এনে কলাপাতার উপর রাখা হয়। তারপর শুকর ও মুরগি জবাই করে শুকর ও মুরগির রক্ত সেই পাথরের সাথে মিশানো হয়। খুমীরা বিশ্বাস করে যে, এই ছোটো ছোটো পাথরগুলি তাদের জুমের ধানকে উর্বর করে দেবে। পরে পশুর রক্ত জুমের ধানের উপর ছিটিয়ে মন্ত্র পাঠ করা হয়। মন্ত্রটি হলো :

পৈছৈ চোপ- আঁ আ হে
আগুং চেপ চোলে লাই হে
মিছো চেপ পোওয়াই অহে
চো পো পো পো লংলং হে।

খুমীদের ভাষায় জুমের দেবতাকে 'থিথো' বলা হয়। তাই তারা তাদের থিথোকে খুশি করার জন্য মদ, শূকর ও মোরগের কিছু মাংস, কলিজা, হৃৎপিণ্ড, গিলা এবং টুনটুনি ও ইদুরের মাংস কঁচুপাতার উপর সাজিয়ে জুমের বিশেষ একটি জায়গায় তাদের থিথোর উদ্দেশ্যে পরিবেশন করে। পরে ওঝা ছোটো ছোটো পাথরগুলি একটি ছোটো বেতের খাঁচায় ভরে একটি থুরুং (ঝুড়ি)এর মধ্যে রেখে একগুচ্ছ ধানের শীষ নিয়ে সেই থুরুংএর মধ্যে ঝেড়ে ঝেড়ে বলতে থাকে 'তোমার উদ্দেশ্যে আমরা পূজা করলাম তুমি আমাদের পূজা গ্রহণ কর এবং আশীর্বাদ কর যাতে বিগত বছরের চেয়ে এই বছর আমাদের ফসল ভালো হয়'। তারপর সে থুরুং-এর ভেতর ঝাড়ানো ধানের উপর মদ ও 'গাংজি' (এক ধরনের মদ) মুখে নিয়ে ফুঁ দিতে হয়।

খুমীদের ধান পূজা

তারপর থুরুং-এর ভেতর রাখা যাবতীয় দ্রব্য নিয়ে টংঘরে গিয়ে ধানের উপর এগুলো ঢালতে হয় এবং পাশে থেকে আরেকজন ওঝা এসে মুখে মদ ও গাংজি পানি নিয়ে ফুঁ দেবে এবং এই বলে মন্ত্র পাঠ করে যে, 'সারা বছরের খাবার খোরাকি হয় এমন ভালো ফসল আমাদের দাও'। এরপর জবাই করা মোরগ ও শুকর রান্না করা হয়। পরে জুমের দেবতা, মাটি ও সৃষ্টিকর্তার নামে কিছু অংশ খাবার উৎসর্গ করা হয়। এই পূজায় তিনজন লোককে মহাজন সাজতে হয়। সেই তিন মহাজনকে তিনটি ভাগের খাবার পরিবেশন করতে হয়।

এ পূজায় জুমের দেবতাকে খাবার পরিবেশন করা হয় ভালো ধান উৎপাদন হওয়ার জন্য। মাটিকে খাওয়ার পরিবেশন করা হয় মাটি পূজার সাক্ষী হিসেবে এবং ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে খাবার পরিবেশন করা হয় সৃষ্টিকর্তাকে প্রশংসা করে। ঈশ্বরকে খাবার পরিবেশন করতে হয় টংঘরের চালের উপর এবং মাটির জন্য খাবার পরিবেশন করা হয় টংঘরের ওঠার সিঁড়ির তলে। এরপর পূজায় অংশগ্রহণকারীরা শুকরের মাংস, মুরগি ও মদ পান করে আনন্দ উল্লাস করে। তখন যুবক-যুবতীদের জন্য আরেক স্থানে

আনন্দ উপভোগ করার ব্যবস্থা থাকে। সে সময়ে যুবক-যুবতীদের জন্য একটি চ্যালেঞ্জের আসরের ব্যবস্থা করা হয়। এই চ্যালেঞ্জের আসরকে খুমী ভাষায় 'আঠাই পাং' বলে। সে খেলায় যুবতীরা বাঁশের চুঙার মধ্যে পানি ভরে গাংজির (কাঁচা মদ) কলসের ঠিক উপরে ঝুলিয়ে রাখবে। সেখান থেকে ছিদ্র করে চোঙার পানি গাংজির কলসির মধ্যে পড়তে থাকবে। সে গাংজির কলসিতে পড়া পানি একটি বাঁশের নল দিয়ে যুবকদের মধ্য থেকে যে কোনো একজন এসে পান করবে। চোঙা থেকে পানি পড়া শেষ না হওয়ার পর্যন্ত যুবকটি সে কলসির গাংজি পান করতে হবে। করতে না পারলে তবে সে পরাজিত হবে আর পান করতে পারলে যুবতীরা হেরে যাবে। এই বাজিতে যুবকরা জিতলে যুবতীদের পক্ষ থেকে যুবকদেরকে জরিমানা হিসেবে এক বোতল মদ দিতে হয়। আর যদি যুবতীরা জয়ী হয় তাহলে যুবকদের পক্ষে যুবতীদেরকেও জরিমানা দিতে হবে একইভাবে এক বোতল মদ দিয়ে।

ঘ. তোয়ো য়ানা (ঝিরি পূজা)

আদিকাল থেকে খুমী আদিবাসীরা এ পূজাটি করে আসছে। এ পূজাও নিসা আঁনা পূজার মতোই। একমাত্র উদ্দেশ্য ঝিড়ির দেবতাকে সন্তুষ্ট করা। এই পূজায় বলি দিতে হয় একটি মুরগি ও একটি ছাগল। ডিম ও ময়দা লাগে এই পূজার উপকরণ হিসেবে। এই পূজার আয়োজন করতে হয় জুমের ধান থেকে যখন ধানের শীষ বের হতে শুরু করে তখন। এই পূজার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে জুমের ধান যেন কোনো প্রকারে খারাপ না হয়। ফসলের যেনো অনেক ফলন হয়।

ঙ. উং-অ-বনাই (ঘর পূজা)

এ পূজাটি করা হয় যখন পরিবারের মধ্যে কেউ অসুস্থ থাকে এবং যখন কোনো ওষুধ বা চিকিৎসা দ্বারা রোগটি নিরাময় না হয়। কারণ খুমীরা বিশ্বাস করে যে, প্রতিটি ঘরের লোকদের জন্য আলাদা-আলাদাভাবে দেবতা আছে যা তাদের বিভিন্ন অসুখ-বিসুখ এবং বিপদ থেকে রক্ষা করে থাকে। তাই এই পূজাটি সেই ঘরের দেবতাকে উদ্দেশ্য করে করা হয়। কোনো পরিবারে দীর্ঘদিন ধরে অসুখ হলে এবং অনেক চিকিৎসার পরও সুস্থ না হলে। ঘরের দেবতার উদ্দেশ্যে গরু বা যে কোনো প্রাণী বলি দেবার বিনিময়ে অসুস্থ লোকটির সুস্থতা কামনা করে মানত করা হয়। তারপর যদি তারা লক্ষ করে যে, ঐ মানত করার পর অসুস্থ ব্যক্তিটি ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে ওঠে তবে তারা ধরে নেয় যে, অবশ্যই এ ঘরের দেবতার পূজা করতে হবে। এ পূজার পিছনে একটি লোকগল্পও প্রচলিত রয়েছে। কথিত আছে, এক রাজ্যে এক রাজকুমারী একদিন নদীতে স্নান করতে গিয়ে হারিয়ে যায়। অনেক খোঁজ করার পরও তাকে খুঁজে না পাওয়ায় রাজা-রাজকন্যাকে খোঁজার জন্য সব জায়গায় লোক পাঠালো। পাহাড়, জঙ্গল সব জায়গায় খোঁজ করলো কিন্তু তার আর কোনো খোঁজ পাওয়া গেলো না। একদিন রাজ্যের লোকেরা নদীর কিনারে দেখতে পেল কুমিরের কঙ্কাল। তারা রাজাকে সে খবর দিলো। রাজা কুমিরের কঙ্কাল দেখে মনে করলেন যে, তার মেয়েকে কুমিরে খেয়ে ফেলেছে।

রাজার মনে সন্দেহ জেগেছে যে, এই ঘটনার একমাত্র কারণ হচ্ছে ঘরপূজা না করা। তখন রাজা রাজ্যের সবাইকে এই 'উং-অ-বনাই' পূজা করতে আদেশ দেন। তখন থেকেই কেউ অসুস্থ হলে খুমীরা এই ঘরের পূজার আয়োজন করে। এই পূজা আয়োজনের সময় বাঁশের বেতে কুমিরের কঙ্কাল বানিয়ে মাচাং ঘরের ওঠার সিঁড়ির পাশে ঝুলিয়ে রাখে। পূজার দিন পাড়ার মুরুব্বি বা ওঝা বলি করা পশুর রক্ত দিয়ে কুমিরের কঙ্কালের উপর ছিটিয়ে মন্ত্র পাঠের মধ্য দিয়ে পূজা করা পশু উৎসর্গ করে। পরে বলিদান করা গরুর মাংস রান্না করে পাড়ার সবাই মিলে খেয়ে শান্তির জন্য ঐ দেবতার প্রতি সন্তুষ্ট প্রকাশ করে।

চ. বম পূজা-পার্বণ

১. বলশান পূজা (Bawlsan)

বম আদিবাসীরা এককালে জড়োপাসক ছিলো। জড়োপাসক বম জনগোষ্ঠীর মধ্যে ভূত-প্রেত, ঝাঁড়ফোঁক, মন্ত্রতন্ত্র, ওঝা-বৈদ্য এবং জ্যোতিষবিদ্যার প্রতি অগাধ বিশ্বাস ছিল বমরা খুজিং-পাথিয়ানকে বিধাতা পুরুষ মানে তিনি স্রষ্টা, তিনি কখনো রুষ্ট হন না, তিনি সদা কল্যাণকামী। তাই বমদেরকে খুজিং বা পাথিয়ান-এর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে পূজা, যজ্ঞ, বলিদান, অর্ঘ্য-নিবেদন কিছুই করতে হয় না। কেননা, তিনি কারো অমঙ্গল করেন না। যত পূজা, যজ্ঞ, অর্ঘ্য নিবেদন সবই অপদেবতাদের উদ্দেশ্যে। কারণ যতো অকল্যাণ, জ্বরাব্যাধি-মৃত্যু, ফসলহানি, খরা-অনাবৃষ্টি, প্লাবন, মহামারী সবই তাদের কীর্তি। তাদের তুষ্ট বিধানের জন্যই যতো পূজা, অর্চনা, যজ্ঞ, বলিদান, অর্ঘ্য নিবেদন আবেদনের আয়োজন। তদুদ্দেশ্যে হরেক রকমের বিচিত্র নিয়ম-কানুনের মাধ্যমে যে পূজা, অর্চনা ও বলিদান তারই নাম 'বলশান' (Bawlsan) সমস্ত বলশানের পৌরহিত্য করেন 'বলপু' (Bawlpu)। ১৯১৮ সন হতে বম জনগোষ্ঠী পর্যায়ক্রমে খ্রিষ্ট ধর্মে দীক্ষিত হওয়াতে বর্তমানে এদের ধর্মীয় বিশ্বাসে পরিবর্তনের পাশাপাশি সামাজিক রীতিনীতিতেও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এসেছে। বমদের জীবনধারণের প্রধান অবলম্বন জুম চাষকে কেন্দ্র করেই 'বলশান' পূজা-পার্বণ। বছরের বিভিন্ন সময়ে কোনো না কোনো উদ্দেশ্যে বিভিন্ন পদ্ধতিতে পূজা-পার্বণগুলো আয়োজন করা হয়।

২. খুয়া-টৈম (পাড়া শুদ্ধিকরণ)

খুয়া-টৈম বা পাড়া শুদ্ধিকরণ অনুষ্ঠান বমদের অতি গুরুগম্ভীর অত্যাবশ্যকীয় অনুষ্ঠান। পাড়া বা গ্রামের কল্যাণ কামনায় খুয়া-টৈম বা পাড়া শুদ্ধিকরণ অনুষ্ঠান পালন করা হয়। পাড়ার লোকের অসুখ-বিসুখ, জুমের ধানের শীষে রোগে আক্রমণ করা, ভুট্টার গাছ বা কুমড়ার লতা লিকলিকে শীর্ণকায় হওয়া, এসবই 'জল খুরী' অপশক্তির কারণে বলে বমরা মনে করে। পাড়ার লোকজনের কোনো অসুখ-বিসুখ হলে সে পাড়ায় 'জল খুরী' আস্তানা গেড়েছে বলে বমরা বিশ্বাস করে। তার অশুভ ছায়া পড়েছে বলেই তারই কারণে যত অকল্যাণ, অসুখ-পীড়া, জ্বরা-মৃত্যু আর ফসলহানি। তাকে পাড়া থেকে বিতাড়িত করতে হবে, এই অপশক্তি বিতাড়নের জন্যে যে মহা আয়োজন তাই হলো পাড়া শুদ্ধিকরণ বা খুয়া-টৈম। পাড়া শুদ্ধিকরণ এই অনুষ্ঠানে পাড়ার শিশু, নারী, পুরুষ, যুবক সকলের অংশগ্রহণ অত্যাবশ্যক।

এই অনুষ্ঠান করার জন্য গ্রামের লোকেরা নাম জানা, না জানা বিভিন্ন গাছের শিকড়, বাকল, লতাগুল্ম, আধপোড়া খড়ি, কয়লা, নানানরকম পশুর হাড়ের টুকরা, মাটির হাঁড়ির ভাঙা টুকরা সংগ্রহ করে পাড়ার মধ্যস্থানে সমান জায়গায় স্তূপ করে রাখে। লতাগুল্ম, গাছের শিকড় বাকলগুলো কুচি কুচি করে কাটে। হলুদ ও চুনা মিশ্রিত পানি মিশিয়ে ওগুলোকে রঙ করিয়ে নেয়। এই মিশ্রণগুলো পাড়াময় ছিটানো হয়। প্রতিটি মানুষের ঘরে, মুরগির ঘরে, গোলাঘরে, ঢেঁকিশালায়, গরুর ঘরে, ঘরের মাচার নীচে, পোকার গর্তে, মাটির ফাঁকফোকড়ে সর্বত্রই ঐ মিশ্রণ ছিটানো হয়। মিশ্রণ ছিটানোর আগে পাড়ার 'বলপু' পুরোহিত মশাই এক মুঠি মিশ্রণ হাতে নিয়ে বিড় বিড় করে মন্ত্র উচ্চারণ করে :

'পাড়ার যত অকল্যাণের সৃষ্টিকারী তুই, নাম তোর কি জানি না
তোর আস্তানা ঠিক কোন গর্তে জানি না, কাঁকড়ার গর্তে?
গাছের ফাঁকফোকড়ে? ছনের চালের কোনো কোণায়? নাকি
কোনো মানুষের নাকের কিংবা কানের গর্তে? যেথায় ঠাঁই নিস না কেন
আজ তোর বিদায়। যা, দূর হ, ঐ দূর পর্বত শৃঙ্গে যা,
পূর্ব কি পশ্চিম উত্তর বা দক্ষিণ তোর তো সীমাহীন আস্তানা,
সেথায় চলে যা'।

মঙ্গল প্রার্থনার পর নারী-পুরুষ চুন এবং হলুদের ভাঁড়ে চুবানো রঙিন করা ফিতা কেউ হাতে, কেউ গলায়, কেউ কানে পরে। এ ফিতাকে এক সপ্তাহ গায়ে রাখার নিয়ম রয়েছে। বেলা প্রায় পড়ে এলে গ্রামের চারদিকে ডাকডাকি, খোঁজ-খবর, প্রতিটি নর-নারীর গ্রামে ফেরা চাই। নয়তো ভোগান্তি আছে। সে সময় পাড়ার সব বাড়ির লোক গণনা করা হয়। পাড়ার বাইরে আর কেউ নেই—এটা নিশ্চিত হবার পর চার হাত লম্বা বাঁশের ফালি দিয়ে রামধনুর মতো করে পুঁতে পাড়াতে প্রবেশ করার সকল পথ বন্ধ করে দেওয়া হয়। সে সময় পাড়ার কোনো লোকের বাইরে যাওয়ারও নিয়ম নেই, অন্য গ্রামের লোকদের প্রবেশেরও নিয়ম নেই। অনুষ্ঠানের রাত আর তার পরের দিন গোটা গ্রামবাসীকে অন্যান্য গ্রাম থেকে বিচ্ছিন্ন, সংযোগবিহীন হয়ে থাকতে হয়। গ্রামের কারো বাড়ির উঠানে, আঙ্গিনায় বা চালে এক টুকরা কাপড়ও টাঙানো থাকতে পারবে না। কারণ কোনো কাপড়চোপড় বিশেষ করে মেয়েদের পরিধানের বস্ত্র ঘরের বাইরে থাকা এই 'পাড়া শুদ্ধি' বা গ্রাম শুচিকরণ অনুষ্ঠানকে অকার্যকর করে দেয়। এই খুয়া-টেম বা পাড়া শুদ্ধির দিনে দৈনন্দিনের হরেক রকম কার্যাদিও নিয়মমাফিক সম্পন্ন করতে হয়। বিশেষ রীতিতে অতি সতর্কতায় ঝরনার পানি তুলতে হয়। পিঠে করে লাউয়ের খোলে পানি আনার সময়ে কারোর পিঠ বা কাপড় ভিজলে খুয়া-টেম বা পাড়া শুদ্ধি অনুষ্ঠানকে অকার্যকর করে দেয়।

পাড়ার সকল নারী-পুরুষ সেই অপশক্তি বিতাড়নের মহৌষধি মিশ্রণ যে যার থুরুং এ ভরে নেয়। হাতে একখানা শলা ঝাড়ুর মতো ফালি ফালি করা প্রায় এক হাত লম্বা বাঁশ। এরপর পাড়াময় মিশ্রণ ছিটিয়ে দেয়। হৈ রৈ চিৎকারসহ বাঁশের ঠোকাঠুকি, প্রতিটি বাড়ির দেওয়ালে সজোরে আঘাত, আর সমস্বরে আওয়াজ 'দূর হ, দূর হ'। পাড়ার শেষ মাথায় সমাপ্ত হয় মিশ্রণ ছিটানোর মিছিলটি। মিশ্রণ ছিটানোর পর

থুরুংগুলো আর বাঁশের ঝাড়ুগুলো উল্টো করে স্তূপ করে রেখে সবাই যে যার বাড়ি চলে যায়। এবার সব কোলাহল বন্ধ। পাড়াময় নীরবতা আর নিস্তব্ধতা। এ রাত্রি আর কালকের দিনের জন্য কোনো কথা বলা নিষিদ্ধ। ততক্ষণে সূর্যদেব অস্ত গিয়েছে। চুপচাপ, নিস্তব্ধ, সাড়াশব্দহীন গোটা গ্রাম। এই অরণ্যের প্রায় সকল আদিবাসী সমাজের কাছে 'পাড়া শুদ্ধি' এক অতি গুরুগম্ভীর অত্যাবশ্যকীয় অনুষ্ঠান। এর অবশ্য নির্দিষ্ট দিন-মাস নেই, সমাজে বয়ে যাওয়া বিচিত্র ঘটনাপঞ্জি এবং প্রকৃতির খেলাই এ পর্বের নির্ধারক। শুধু এ আরণ্যকরা কেন, সমস্ত মানব জাতিই প্রকৃতির খামখেয়ালের অধীন। মানুষের থেকে উচ্চতর যেসব শক্তি, প্রকৃতি এবং মানব জীবনের গতিপথ নিয়ন্ত্রণ করে তাদের তুষ্টতা বা প্রসন্নতা সাধন মানব-মানবীর প্রয়োজনীয় কর্ম।

এই আরণ্যকরা যার প্রসন্নতা সাধন এবং তুষ্ট বিধানে ব্যস্ত ও ব্যাকুল, সেই শক্তি থাকে কাঁকড়ার গর্তে, পাহাড়ি ঝরনার উৎসমুখের সেই স্যাঁতসেঁতে পাহাড়ের খাদে, জুমের আগুনে আধপোড়া বৃক্ষের ফোঁকড় বা গর্তে, চুলার মুখে, শিলা পাথরের গুহায়– এ যে সর্বব্যাপী। তাই এদের তুষ্টি বিধানের জন্য হরেক রকমের আচার-প্রথা, পূজা-পার্বণ উৎসব আরণ্যকরা পালন করে থাকে।

৩. লৌ থিং কুং বল (জুম মঙ্গল পূজা)

এক জুমবছর অনেক হাসি-কান্নার স্মৃতিতে ভরা। যে জুম তাকে সারা বছরের আহার ও পানীয় যুগিয়েছে, সুস্বাস্থ্য দিয়েছে সেই জুমের আত্মা তিন বছরেও মালিকের পিছু ছাড়ে না। সেই জুমের প্রতি অকৃতজ্ঞ হলে বা অবহেলা করলে জুমের মালিকের অমঙ্গল হয়। তাই জুমের আত্মার সন্তুষ্টি করা বাঞ্ছনীয়। জুম পূজা হলো জুমের আত্মার সন্তুষ্টি সাধন। জুম মঙ্গল পূজার আগের দিনে পাড়ার মেয়েরা ঢেঁকিতে ধান ভানে আর বিন্নি ধানের পিঠা বানিয়ে রাখে। পুরুষরা খুব ভোরে উঠে জুমে যায়। জুমে যাওয়ার সময় জুমে গমনকারী লোকেরা সারা জুমপথে চালের গুঁড়া ছিটাতে ছিটাতে যায়। জুমে পৌঁছলে পূর্বের জুমের জঙ্গল কাটার সময় প্রথম দিনে একটি গাছের নীচে যে পাথরটি মাটির নীচে পুঁতে রাখা হয়েছিলো সে পাথরটিকে খুঁজে বের করতে হয়।

সেই গাছ এবং সেই পাথর খুঁজে পাওয়া খুব সহজ কাজ নয়। খুঁজতে সারা দুপুর বেলা চলে যায়। পাথরটি খুঁজে পাওয়া মাত্রই সকলে আনন্দে চিৎকার দিয়ে ওঠে এবং জুমের মাটি কপালে মাখে। সেই পাথরটিকে আবার যেখানে জুম আলুর গর্ত আছে তার পাশে লম্বালম্বিভাবে পুঁতে রাখা হয়। তার পাশে একটি মারফা ও একটি বাঁশের চোঙ্গাও পুঁতে রাখতে হয়। পুঁতে রাখা পাথরের উপরে চালের গুঁড়া ছিটানো হয়। মোরগ অথবা শুকর কেটে বলি দিতে হয়। বলি দেয়া শুকর বা মোরগের মাংসগুলো পূজার ডালায় নিয়ে দেবতার উদ্দেশ্যে এই মন্ত্র উচ্চারণ করতে হয় :

'কোথায় সব তোমাদের বসতি চিনি না, জানি না, কাঁকড়ার গর্তে?
গাছের ফাঁকে ফোঁকড়ে? পাথরের গর্তে? জুমের কোন প্রান্তে?
যেখানে থাকো বেরিয়ে এসো, এই দেখো তোমাদের উদেশ্যে
আমাদের অর্ঘ্য। এই যে মারফা, এই যে দুই মুঠা শূকর, এই যে মোরগ,
এসো সন্ধি করি, আত্মীয়তা জমাই, হৃষ্টপুষ্ট ধানের শীষ প্রার্থনা করি,
সুস্বাস্থ্য কামনায় প্রার্থনা করি।'

পূজা করার জন্য পুঁতে রাখা পাথরটির চারিদিকে বাঁশের বেড়া দিয়ে ঘিরে রেখে পূজার ঘরের মতো ঘর বানানো হয়। তাতে ফুল দিয়ে, আর কলাপাতা ও মোরগের পালক দিয়ে সাজাতে হয়। তারমধ্যে কলাপাতায় করে রান্না করা মাংস, তরিতরকারি প্রভৃতি দিয়ে পূজা উৎসর্গ করা হয়। পূজা শেষে ঘরে ফেরার সময় কিছু কাঁচা মাংস কলার পাতায় বেঁধে ঘরে ফেরার পথে যে গাছগুলো পড়ে সে গাছগুলোর প্রতিটি গাছের গোড়ায় রেখে আসতে হয়। প্রতিটি গাছ যেন তাদের কাছে আরাধ্য দেবতা। নিয়ম আছে যে, তার পরের দিন জুমের মালিকের ঐ জুমে যাওয়া নিষেধ।

৪. রুয়া-খা-জার (বৃষ্টির আহ্বান)

রুয়া-খা-জার হলো জুমের ফসল ভালো হওয়ার জন্য সৃষ্টিকর্তার কাছে বৃষ্টির প্রার্থনা। অনাবৃষ্টি ও খরা হলে তাদের জীবন বিপন্ন হবে। ফসল পাওয়া যাবে না। অপদেবতার কুদৃষ্টি থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য এবং অনাবৃষ্টি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য রুয়া-খা-জার-এর আয়োজন। প্রতি পূজায় বা অনুষ্ঠানের উপকরণ হিসেবে জীব বলি দেওয়া অত্যাবশ্যক হলেও এই বৃষ্টি আহ্বান অনুষ্ঠানের জন্য কোনো জীব বলি দেয়া অত্যাবশ্যক নয়। এজন্য নির্দিষ্ট কোনো দিনক্ষণও প্রয়োজন নেই. জুমের আগাছা, লতাগুল্ম, জঙ্গল পরিষ্কারের কাজের শেষে জুমচাষি যে কোনো একদিন বৃষ্টি কামনার জন্য একটি দিন ঠিক করে নেয়। এই বিশেষ দিনে ফসল ভালো হওয়ার জন্য বৃষ্টি কামনা করে প্রার্থনা করা হয়। অতি ভোরে মেয়েরা ঝরনা থেকে পানি আনতে যায়। পানির পাত্র হিসেবে ব্যবহার করা লাউ-এর খোলের মুখ অতি যতনে পাথরে ঘসে ঘসে পরিষ্কার করে। থুরুং এর মধ্যে অতি সতর্কতার সাথে একটার উপর আরেকটা বসিয়ে দেওয়া যাতে উল্টিয়ে গিয়ে পানি পড়ে না যায়। এটিও যেন একটা শিল্প। উঁচু নীচু পাহাড়ি পথে ওঠানামার সময়ে থুরুং-এ সাজানো পানির পাত্রগুলো সুশৃঙ্খলভাবে থাকা চাই। যাদের পিঠ ভিজে যায় এবং সারা পথে যার পানি পড়ে পাহাড়ি পথ ভিজে পিছলা হয়ে যায় তার যথেষ্ট দুর্নাম হয়।

পুরুষেরা বাড়ির চারদিকের জংগল পরিষ্কার করে, মাচাং ঘরের নীচে যত ময়লা আবর্জনা আছে তা পরিষ্কার করে। ঘরের নীচ দিয়ে বৃষ্টির পানি যাতে না যায় তার জন্য নালা কাটে। ঘরের সিঁড়ি মেরামত করে। প্রয়োজনে গাছ বা বাঁশ পাল্টিয়ে দেয়। জীব বলি না থাকায় এই রুয়া খা জার-এ অতো আনুষ্ঠানিকতাও নেই। বর্তমানে বম, পাংখোয়া এবং লুসাইরা একশত ভাগই খ্রিষ্টান। তাদের মাঝে খ্রিষ্টধর্ম প্রচার শুরু ১৯১৮ খ্রিষ্টাব্দে। ভারতের মণিপুর ও মিজোরামের একই ভাষাভাষী স্বগোত্রীয় লুসাইরা বমদের কাছে খ্রিষ্টধর্ম প্রচার করেন। তারা ভারতের মণিপুর রাজ্যের চুরাচাঁদপুরে (Churachandpur) অবস্থিত নর্থ ইস্ট ইন্ডিয়া জেনেরাল মিশনে (NEIG MISSION) চাকুরি করতেন। এই মিশন তাদেরকে পার্বত্য চট্টগ্রামে মিশনারি কাজে প্রেরণ করে। স্থানীয় লোক প্রেরণের পূর্বে এক আমেরিকান মিশনারি Roland Edwin সাহেব ১৯১৮ খ্রিষ্টাব্দে এতদঞ্চলে আগমন করেন। বম সমাজে খ্রিষ্টধর্ম শিক্ষা, চার্চ প্রতিষ্ঠা এবং খ্রিষ্টধর্ম সম্প্রসারণের কাজে প্রধান ভূমিকা পালনকারী স্বর্গীয় পাস্টর এইচ.ডালা'র (Pastor H. Dala) সন্তানেরা বম সমাজের নেতৃত্বস্থানে আজ প্রতিষ্ঠিত। তাদের অনেকেই আজ শিক্ষকতা, ধর্ম শিক্ষা এবং সমাজ সেবায় নিয়োজিত। বমরা খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত হওয়ার পর বর্তমানে এইসব পূজা উৎসবের তেমন আর আয়োজন করে না।

লোকখাদ্য

বান্দরবান পার্বত্য জেলায় আদিবাসী-বাঙালি সম্প্রদায় একত্রে বসবাস করার ফলে খাদ্যের তালিকায় বৈচিত্র্যের ছাপ রয়েছে। বাঙালিরা নানান পিঠা-পায়েস, ফিন্নি, পুরি, হালুয়াসহ নানা ধরনের মুখরোচক খাবার তৈরি করে ও খায়। শীতকালে ভাঁপা পিঠা তৈরি করে পিঠার সাথে খেজুরের রস পরিবেশন করে অতিথিদের আপ্যায়ন করা বাঙালিদের ঐতিহ্যের এক অনন্য প্রকাশ। বৈশাখি মেলা হলে পিঠা উৎসব চলে। অপরদিকে আদিবাসীদের রয়েছে নানা ধরনের ঐতিহ্যপূর্ণ খাবার। জুমে বিন্নি ধানের খৈ, ডলু বাঁশের চুঙায় পিঠা তৈরি করে খাওয়া এবং ছড়ার মাছ শিকার করে মিটিঙা বাঁশের চুঙায় রান্না করে খাওয়া আদিবাসীদের ঐতিহ্যের প্রতীক। জুমের কাজে গেলে আদিবাসীরা কলাপাতায় করে তরকারি ও ভাতের মোচা সাথে করে নিয়ে যায়। কলাপাতায় ভাতের মোচা বানালে সারাদিন ভাত গরম থাকে। এতে কোনো পঁচন ধরেনা। তাছাড়া শুঁটকি মাছ এ জেলার আদিবাসী-বাঙালি সবার প্রিয় খাবার। হাঙ্গর মাছ ও হাঙ্গরের শুঁটকি আদিবাসীদের একটি অন্যতম প্রিয় খাদ্য। ম্রো ও খুমী আদিবাসীরা যদি বোন বা পিসির বাড়িতে বেড়াতে যায়, তাহলে তাদেরকে সাথে করে শূকরের মাংস নিয়ে যেতে হয়। কোনো কারণে শূকরের মাংস না পেলে অবশ্যই হাঙ্গরের শুঁটকি নিয়ে যাওয়ার বিধান আছে। মাঝে মাঝে হরিণের মাংস ও বন্য শুকরের মাংস স্থানীয় বাজারে পাওয়া যায়। এছাড়াও ব্যাঙ, গুইসাপ, শামুক, কাঁকড়া ইত্যাদি খাবার খেয়ে এ অঞ্চলের মানুষরা পরিতৃপ্তি লাভ করে। আদিবাসীরা বিভিন্ন তরকারিতে জুমে উৎপাদিত বিভিন্ন ধরনের মসলা ব্যবহার করে। জাবারং নামের মসলাটি আদিবাসীরা বেশি ব্যবহার করে থাকে।

১. নাপ্পি পাহাড়িদের মজাদার খাবার

মাছ-ভাত বাঙালিদের প্রধান খাদ্য হলেও আদিবাসীদের বেলায় খাবারে একটু ব্যতিক্রম রয়েছে। তারা অধিকাংশই সকালে গরমভাত খেতে অভ্যস্ত। অত্র জেলাতে অনেক প্রজাতির প্রচুর উদ্ভিদ রয়েছে যা আদিবাসীরা ভাতের সাথে খেয়ে থাকেন। আদিবাসীরা বর্ষা মৌসুমের প্রথম দিকে বাঁশের কুড়ল (মোথা) নানা পদ্ধতিতে খেয়ে থাকেন। তবে স্বর্ণলতা-শূন্যলতাকে (পরগাছা) তারা শাকের ন্যায় রান্না করেও খায়। নাপ্পি এ এলাকার আদিবাসীদের একটি মজাদার খাবার। ছোটো ছোটো চিংড়িসহ নানাবিধ মাছ ধরার পর বড়োগুলো আলাদা করা হয় ও এগুলো পানিতে ভিজিয়ে রাখা হয়। ছোটো মাছগুলো ভালোমতো ধুঁইয়ে উত্তমরূপে রোদে শুকাতে হয়। পরিষ্কার করা মাছকে মেশিনে-ম্যানুয়েলি পিষে প্রক্রিয়াজাতকরণ করা হয়। পিষানো মাছের গুঁড়া এক কেজি, আধা কেজি ও আরও ছোটো আকারের পরিমাপের গোলমণ্ড তৈরি করা হয়, যা নাপ্পি নামে পরিচিত। নাপ্পির মণ্ডের সাথে হয়তো সংরক্ষণী (প্রিজারভেটিভ)) ব্যবহার করা হয়। আদিবাসীদের এলাকায় বাজারগুলোতে বর্তমানে এক কেজি নাপ্পি ১৫০ থেকে

১৮০ টাকা দরে বিক্রি হয়। নাপ্পির সাথে আনুপাতিক হারে পিঁয়াজের কুঁচি ও কাঁচা-শুকনা মরিচ মিশিয়ে পিষানোর পর পরিমাণ মতো লবণ দিয়ে সামান্য পিশে তা খাদ্যের অনুসঙ্গ হিসেবে আদিবাসীরা ব্যবহার করে থাকে। ঐ খাদ্য পান্তা কিংবা গরমভাত দিয়ে খেতে ভারি মজা। এতে খরচ বেড়ে যায়। তাই নাপ্পির মণ্ড থেকে সামান্য নিয়ে তা কোনো সব্জি তরকারিতে কিংবা মাছের তরকারির সাথে দিলে খেতে রসনা বাড়ায়। নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলায় বসবাসরত জনৈক চাক আদিবাসী জানালেন, বর্ষা মৌসুমে তাদের সময়মতো বাজার করা সম্ভব হয় না, কারণ তাদের পাড়া হতে বাজারে যেতে অনেক সময় লাগে। তাই ছড়াখাল পাড়ি দিয়ে বাজার করা বাদ দিয়ে ফেলি। শাকপাতা ও লতাপাতা আর নাপ্পি দিয়েই সাশ্রয়ীভাবে সংসার চালাই। আদিবাসী ছেলেমেয়েদের কাছেও নাপ্পি অত্যন্ত প্রিয়। প্রায় সব ধরনের পশুপাখিই আদিবাসীদের খাদ্য তালিকার মধ্যে রয়েছে। তদ্রূপ সকল প্রকার মাছও আদিবাসীদের খাদ্য। মুরগি, গরু, ছাগল, শূকর ইত্যাদির মাংসের খাবারের প্রচলন থাকলেও কিছু কিছু আদিবাসীদের জবাই করে খাওয়ার অনুশাসনিক সীমাবদ্ধতা রয়েছে।

২. বাইশারী গজা

ভোজন রসিক বাঙালিদের খাদ্য সম্ভার ও স্বাদের কাহিনি দেশ-বিদেশের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের নিকট প্রশংসা পেয়েছে এবং ভ্রমণ বিবরণীতেও লিপিবদ্ধ হয়েছে। খাবারের স্বাদ পরিস্ফুটনের জন্য অনেকেই মজাগজা শব্দটা ব্যবহার করে থাকেন। মাছ, মাংস, পিঠা-পুলি, দই-মিষ্টি ইত্যাদি সবই মজাদার হতে পারে। কিন্তু মজার সাথে গজাটা এলো কেন? বাঙালিদের ভোজের সময় খাবার শেষে দই, ক্ষির ও মিষ্টিই প্রচলিত ছিল। তবে ফলফলাদিও খাবার শেষে যুক্ত হয়ে থাকে। ফান্টা, কোক এজাতীয় খাবারও বাঙালিদের ভোজন শেষে স্থান করে নিয়েছে। বাইশারী গজা খাবার শেষেও চলে, নাস্তায়ও চলে, আবার মজা করতে করতে কিংবা গল্প করা কালে খেতেও অসুবিধা নেই। কারণ, এটা হলো ছোট্ট খাবার বিশেষ, একটু মিষ্টি আর মচমচেও বটে। খেতে গেলে হাতে কিংবা মুখে লেগে থাকে না, পরিবেশনার বাটিতেও লেগে থাকে না। যতটুকুন মিষ্টি মিষ্টি স্বাদ তাতে ডায়াবেটিস প্রভাবিত লোকদেরও কম খেতে মানা হয়তো থাকবে না। বাইশারী বাজারের ছোট্ট মিষ্টি গজা তৈরি করেন দু'জন-তিনজন ময়রা। সাধারণত দেখা যায় মিষ্টির দোকান হিন্দুদের, অধুনা মুসলমানরাও এগিয়ে এসেছে এ ব্যবসায়। বাইশারী বাজারে একজন হিন্দু ও দু'জন মুসলিম গজা ব্যবসায়ী আছেন। হিন্দু ময়রাকে গজাবাবু বলেই সম্বোধন করে থাকেন এলাকাবাসী। নাইক্ষ্যংছড়ির প্রায় সর্বত্রই যে গজা পাওয়া যায় তা নয়, সম্ভবত বাংলাদেশের প্রত্যেক জেলাতেই গজা প্রাপ্তির সন্ধান মিলে। দুর্গা পূজা, পহেলা বৈশাখ, বিজয় দিবস ইত্যাদি বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বা মেলায় গজা পাওয়া যায়। এগুলো দেড়-দু' ইঞ্চি কিংবা এর অধিক লম্বা, প্রায় আঙ্গুলের মতো দেখতে। এগুলো একটার সাথে অপরটি লেগে থাকে। উপরের আবরণে থাকে চিনির ছড়ানো ছিটানো রস। ছটাক কিংবা এক পোয়া পরিমাণ মাপতে বিক্রেতাকে হাত দিয়ে জমাট গজাকে ভাঙতে হয়। অনেক গজা আবার দেখতে হলদে। মনে হয় গজায় রঙ মেশানো হয়। বাইশারী এলাকাবাসীরা জানান, এলাকার যারা বিদেশে থাকেন তারাও

বাইশারী গজার মজার স্বাদ কখনো ভুলেন না। নতুন যারা বিদেশ যান, তারা আত্মীয়স্বজন ও প্রতিবেশীদের বাইশারীর গজা নিয়ে যেতে অনুরোধ করেন। বাইশারী গজা যে এতই মজা ও কদর এই ব্যাপারটি থেকে তা সহজেই অনুমেয়। এই গজাকে ৫-৭ দিন সংরক্ষণ করে রাখা খুব একটা কঠিন কাজ নয়। মাসাধিক কাল সংরক্ষণ করা যায় যদি গজা রাখার পাত্রটি বায়ু বুদ্ধ রাখা হয়।

গজা প্রস্তুতির ব্যাপারটি সহজ হলেও কোনো ময়রাই সহজে মুখ খুলতে রাজি নন। তবে অনেক কায়দা করে গজা তৈরির তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। নিম্নে তা প্রদত্ত হলো :

১. পরিমাণমতো ময়দা গরম-ঠাণ্ডা পানিতে মিশিয়ে কাই/খামির/লাম্প তৈরি করতে হয় যাতে লাম্পটি এমন শক্ত থাকে যে তা দিয়ে ভারি/পুরু বড়ো রুটির আকৃতি করা যায়। তবে কেউ কেউ লাম্প তৈরির সময় ইস্ট বা সোডা ব্যবহার করে থাকেন।

২. লাম্প তৈরির সময় সয়াবিন তৈল/পাম ওয়েল পরিমাণ (কেজি প্রতি দু'শ গ্রাম) মতো মিশিয়ে লাম্পটি এমনভাবে রাখতে হবে যাতে লাম্প হাতের ও বেলনার মধ্যে না আটকায়

৩. বেলনার পিঁড়ির সাইজ মতো যাতে হয় সে পরিমাণ ময়দার লাম্পের অংশ নিয়ে তা বেলনা দিয়ে বেলতে হবে, যাতে গোল বা লম্বা আকৃতির পুরু রুটি তৈরি করা যায়। তারপর আঙ্গুলের মতো সরু করে লম্বা লম্বা করে কাটতে হবে এবং পরে তা আড়াআড়িভাবে দেড় থেকে দু' ইঞ্চি লম্বা করে কেটে তেলে ভাজার জন্য জমাতে হবে।

৪. একটি মাঝারি সাইজের কড়াই চুলায় বসিয়ে সয়াবিন কিংবা পামওয়েল গরম করতে হবে। তেল ফুটে উঠলে আঙ্গুলের মতো কাটা টুকরাগুলোকে কড়াইতে দিয়ে অতি সাবধানে নাড়াতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে অভিষ্ট গজা তৈরির টুকরাগুলো একটির সাথে অপরটি লেগে না যায়।

৫. আধাঘণ্টার মতো তেলে ভাজতে হয়। ছিদ্রওয়ালা বড়ো গোল চামচ দিয়ে টুকরাগুলোকে নেড়ে দিতে হবে যাতে সমভাবে মচমচে হয়ে ভাজা হয়। ভাজা হয়ে গেলে টুকরাগুলোকে কড়াই থেকে উঠিয়ে আলাদা করে রাখতে হবে।

৬. লোকমুখে মিষ্টি লাগে এই মতো একটি কড়াইতে পানির মধ্যে চিনি দিয়ে চিনির সিরা তৈরি করতে হবে। সিরা ঘন হলে তখনই পূর্বের তেলেভাজা মচমচে টু-করাগুলোকে সিরায় ছেড়ে দিয়ে ভাজতে হবে অর্থাৎ সিরায় মজাতে হবে। সিরার পানি ঘন হয়ে গেলেই টুকরাগুলো ছিদ্রওয়ালা বড়ো গোল চামচ দিয়ে কড়াই থেকে নামাতে হবে। চিনির সিরা যেন টুকরার সাথে বেশি না আসে, এজন্য এ কাজটা আস্তে আস্তে করতে হবে। সুন্দর পরিবেশনের জন্য পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন বড়ো প্লেটে রেখে সাদা পলিব্যাগ দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। ঠাণ্ডা হয়ে গেলেই হয়ে যাবে বাইশারীর গজা।

লোকনাট্য ও লোকনৃত্য

ক. লোকনাট্য

১. পাঙখুঙ : বাংলাদেশের বাঙালিদের 'যাত্রা'র মতো অভিনয়যোগ্য, গীতপ্রধান নাট্যকর্ম। আবার এর মধ্যে একটি আখ্যানও জুড়ে থাকে। শত বছরের ঐতিহ্যসমৃদ্ধ 'পাঙখুঙ' উদ্ভবকালে প্রধানত একজন শিল্পীর দ্বারা অভিনীত হতো এবং সেই শিল্পীই আখ্যানের সংগীত-অংশ ও অভিনয়-অংশ দ্বৈতভাবে পরিবেশন করত। পরবর্তীকালে এটি দলীয় নাট্যাংশে রূপলাভ করে। এখন পাঙখুঙ অভিনয়ে ২০-৫০ জন অভিনেতা-অভিনেত্রীর প্রয়োজন পড়ে। একসময় বিভিন্ন উৎসব-পার্বণে এটি দর্শনীর বিনিময়ে অভিনীত হতো এবং অংশগ্রহণকারী সকলেই উপযুক্ত সম্মানী পেত। এটি রাতভর অভিনয়ের গীতিনাট্য অনুষ্ঠান। একসময় পৌরাণিক রাজা-বাদশা, লোকনায়ক, মানবিক আবেদনসমৃদ্ধ সামাজিক গল্পগাথা নিয়ে এটি অভিনীত হতো বলে জানা যায়।

পাঙখুঙ নাট্যানুষ্ঠানে 'যাত্রা' পরিবেশনকালীন যন্ত্র-অনুষঙ্গের মতো ড্রাম, বিউগল, ক্লারিওনেট, হারমোনিয়াম, তবলা ইত্যাদি অবলীলায় ব্যবহৃত হতো। পাঙখুঙ মারমা সমাজে সর্বত্র সমান জনপ্রিয় ছিলো। পার্বত্য বান্দরবানে মারমাপ্রধান জনপদে ফুচিমং নামক এক কিংবদন্তি প্রতীম পাঙখুঙ অভিনয় শিল্পীর নাম শোনা যায়। তার অভিনয়ের মুনশিয়ানার গল্প আজও প্রচলিত মাঝবয়েসী মারমা নর-নারীগণের মুখে-মুখে। তাদের ভাষায় সেকালে অনেকগুলো পাঙখুঙ পরিবেশনকারী নাট্যদল থাকলেও ফুচিমং ছাড়া কোনো পাঙখুঙ অনুষ্ঠানই সঠিক মাত্রায় রসমণ্ডিত হয়ে উঠত না। এই ফুচিমং ছিলেন, প্রকৃতপক্ষে, একজন স্বভাবশিল্পী। ফুচিমং কোনো নির্দিষ্ট দলীয় পাঙখুঙ গোষ্ঠীতে অভিনয় করতেন না। তার ঐন্দ্রজালিক জনপ্রিয়তার কারণে যে কোনো পাঙখুঙ দল তাকে নিজেদের নাট্যানুষ্ঠানে উপস্থিত রাখতে চেষ্টা করত। সেভাবে গ্রামে মহল্লার হাট-বাজারে প্রচার চালাত। মাত্র চার দশক আগেও ফুচিমং জীবিত ছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, পাঙখুঙ নাট্যের এই ক্ষণজন্মা শিল্পীর বিষয়ে মারমা সমাজের বর্তমান প্রজন্ম প্রায় কিছুই জানে না। পাঙ খুঙ হচ্ছে মারমাদের একটি কাহিনিভিত্তিক লোকনাট্যবিশেষ। এই লোকনাট্যে একসাথে গান ও নৃত্য রয়েছে। এটি বাংলা মঞ্চনাটকের মতো। পাঙখুঙ মূলত অতীতের মানব-মানবীর জীবনকাহিনি নিয়ে রচিত। গৌতম বুদ্ধ পাঁচশতবার বিভিন্নরূপে জন্ম নিয়ে এক এক যুগে এক একবার মহাপুরুষ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিলেন। এসব কাহিনিকে নিয়ে মারমারা বিভিন্ন ধর্মীয়-সামাজিক অনুষ্ঠানে পাঙখুঙ পরিবেশন করে থাকে। যেমন : 'ভাইমাউইজিয়া পাঙ খুঙ', 'ককানু পাঙ খুঙ' 'ম-ন পাঙ খুঙ' 'থাম্রা পাঙ খুঙ' ইত্যাদি। পাঙ খুঙ দলে ২০ থেকে ৫০ জন শিল্পী থাকে। পাঙখুঙ পরিবেশনায় একটি সুনির্দিষ্ট সুর ও ছন্দ রয়েছে। আনুমানিক একশত বছর পূর্ব থেকে মারমা সমাজে পাঙখুঙ গীতিনৃত্য উদ্ভব হয়েছে। উদ্ভবের প্রথমদিকে শিল্পী একাই পাঙ খুঙ গান গেয়ে বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করত। গ্রামের লোকেরা এ

পাঙখুঙ অনুষ্ঠান খুব আগ্রহভরে উপভোগ করতো। কালক্রমে পাঙখুঙকে একটি নাট্যানুষ্ঠানে রূপান্তরিত করা হয়। বর্তমানে বিভিন্ন উৎসবে বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান করার জন্য পাঙখুঙ দলকে ভাড়া করে সারারাতব্যাপী এই নাট্যানুষ্ঠান করে থাকে। পাঙখুঙ অনুষ্ঠানে অভিনেতা-অভিনেত্রী ও শিল্পীগণ অতীতকালের রাজা-মন্ত্রী, রানি, উজির-নাজির, সিপাহি ইত্যাদির পোশাকে সেজে অভিনয় করে। উৎসব ছাড়াও বিভিন্ন সময়ে যুবক-যুবতী, বুড়ো-বুড়িরাও মনের আনন্দে এই পাঙখুঙ গান গেয়ে থাকেন।

২. জাইত্ : মারমাদের এক প্রকার গীতিনাট্য বিশেষ। পার্বত্য চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষায় 'জাইত্'কে ওয়াকশান বলা হয়। বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে জাইত্ গীতিনাট্য পরিবেশন করা হয়। জাইত্ গানের নির্দিষ্ট সুর ও ছন্দ রয়েছে। ২০ থেকে ৪০ জন শিল্পী নিয়ে জাইত্ দল গঠিত হয়। জাইত্ গীতিনাট্য হলেও পাঙখুঙ গীতিনাট্য থেকে নৃত্যের মুদ্রা, গানের রূপ ও সুর ভিন্ন। এ গীতিনাট্য পরিবেশনের সময় অভিনয় শিল্পীরা মারমাদের নিজস্ব পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান করে। বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে রয়েছে বুং-পাইত্, কাঠের তৈরি বাঁশি, ছোটো ও বড়ো ঝাঁজ ইত্যাদি মারমাদের জাইত্ গীতিনাট্যগুলো অতীতের মানব-মানবীর জীবনের সুখ-দুঃখের কাহিনি নিয়ে রচিত। জাইত্-এর মধ্যে 'সিলাবাহুং জাইত্', 'মা অং প্রু জাইত্' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ধর্মীয় বা সামাজিক উৎসব-অনুষ্ঠানে দর্শনীর বা সম্মানীর বিনিময়ে জাইত্ পরিবেশন করা হয়। আবার জাইত-এর গীতিনাট্যের মুদ্রা বিভিন্ন, গানের রূপায়ন এবং যন্ত্রবাদনের কায়দাকানুন পাঙখুঙ থেকে আলাদা। এটি রাতভর অনুষ্ঠেয় গীতিনাট্যবিশেষ।

৩. অঁচোয়ে : এগুলো একটি গীতিনাট্যবিশেষ। এ গানের শিল্পী এককভাবে মারমা সমাজের ভবিষ্যত চালচিত্র কেমন হবে, তা সুরে সুরে বিবৃত করে। এককালে শিল্পীরা গ্রামে গ্রামে গিয়ে বাড়িঘরের দাওয়া-উঠানে বসে 'অঁচোয়ে আকাহ' পরিবেশন করত। ইদানিং এ গীতিনাট্যের প্রচলন খুব কম দেখা যায়। প্রকৃতপক্ষে এসব শিল্পী বিভিন্ন জ্যোতিষগ্রন্থ ও ধর্মশাস্ত্র থেকে ভবিষ্যৎ বিষয়গুলো সংগ্রহ করে এবং তাতে সুরযোজনা করে গ্রামসমাজে পরিবেশন করে।

ম্রোদের 'ওয়াংফাউ প্লাই' (বৃষ্টির প্রার্থনায় গীতিনাট্য)

এই গীতিনাট্য ম্রো সমাজে খুবই সমাদৃত। অনেকসময় আবহাওয়ার তারতম্যের কারণে অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, ঝড়-তুফান ইত্যাদি দেখা দেয়। অনেক সময় অনাবৃষ্টি দেখা দিলে আকাশে একখণ্ড মেঘ পর্যন্ত দেখা যায় না। প্রচণ্ড তাপদাহের ফলে জুমে বপনকৃত শস্য বীজের অঙ্কুরোদগমনের লক্ষণ দেখা যায় না। এ অবস্থায় কোনো পূর্ণিমা তিথীতে ম্রোরা 'ওয়াংফাউ' (বৃষ্টির প্রার্থনায় গীতিনাট্য) অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এই গীতিনাট্য পরিবেশনে শিল্পীদল তিনভাগে বিভক্ত হয়। প্রথম দলে একজন পেতনি বুড়ি, বাঘ ও হরিণের চরিত্রে অভিনয়ের অভিনয় শিল্পী থাকে। তাদের সাথে থাকে বংশীবাদক ও ঢোলবাদক। দ্বিতীয় দলে থাকে সাতজন বাঁশি বাদক ও তাদের সাথে ৬-৭ জন যুবক। তৃতীয় দলে থাকে সাতজন যুবতী। প্রথম দলের দলনেতা হয় পেতনি বুড়ি। পেতনি বুড়ির পোশাক ও সাজ হবে ছেঁড়া আল খেল্লা কাপড় পরা পেতনি বুড়ি। পেতনি বুড়ি

তার দুই কানে বড় বড় কানের দুল, পেটের কাপড়ের ভেতরে কচ্ছপের খোলস ঢুকিয়ে মেদভুঁড়ি বানিয়ে পেটকে বড় করে আর মাথায় ঝাঁকড়া চুলের বেনীতে মোরগের পালক গুঁজে রেখে নৃত্যের সাজে সাজে। দ্বিতীয় দলের শিল্পীরা বাঁশ বেত নির্মিত বাঘের মুখোশ পরিধান করে নৃত্যের সাজে সেজে থাকে। আর তৃতীয় দলের শিল্পীরা অনুরূপভাবে হরিণের মুখোশ পরিধান করে ঐ গীতিনৃত্যে অংশগ্রহণ করে। বাঁশি ও ঢোলের তালে তালে পেতনি বুড়ি পিঠে ঝুড়ি ঝুলিয়ে গ্রামের প্রত্যেক পরিবার থেকে চাউল ভিক্ষা করার অভিনয় করে। প্রথম দলের বাঁশিবাদকেরা বাঁশের তিনটি নলবিশিষ্ট একজাতীয় বাঁশি বাজিয়ে নৃত্য পরিবেশন করে। এজাতীয় বাঁশি সবাই বাজাতে পারে না। এই বাঁশির সুরে একপ্রকার স্বরলিপি বিদ্যমান। অত্যন্ত কৌতুকব্যঞ্জক এই সুরের লহরী।

বাঁশির সুর ও পেতনি বুড়ির গানের কথা :

পেলো পেলা দামি দা
অমথং পাবাও রিনিদনী
ওয়ানক্লাই পাচং নাপে হাব
সং চাপো কাতুই দৈ
দাম চাপো কাতুই দৈ
ওয়াংচাক সারো চাক ক্রম ক্রম।

অনুবাদ

যারা দেবেনা ভিক্ষা
তাদের গাল ফুলে থাক এক সপ্তাহ
ছোটো চিংড়ি ছোটো মাছ
নাহি পায় জল
আয় বৃষ্টি ঝেপে আয়
ভরে দাও খাল

পেতনি বুড়ি গানের ছন্দে বাঁশির সুরে সুরে উপরের কথাগুলো গায় আর নাচে। নৃত্যের তালে ও সুরে এবং তালে পেতনি বুড়ি যখন গান গেয়ে নাচে তখন বাঘরূপী শিল্পী হরিণরূপী শিল্পীকে শিকার করার চেষ্টার অভিনয় করে। এভাবে বাঘ হরিণকে ধরার জন্য চেষ্টা চালায় আবার হরিণও আপন প্রাণ বাঁচার জন্য পালিয়ে বেড়ায়। উল্লেখ্য যে, এখানে পেতনি বুড়িকে বর্ষাদেবতা বা জলদেবতা হিসেবে বুঝানো হয়। তার ভিক্ষা গ্রহণ করাকে অন্যান্য দেবদেবীর কাছ থেকে জল ভিক্ষা গ্রহণ হিসেবে বুঝানো হয়েছে। আর বাঘ ও হরিণের চরিত্রকে গরমের মাঝে মানুষের বসবাস করার অবস্থা বুঝানো হয়েছে। দ্বিতীয় শিল্পীদল পাড়ার মাঝখানে 'সুম' (কাঠের গুঁড়ি, এক প্রকার ধানভানার যন্ত্র) একটার উপর আরেকটা সাজিয়ে রেখে পেছন থেকে ফেলে দেয়। তাতে সুম পড়ে যাওয়াতে এক প্রকার বিকট শব্দ হয়। এ শব্দকে মেঘের গর্জনের শব্দ হিসেবে ধরে নেয়া হয়। অতঃপর শিল্পীরা একে অন্যের কাঁধের উপর হাত রেখে আলিঙ্গন করে ঢোলের তালে তালে তাল মিলিয়ে ই-হু-হু-উ ধ্বনি তুলে নৃত্য

পরিবেশনের মাধ্যমে আনন্দ প্রকাশ করে। তৃতীয় দলের শিল্পীরা ছড়ায় গিয়ে কাঁসার ঘণ্টা বাজিয়ে তালে তালে নৃত্য পরিবেশন করে আর বাঁশের বেতের সাথে কুরুক পাতা ঘর্ষণ করে ব্যাঙের ডাকের মতো শব্দের সৃষ্টি করে। এদিকে পেতনি বুড়ির সব ঘরে ভিক্ষা গ্রহণ শেষ হলে প্রথম দলের শিল্পীরা ই-হু-হু-উ শব্দ করে অনুষ্ঠান সমাপ্তির সংকেত হিসেবে আগুনের তাপে মিটিঙ্গা বাঁশের চোঙার বিস্ফোরণ ঘটায়। এই বিস্ফোরণের শব্দ শোনা মাত্রই অন্যান্য দলের সব শিল্পীরা এসে পেতনি বুড়ির দলে যোগদান করে। অতঃপর শিল্পীদল পেতনি বুড়িকে ঘিরে হৈচৈ করতে করতে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি টানে। অনুষ্ঠানের পরে বুড়ির সংগৃহীত চাউল দ্বারা মদ তৈরি করে সকলে মিলে তা পান করে।

খ. লোকনৃত্য

আদিবাসী সমাজে নৃত্যধারার প্রচলন গানের চেয়েও প্রাচীন। আদিবাসী সমাজে প্রকৃতপক্ষে গান সৃষ্টি বা প্রচলনের পূর্বেই নাচের সৃষ্টি বা প্রচলন হয়েছে। আদিবাসীরা যেমন প্রথমে নাচ প্রচলনের সৃষ্টি করেছে তেমনি নিত্যদিনের জীবনযাত্রাকে আনন্দ বিনোদনের জন্য সংগীতের উদ্ভব ঘটিয়েছে। গানের মতো নৃত্যের মধ্যেও রয়েছে আদিবাসীদের জীবনধারা ও সংস্কৃতির সম্যকচিত্র। নিজেদের মঙ্গলার্থে নৃত্যের মাধ্যমে তারা দেবতা বা অপদেবতাদের সন্তুষ্টি করে। এসব সম্ভব হয়েছে একমাত্র নৃত্যের মাধ্যমে। আদিম নৃত্য রচিত হয়েছে জীবিকার প্রচেষ্টার সহায়ক হিসেবে এবং এর ফলে তাদের জীবিকা প্রয়াসও সমৃদ্ধ হয়েছে। বিশেষত অপদেবতা তুষ্ট করতে, মহামারী নিবারণে, বৃষ্টি আহ্বানে, রোগ নিবারণে, শিকারে যাবার উন্মাদনা জাগাতে নৃত্য ছিল আদিবাসীদের জীবনের প্রধান উপাদান। পার্বত্য চট্টগ্রামে ১১টি আদিবাসীদের রয়েছে আপন-আপন বৈচিত্র্যময় বর্ণাঢ্য নন্দন সংস্কৃতি। তাদের জীবনধারণের নিজস্ব উপায়ে প্রচলিত সামাজিক ও ধর্মীয় সংস্কারকে কেন্দ্র করে নৃত্যগীতের উদ্ভব ঘটেছে। তাই পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের যে কোনো উৎসবে নৃত্যগীতের উপস্থাপনায় তাদের স্বকীয় পরিচয় বিধৃত রয়েছে। আদিবাসীদের সামাজিক পরিমণ্ডল নৃত্য ও সংগীতময় হলেও শুধু আনন্দ উল্লাসের জন্য নয়। তাদের সামাজিক প্রথা, ধর্ম পালন তথা সমগ্র জীবন চারণায় নৃত্য একটি অত্যাবশ্যকীয় কর্মকাণ্ড। তাই জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত আদিবাসীরা বিভিন্ন সংস্কারের বশবর্তী হলেও বাহ্যত চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা হিসেবেই নৃত্যগীত অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকে। নিম্নে বিভিন্ন আদিবাসীদের লোকনৃত্য তুলে ধরা হলো :

খুমীদের লোকনৃত্য

১. 'ময় লু প্লাং.নাই' (শিকারি নৃত্য)

বিভিন্ন ধরনের পশুপাখি শিকার করা বা ধরার জন্য খুমীরা নানা ধরনের ফাঁদ তৈরি করে থাকে। ফাঁদ ছাড়াও তারা তীর-ধনুক দিয়ে পশুপাখি শিকার করে। কথিত আছে, ঘরের বারান্দার এককোণে বসে একটি কবুতর ডাকছিলো। এক খুমী শিকারি সেই

কবুতরটিকে ধনুকের তীর দিয়ে মেরে ফেললো। মেরে ফেলার পর কবুতরের পাকস্থলিতে একপ্রকার ধান পাওয়া গেলো। শিকারি সেই ধানকে জুমে রোপণ করলো। রোপণের পর ঐ ধান আস্তে আস্তে বড় হতে লাগলো। জুমে যখন ধান পাকতে শুরু করলো তখন এক বন্যশুকর সেই ধান খেতে আসে। ধান খেতে আসা সে বন্যশুকরকে শিকারের জন্য তখন খুমীরা দলবল নিয়ে জঙ্গলে গেলো। একসময় বিরাটকায় সেই বন্যশুকরটিকে শিকার করে মেরে ফেলা হলো। সেই শুকরের মাংস ভাগাভাগি করে সবাই যার যার ঘরে নিয়ে গেলো। যে শিকারি শুকরটিকে মারলো তার বাড়িতে শুকরের মাথার খুলি শুকানো হলো। এক সপ্তাহ পর সেই শুকরের শুকানো মাথার খুলি নিয়ে শিকারির ঘরে এক 'শিকারি নৃত্য' অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হলো। তখন থেকেই খুমী সমাজে এই শিকারি নৃত্যটির প্রচলন শুরু হয়েছে। এই নৃত্যকে খুমী ভাষায় 'ময় লু প্লাং নাই' (শিকারি নৃত্য) বলে। এ অনুষ্ঠানে পাড়ার লোকজন সবাই মিলে মদ, গাংজি (কাঁচা মদ) পান করে আর ফসল নষ্টকারী পশুকে মেরে প্রতিশোধ নিতে পেরেছে বলে নৃত্য করতে করতে আনন্দ প্রকাশ করে। বড় ধরনের শিকার পাওয়া শিকারির বীরত্ব ও শৌর্যবীর্যের প্রকাশ হিসেবে খুমীরা মনে করে। তাই খুমীরা এখনও বড়ো বড়ো পশু শিকার পেলে শিকারের মাথার খুলি নিয়ে নৃত্য পরিবেশন করে তাদের শৌর্যবীর্য প্রকাশ করে এবং একই সাথে সংগীত পরিবেশন করে। সংগীতটি নিম্নরূপ :

গানের কথা

মে ছুং মা জং দং দং
ওয়ই লা মা জং দং দং
ডকি কলে সুং ঙাই অঁ
ফিহ্ ফিহ্ ফিহ্

অনুবাদ

জঙ্গলের ঘাসবন
দোলে এলোমেলো
সীমান্তের বাঁশবন
হেলে দোল খায়
ও পেতনিবুড়ি শূকর তুমি
এবার পেয়েছি তোমায়।
হৈ হৈ হৈ

২. লিংময় লোকনৃত্য

খুমীরা বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে লিংময় লোকনৃত্য পরিবেশন করে থাকে। তারা মনে করে 'লিংময় পর্বত' পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু ও পবিত্র পর্বত। এই পর্বতটি মানুষের প্রথম আবাসভূমি। এখানেই প্রথমে মানব সভ্যতা গড়ে উঠেছিলো। তারা মনে করে বর্তমানে এখান থেকেই সারা বিশ্বে মানুষ ছড়িয়ে গেছে। তারা গান গেয়ে গানের সুরে সুরে তাল

মিলিয়ে একে অপরের হাত ধরাধরি করে নেচে নেচে আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব সকলকে আহ্বান জানায় 'লিংময়' পর্বতে আবারও সমবেত হয়ে এক সাথে থাকার জন্য। সেখানে নতুন করে আবারও আরেকটি সভ্যতা সৃষ্টি করতে।

Tleaung ri chi awi ba
Tleaung sai chi awi ba
vai chi angso chi my
angjeung lam man bo I
kam rawi chi awi ba
peui leng chi awi ba
leung mawun mo ba
leung jo mo ba
jo awi ang be chi awi
lyh awi ang be chiawi
neung awi ang vawi chi awi
sui na ang vawi chi awi
mivai sabeaung teu ly
Angso sabeaung teu ly
leung mawn mo ba
leung jo mo ba.

অনুবাদ

হে প্রিয় বন্ধুগণ
হে প্রিয় বান্ধবীরা
পূর্বপুরুষদের রেখে যাওয়া রীতি
সেখানে এখনো স্থায়ীভাবে আছে।
সমসাথী বন্ধুরা
সমসাথী বান্ধবীরা
লিংময় পর্বতভূমিতে
থাকবো আমরা একসাথে।
হে বন্ধু যোদ্ধাগণ
হে বান্ধবী যোদ্ধাগণ
হে মাসী-পিসীগণ
হে আত্মীয়স্বজনেরা
ওটা আমাদের আদি আবাসভূমি
ভালো হোক, মন্দ হোক
লিংময় পর্বতভূমিতে
থাকবো আবার একসাথে।

৩. সে আঁ আহো নাই (কলাপাতা বাতাসে দোলানো নৃত্য)

এ নৃত্যের অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে বাঁশি অন্যতম। এ বাঁশির সুরে তাল মিলিয়ে খুমী যুবতীরা নৃত্য পরিবেশন করে। কেউ যখন নতুন ঘর নির্মাণের কাজ শেষ করে নতুন ঘরে উঠে তখন এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়ে থাকে। এ অনুষ্ঠানের নৃত্যের নাম হলো 'সে আঁ আহো নাই' নৃত্য। এর অর্থ হলো— 'কলাপাতা বাতাসে দোলানো নৃত্য' 'সে আঁ আহো নাই' নৃত্যের উদ্দেশ্য হলো ভূতপ্রেতের আক্রমণ এবং নতুন কোনো অশুভ অপদেবতার শক্তির আক্রমণ হতে রেহাই পাওয়া। এ নৃত্যের মধ্য দিয়ে রোগব্যাধি এবং বিভিন্ন ধরনের অশুভ অপশক্তি বিদায় হয় এবং ঘরবাড়ি মঙ্গলময় হয় বলে খুমীরা বিশ্বাস করে। 'আরেং চাইনা' উৎসবেও এ ধরনের নৃত্য পরিবেশন করা হয়।

৪. তোয়াই কালাং (যুদ্ধ নৃত্য)

'তোয়াই কালাং' নৃত্য হলো খুমীদের একটি জনপ্রিয় লোকনৃত্য। এই নৃত্যটি 'আরেং চাইনা' অনুষ্ঠানেও পরিবেশন করা হয়। 'আরেং চাইনা' হলো একটি রাজকীয় উৎসব। এই উৎসবটি গরু হত্যা করে আয়োজন করা হয়। সাধারণত এ উৎসবটি নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যে আয়োজন করা হয়ে থাকে। জুমে অধিক পরিমাণে ফসল উৎপাদিত হলে 'আরেং চাইনা' উৎসবটির আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠান আয়োজন করতে হলে অনেক টাকা-পয়সার প্রয়োজন হয়। তাই এই অনুষ্ঠান যে কেউ ইচ্ছে করলেও বেশি খরচের কারণে করতে পারে না। অনুষ্ঠানে অন্যান্য পাড়ার লোকদের নিমন্ত্রণ করে খাওয়ানো হয়। এ অনুষ্ঠানটি সাতদিন সাতরাত ধরে চলে। অনুষ্ঠান চলাকালে প্রতিদিন কমপক্ষে একটি গরু জবাই করে রান্না করে খাওয়ানো হয়। এ অনুষ্ঠানে সাধারণত বয়স্ক পুরুষ ও মহিলারাই নৃত্য পরিবেশন করে থাকে। খুমী ভাষায় এই নৃত্যকে 'তোয়াই কালাং' বা 'তাং ন নাই' বলা হয়। কথিত আছে, প্রাচীনকালে খুমীদের সাথে পাশের রাজ্যের এক শাসকের যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে খুমীরা বিজয় অর্জন করে। তখন এই বিজয়কে উপলক্ষ করে এক নৃত্যানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। নৃত্যের মাধ্যমে খুমীদের বীরত্ব প্রকাশ করার জন্যই মূলত এই 'তোয়াই কালাং' নৃত্যানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এই নৃত্যানুষ্ঠানে পুরুষরা 'চারাং' (ঢাল-তলোয়ার) দিয়ে যুদ্ধের ভান দেখিয়ে নৃত্য পরিবেশন করে আর নারীরা সামনে ও পেছনে একপা একপা ফেলে বাজনার তালে তালে এই নৃত্য পরিবেশন করে।

ম্রো লোকনৃত্য

১. চাকলু প্লাই (শিকারি নৃত্য)

'চাকলু প্লাই' ম্রোদের একটি জনপ্রিয় ও ঐতিহ্যবাহী নৃত্য। প্রকৃতির কোলে আদিম সংস্কৃতিকে আঁকড়ে ধরে বান্দরবান পার্বত্য জেলায় বসবাসকারী প্রান্তিক জনগোষ্ঠী ম্রো জনগোষ্ঠীরা ফাঁদ পেতে নানা ধরনের জীবজন্তু শিকার করে। ম্রোরা শিকারে পাওয়া জীবজন্তুর মাথার খুলি গৃহের দেয়ালে টাঙ্গিয়ে রাখে। এসব নিজেদের শৌর্যবীর্যের প্রতীক হিসেবে তারা ধরে রাখে। এসব তাদের সামাজিক সংস্কার ও ঐতিহ্যরূপেও

স্বীকৃত। ম্রোরা উল্লেখযোগ্য কোনো শিকার পেলে সে শিকারের মুণ্ড নিয়ে বীরত্ব প্রকাশের জন্য এই নৃত্য করে থাকে। তাই এ শিকারি নৃত্য ম্রোদের সামাজিক সংস্কার ও ঐতিহ্যগত সংস্কৃতির অনন্য প্রকাশ। এজাতীয় নৃত্যের জন্যে একজন দলনেতা থাকে। তিনি একজন দক্ষ শিকারিরূপে অন্যান্যদের নাচের আহবান জানিয়ে নৃত্যের সূচনা করেন। ১০টি বাঁশের চুঙায় ফুঁ দিয়ে শব্দ করে এই শব্দের তালে তালে মং (কাঁসার ঘণ্টা), ঢোল, ও কাঁসার থালা বাজিয়ে নৃত্যের উপযোগী তাল সৃষ্টি করা হয়। দলনেতা গান গেয়ে যায় আর শিল্পীরা একে অপরের হাত ধরাধরি করে হাঁটু ভেঙে ভেঙে সামনে-পেছনে পা ফেলে শিকার করা পশুর মাথার চতুর্দিকে ঘুরে ঘুরে নৃত্য পরিবেশন করে। শিকারকৃত পশুর মাথাটি মাচাং ঘরের ভেতর এক জায়গায় রেখে ঐ মাথার চারিপাশে ঘুরে ঘুরে শিল্পীরা এ নৃত্য পরিবেশন করে। মাঝে মাঝে শিল্পীরা ই-হু-হু-উ শব্দ সৃষ্টি করে আনন্দ উল্লাস করে।

গান

হাংচাম চা চ
তুই দুং তুই এদ কানবা।
হাংচাম চা চ
সংস্নিন সংনাত কানবা
চাং স্রেংখাঙ বা উঁয়া লা।

অনুবাদ

কখনো জলজ প্রাণী
আহার করিও না।
কখনো '*সংসিন-সংনাত*'
আহার করিও না
পরিশুদ্ধ থেকো সর্বক্ষণ।

[*সংসিন-সংনাত*- এর অর্থ জুমের এক প্রকার মসলাজাতীয় উদ্ভিদ]

শিল্পী দলের দলনেতা শিকারিকে উপদেশমূললক গান শুনিয়ে উপদেশ দিতে থাকে। জলজ প্রাণীর মধ্যে ইল মাছ, বাইং মাছ, লাল কাঁকড়া, পাহাড়ি শামুক, ব্যাঙ আর 'সংসিন সংনাত' নামক জুমের উৎপাদিত মসলা খেলে নাকি শিকারিরা অপবিত্র হয়ে যায়। এরফলে শিকারি যিনি শিকার করবেন জীবজন্তু আর তার ফাঁদে পড়ে না বলে ম্রোদের বিশ্বাস। তাহা শিকারিকে স্মরণ করিয়ে দেবার জন্য নৃত্যানুষ্ঠানে শিল্পীর দলনেতা এ গানটি গেয়ে শিকারিকে উৎসাহ যোগায়।

২. হিয়ারেং প্লাই (যুদ্ধ নৃত্য)

ম্রো জনগোষ্ঠীরা এখনও দলবদ্ধভাবে আদিম সাম্যবাদী জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত। মায়ানমারের আরাকানে আকিয়াব জেলায় যখন ম্রোরা বসবাস করতো তখন অন্যান্য

জাতিগোষ্ঠীদের সাথে তাদের প্রতিনিয়ত সংঘর্ষ হতো। বিশেষ করে খুমীরা ম্রোদের উপর আক্রমণ চালাতো এবং তাদের ধনসম্পত্তি লুটপাত করতো। এ ঘটনাটি আরাকানির ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় ঘটনা। খুমীদের এই লোমহর্ষক কাহিনিগুলো আজও ম্রোদের মধ্যে কিংবদন্তি হয়ে আছে। তখন ম্রোরা নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা করার জন্য নানা ধরনের রণকৌশল অবলম্বন করতো। প্রতি মুহূর্তে একে অপরের কাছে তারা নানা ধরনের অস্ত্র চালনার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতো। ফলে আত্মরক্ষার্থে ম্রো পুরুষ মাত্রই নিজস্ব প্রস্তুতকারী অস্ত্র চালনায় আজও সিদ্ধহস্ত। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, আদিকালের রণঅস্ত্র এখনো ম্রোদের কাছে রয়েছে। সেই রণঅস্ত্রগুলোর মধ্যে তীর, ধনুক, বল্লম, দা, তলোয়ার বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তবে তারা বর্তমানে এসব রণঅস্ত্র আত্মরক্ষার কাজে ব্যবহার করে না। শুধু বিবাহ অনুষ্ঠানে কনের পিতাকে তাদের ঐতিহ্যরূপে এসব প্রদান করে থাকে। অস্ত্র ছাড়াও ম্রোরা বহিঃশত্রুর আক্রমণ হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য গ্রামের সীমানার চারদিকে বিভিন্ন ধরনের ফাঁদ পুঁতে রাখে। যাতে শত্রুরা আক্রমণ করলে আক্রমণের সময় ফাঁদে পড়ে আক্রমণকারীর প্রাণপাত ঘটে। এখনও সেই ভীতিকর দিনের রণকৌশলাদি প্রশিক্ষণকে ঐতিহ্যস্বরূপ ম্রোরা নৃত্যের মাধ্যমে ধরে রেখেছে। হিয়ারেং প্লাই নৃত্যটি ঐ ঐতিহ্যকে ধরে রাখার জন্যই ম্রোরা করে থাকেন। এজাতীয় নৃত্যের জন্য দলনেতা মাথায় সাদা কাপড়ের পাগড়ি এবং চুলের খোঁপায় ভীমরাজ পাখির লেজের পালক গুঁজে নৃত্যের সাজে সাজে। আর অংশগ্রহণকারীরা প্রত্যেকে ঐতিহ্যবাহী পোষাকে সজ্জিত হয়ে যুদ্ধের সাজে সেজে নৃত্যে অংশগ্রহণ করে। অংশগ্রহণকারীরা একদলে ৪-৫ জন করে দুই দলে ভাগ হয়ে নৃত্যের মাধ্যমে যুদ্ধ করার অভিনয় করে। প্রত্যেক দল ঢাল ও তলোয়ার নিয়ে নেচে নেচে একদল অপর দলকে আক্রমণ করে। তখন অপর দল নৃত্যের মাধ্যমে আক্রমণ প্রতিহত করার অভিনয় করে। এজাতীয় নৃত্যে কেবল পুরুষরাই অংশগ্রহণ করে।

বম লোকনৃত্য

১. রোখা [বাঁশ নৃত্য (Bamboo dance)]

রোখা বম আদিবাসীদের অন্যতম একটি ঐতিহ্যবাহী নৃত্য। বম আদিবাসীদের সমাজ জীবনে আনন্দোৎসবের চেয়ে শোকানুষ্ঠানের প্রাধান্য লক্ষণীয়। রোখা বা বাঁশ নৃত্য Bamboo dance নামে খ্যাতি লাভ করেছে। বম সমাজে নৃত্যগীত শুধু আনন্দের জন্য নয় শোকানুষ্ঠানেও হয়ে থাকে। বিশেষ কারোর অপক্ষঘাতে মৃত্যু, প্রসবজনিত অকাল মৃত্যু অথবা অস্বাভাবিক মৃত্যুতে এই নৃত্যগীত হয়। উল্লেখিত অস্বাভাবিক মৃত মানুষের শোকার্ত পরিবারের বাড়ির উঠানে সমান জায়গায় যুবক-যুবতী, বুড়োবুড়িরা সকলেই সমবেত হয়। সাধারণত এই নৃত্যগীতে যুবক-যুবতীরা অংশগ্রহণ করতে দ্বিধাবোধ করে। শোকার্ত পরিবারে আগমনকারীরা নিজেদের মধ্যে অনুনয়-বিনয় আর বিশেষভাবে অনুরোধ করে অবশেষে সকলেই ঐ বাঁশ নৃত্যে অংশগ্রহণ করে। জোড়া-জোড়া লম্বা বাঁশের দুই প্রান্তে আড়াআড়িতে দু'বার উপরে-নীচে, দু'বার পাশাপাশি অর্থাৎ একবার ফাঁক একবার চাপা বাঁশের ঠুকাঠুকিতে ছন্দতাল সৃষ্টি করা হয়। এ নৃত্যের সময় যখনই জোড়া বাঁশ ফাঁক হবে সেই ফাঁকে সতর্কতার সাথে পা ফেলে ফেলে এ নৃত্য করতে হয়।

এভাবে শিল্পীরা বৃত্তের আকারে নেচে নেচে ঘুরে ঘুরে এই রোখা নৃত্য করে। পাশে উপবিষ্ট অন্যরা তখন গান গাইতে থাকে। ছন্দে ছন্দে বাঁশের ঠুকাঠুকির শব্দ আর হালকা চপল গানের সুর শোকের পরিবেশকে একটুখানি হলেও হালকা করে। শোকার্ত পরিবারকে সান্ত্বনা দান ও সাহচর্য দেওয়াই এই নৃত্যগীতের মূল উদ্দেশ্য।

রোখা তলা হেন (২)
আয় খালান, কান, পু লু চু,
লান মেন্ আ রল মান রী লৌ হেন;
আয় হয় মান লৌ না রেঃ লান্ (২)

বম আদিবাসীদের ঐতিহ্যবাহী বাঁশনৃত্য

রোখা তলা হেন (২)
লুংতিয়াম আ কিয়াম, মান রী লৌ (২)
কাথাই কীর মেন্ কীর মেন্ কীর মেন্
কা রুণ- আল মুন লৌ হি তেঃ (২)
রোখা তলা হেন (২)
কান জুয়াত মায়সিয়ল্ নু বাং আয় (২)
কায় হয় থলা মী কা হয় থলা মী
খয়ানু নিঃ আ তেলই তির তুয়ান। (২)
রোখা তলা হেন (২)
তিলিম মার ঙৌ কী ঠা খী, (২)

মাল সম্ মানলৌ না রেঃ লান
লেই দায় তাং দাঙ না যাওয়ে। (২)

ভাবার্থ

পিতামহের মরদেহ মাটিতে যায় নাই মিলিয়া
নয়ন জুড়িয়া তোমায় না দেখিতেই
চলিয়া গেলে আমায় ছাড়িয়া।
মনে সাধ পুরিল নারে বধূ
ওগো বধূ ফিরিয়া আসো ফিরিয়া আসো
ঘর যে আমার বড় শূন্য লো।
সোহাগী গয়ালকে যেমন রাখিতাম আদরে
নয়ন ভরিয়া দেখিতাম দিবানিশি যাহারে
বিধাতা ছাড়াইয়া নিল ত্বরা করি।
চাহিয়া দেখো সোহাগী গয়ালটির শিং দুটি
আসছে উৎসব পার্বণে উঠিবে যে মাতি
শুয়ে রইল যে নরম মাটির কোলে।

২. সালু লাম (পশুর মুণ্ড শিকার নৃত্য)

ঘরের সম্মুখ দেয়ালে সারি সারি সাজানো বন্যজন্তুর মাথা বা কঙ্কালগুলোকে যে শিকারি এই জীবজন্তুগুলোকে শিকার করেছে তার জীবৎকালে অন্তত একবার শূচিকরণ করা বিধেয়। তা-না হলে পরকালে শিকারির জন্য ঐ জীবজন্তুর আত্মাগুলো হিংস্র, প্রতিহিংসাপরায়ণ ও হুমকি হয়ে দাঁড়ায় বলে বম আদিবাসীরা বিশ্বাস করে। এরকম বিশ্বাসের জন্য বমেরা *'সালু লাম'* (পশুর মুণ্ড শিকার নৃত্য) এর আয়োজন করে থাকে। এই রীতি অনুযায়ী শূচিকরণ সম্পন্ন হলে নাকি পশুর আত্মারা গৃহকর্তার বশীভূত হয়। সে উদ্দেশ্যে দেয়াল থেকে সব বন্যজন্তুর মাথার খুলিগুলো নামানো হয়। দাঁত, চোয়াল, শিং, মাথার খুলি, দাঁতের কপাট, একে একে ধুয়েমুছে ফকফকা পরিষ্কার করা হয়। অনেক দিন রৌদ্রে, বৃষ্টিতে অযত্নে অবহেলায় ঝুলে থাকায় মাথার খুলিগুলো নড়বড়ে হয়ে যাওয়া অংশগুলোকে দড়ি বা বেত দিয়ে পাকাপোক্তভাবে বাঁধা হয়। এরপর শুরু হয় নৃত্যানুষ্ঠান। জন্তুর মাথার খুলি দু'হাতে উঁচুতে উত্তোলন করে ডানে বাঁয়ে ঘুরিয়ে নেচে নেচে উদ্ধত ভঙ্গিমায় পা ফেলে ও বাহুশক্তি প্রদর্শন করে এই নৃত্য করা হয়।

৩. সিয়া কী দেং (শিংনৃত্য)

সিয়া কী দেং বা শিংনৃত্য বম আদিবাসী সমাজে প্রচলিত মৃত ব্যক্তিদের স্মরণোৎসব। এই উৎসবটি অতি ব্যয়বহুল ভোজ উৎসব। কেবল খ্যাতিমান বা কোনো বিশিষ্ট মৃত মানুষের স্মরণার্থে এই নৃত্যানুষ্ঠান হয়ে থাকে। জীবৎকালে তার যশ, খ্যাতি ও নানান সুকীর্তি

নৃত্যের মাধ্যমে প্রকাশ করে পরিবেশন করাই শিং নৃত্যানুষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য। এ নৃত্যে শুধু পুরুষরাই অংশগ্রহণ করে থাকে। বম শিল্পীরা মাথায় পাগড়িসহ ঐতিহ্যবাহী পোশাক পরে একক বা দলীয়ভাবে এই নৃত্য পরিবেশন করে। এই নৃত্য করতে হলে বিশেষ দক্ষতার প্রয়োজন। একজোড়া শিং হাতে নিয়ে প্রথমে সামনে, উঁচুতে, পিছনে এবং বাম পা উঁচু করে তুলে একইভাবে ডান পা উঁচু করে তুলে পায়ের ফাঁকে শিং দুটি ঠুকঠাক বাজায়। আবার এক পা অপর পায়ের সাথে জড়িয়ে হাঁটুকে মাটিতে লাগিয়ে আবার এক পা অপর পায়ের সাথে জড়িয়ে হাঁটুকে মাটিতে না লাগিয়ে বিশেষ ভঙ্গিতে নিতম্ব মাটিতে লাগিয়ে আবার উচিয়ে শিং দুটিকে একটার সাথে আরেকটা আঘাত করে ঠুকঠাক শব্দের তালে তালে এই নৃত্য পরিবেশন করা হয়। এই নৃত্য পরিবেশনে শিল্পীর শারীরিক সক্ষমতা এবং বিশেষ দক্ষতার প্রয়োজন হয়। এই নৃত্যে কোনো গান গাওয়া হয় না।

ত্রিপুরা লোকনৃত্য

১. গরাইয়া নৃত্য : গরাইয়া নৃত্য জমিচাষ ও ত্রিপুরাদের জীবন-জীবিকার উপর রচিত। জুমের জঙ্গলকাটা, জুমে ফসলের বীজ বপন, জুমক্ষেতের আগাছা পরিষ্কার করা, পশুপাখি তাড়ানো, ধানকাটা, ধান পরিষ্কার করা, সুতা কাটা, কাপড় বুনন ইত্যাদি জীবন-জীবিকা নিয়ে এ নৃত্যের দৃশ্যসমূহ সাজানো হয়। এ নৃত্যে ঢোল ও বাঁশি ব্যবহার করা হয়। এতে কথামালার সুরে সুরে নৃত্য পরিবেশন করা হয়। এ নৃত্য পরিবেশনের ক্ষেত্রে শিল্পীর সংখ্যা যত বেশি এই নৃত্যটি ততই আকর্ষণীয়।

২. কাথারক নৃত্য : 'কাথারক নৃত্য' বা বোতল নৃত্য ত্রিপুরাদের একটি ঐতিহ্যবাহী লোকনৃত্য। এই নৃত্যটি খুবই আকর্ষণীয় ও জনপ্রিয়। সাধারণত এ নৃত্য ত্রিপুরাদের বিবাহ অনুষ্ঠানে পরিবেশন করা হয়। ত্রিপুরাদের বিবাহ অনুষ্ঠানে 'কাথারক পূজা' নামে এক ধরনের পূজা দিতে হয়। এই পূজাতে 'কাথারক নৃত্য' পরিবেশন করতে হয়। এই কাথারক পূজার সমাপনান্তে বর ও কনে পক্ষের কেঁজু-কেঁজা দু'জন ঢোলবাদকের ঢোলের তালে তালে মাথায় দীপশিখা সমেত বোতল, হাতে থালাসহকারে এবং পানি ভর্তি কলসির উপরে উঠে দু'জনকেই এই নৃত্য পরিবেশন করতে হয়। এখানে দীপশিখা জ্ঞানের প্রতীক, পানি ভর্তি কলসি কর্মের প্রতীক, মদভর্তি বোতল শক্তির প্রতীক এবং ফুলের মালা ভক্তির প্রতীক। সুতরাং জ্ঞান, শক্তি ও কর্মের সমন্বয়ে কাথারক নৃত্য একটি অনুপম সৃষ্টি। ত্রিপুরা রাজারা যুদ্ধ শুরু করার আগে এই কাথারক বা মাঙ্গলিক নৃত্যের আয়োজন করতো। এখনো কোনো শুভ কাজ শুরু করার পূর্বে অথবা জুম কাটার আগে বা কোনো কিছুর মঙ্গল কামনায় ত্রিপুরারা কাথারক পূজার আয়োজন করে 'কাথারক' নৃত্য পরিবেশন করে থাকে। এজন্যই এই নৃত্যের আরেক নাম মাঙ্গলিক নৃত্য।

পাংখোয়া লোকনৃত্য 'সাখা লা' (শিকারি নৃত্যগীত)

পাংখোয়ারা শিকারপ্রিয় জাতি। অবসর সময় পেলেই তারা শিকারে গিয়ে বিভিন্ন পশুপাখি, জীবজন্তু শিকার করে। শিকার পেলে তারা গানের তালে তালে শিকারের মুণ্ড বা মাথা নিয়ে

এ নৃত্য পরিবেশন করে থাকে। এই নৃত্যকে পাংখোয়া ভাষায় 'সা-খা-লা' বা শিকারি নৃত্য বলা হয়। এ নৃত্য পরিবেশনের সময় গানও গাওয়া হয়। গানটি নীচে দেওয়া হলো :

সা মা কা-সা মা কাসা
হাই র পা-সা মা কা-সা
আই রিয়াম তু মেন বেই লেই ইন,
কেই মা লৌ রিয়াম তা উ মো॥
লিয়ানচি লিয়ানচি কেই মা-নি,
তুয়ার না লিয়ানচি কেই মা-নি;
তুয়ার না লিয়ানচি রালনা থাং নু লাই লৌ ম,
তুয়ার না লিয়ানচি কেই মা-নি॥

মমার্থ : এসো, এসো,
রাস্তার আশপাশে
বন-জঙ্গলের ভেতর
আরও যত শিকার (পশুপাখি, জীবজন্তু) আছে
এসো...
কেউ যদি তোমাদেরকে সমাদর করে
আমার কাছে এসো।

মারমা লোকনৃত্য

মারামা সমাজের নৃত্যের ঐতিহ্য অত্যন্ত প্রাচীন ও ঐতিহ্যমণ্ডিত। মূলত নৃত্যগুলো জীবন-জীবিকা, বিশ্বাস ও দৈনন্দিন জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। মারমাদের বিভিন্ন ধরনের লোকনৃত্য রয়েছে।

১. উঁচোওয়ে আকাহ্ : মারমা সমাজে উঁচোওয়ে আকাহ্ একটি নৃত্যগীত বিশেষ। এককভাবে একজন শিল্পীর মাধ্যমে এজাতীয় লোকনৃত্য পরিবেশন করা হয়। এ গীতিনৃত্যে ভবিষ্যতের ঘটনাবলি কেমন হতে পারে তার ইঙ্গিত থাকে। অর্থাৎ ভবিষ্যদ্বাণী প্রদান করার জন্যই এই লোকনৃত্য পরিবেশন করা হয়।

২. ক্যমুইঙ্ আকাহ্ : ক্যমুইঙ এর অর্থ ঢেঁকি চুড়ুন। আদিকালে যখন উন্নত বাদ্যযন্ত্রের আবিষ্কার হয়নি তখন এই চুড়ুনের সাহায্যে এক প্রকার নৃত্যের তাল সৃষ্টি করা হয়েছিলো। কালক্রমে এখান থেকেই 'ক্যমুইঙ আকাহ্' বা চুড়ুন নৃত্যের প্রচলন হয়। এ নৃত্যকে মারমাদের প্রাচীনতম নৃত্য বলে ধারণা করা হয়। এই নৃত্যে ৪ থেকে ৬টি চুড়ুন ব্যবহার করা হয়। বর্তমানে চুড়ুনের পরিবর্তে বাঁশের টুকরা ব্যবহার করা হয়।

৩. সইং আকাহ্ (শবদেহ নৃত্য) : মারমা সমাজে ধর্মীয় পুরোহিত অর্থাৎ ভান্তে, সমাজপতি ও রাজারা মৃত্যুবরণ করলে মৃতদেহকে নিয়ে এই সইং আকাহ্ নৃত্য পরিবেশন

করা হয়ে থাকে। মৃতদেহকে একটি সুসজ্জিত আকর্ষণীয় কফিনে রেখে সেই কফিনকে দলীয়ভাবে কাঁধে বহন করে গান গেয়ে কয়েক ঘণ্টা ধরে সইং নৃত্য পরিবেশন করা হয়। মৃতদেহ শেষকৃত্যানুষ্ঠানে মরদেহ দাফন বা আগুনে পোড়াবার আগে এ সইং আকাহ্ পরিবেশন করা হয়। সইং গীতের সাথে ঢোল, কাঠের তৈরি বাঁশি, বড় ঝাঁজ ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করা হয়। এই সইং সংগীত কাহিনিভিত্তিক দলের অধিনায়কের পরিচালনায় বিভিন্ন ভঙ্গিতে সংগীত গেয়ে নৃত্য পরিবেশন করা হয়।

মারমাদের সইং আকাহ

লোকক্রীড়া

এ জেলার জনসাধারণ অত্যন্ত ক্রীড়ামোদি। এ জেলায় অনেক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সংগঠন আছে। এরা বিভিন্ন সময়ে জাতীয় ও লোকজ বিভিন্ন খেলাধুলার প্রতিযোগিতা আয়োজন করে থাকে। এ জেলায় ক্রীড়ামোদিদের কাছে বর্তমানে ফুটবল ও ক্রিকেট খুবই জনপ্রিয়। তবে আবহমান বাংলার লোকজ খেলাধুলাও এখানে হয়ে থাকে। এগুলোর মধ্যে হা-ডু-ডু, কাবাডি, দাড়িয়া বান্ধা, সাঁতার, ডাংগুলি, বলিখেলা, নৌকা বাইচ, গরুর লড়াই, মুরগির লড়াইসহ নানা ধরনের খেলাধুলা এ জেলায় লক্ষ্য করা যায়। বাংলার লোকজ খেলাধুলার পাশাপাশি আদিবাসীদের ঐতিহ্যবাহী চিরায়ত লোকজ খেলাও এ জেলায় হয়ে থাকে।

ক. নৌকা বাইচ

নৌকা বাইচ শুধু বাংলা লোকক্রীড়া নয়। এ খেলাটি সর্বজন, সর্বদা সব জায়গায় অনুষ্ঠিত হতে দেখা যায়। অলিম্পিক খেলাতেও বিশ্বের অনেক দেশ এ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। বান্দরবান জেলাতে নৌকা বাইচের প্রতিযোগিতা প্রতিবছর আয়োজন করা হয়ে থাকে। বান্দরবানে নৌকা বাইচ সাঙ্গু নদীতেই অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। অনেক সময় স্থানীয়ভাবে বিভিন্ন ধর্মীয়-সামাজিক উৎসব হলেও নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। আবার মাঝেমধ্যে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন দিবসেও এই নৌকা বাইচের আয়োজন করা হয়। বান্দরবান জেলা নৌকা বাইচ দল বহুবার জাতীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণ করে সুনাম অর্জন করেছে। ১৯৯৬ সালে বান্দরবান মহিলা নৌকা বাইচ দল জাতীয়ভাবে চ্যাম্পিয়ন হয়ে স্বর্ণপদক জয় করে।

বলিখেলা

বলিখেলা শুধু চট্টগ্রামে নয়, এ ঐতিহ্যবাহী লোকখেলাটি পার্বত্য চট্টগ্রামেও অত্যন্ত জনপ্রিয়। বান্দরবানে বোমাং রাজার ঐতিহ্যবাহী রাজপুণ্যাহ মেলা, বৈশাখি মেলা, নববর্ষ উৎসবে এই বলিখেলার আয়োজন করা হয়ে থাকে। তখন বিভিন্ন এলাকার অনেক বলি এ খেলায় এসে অংশগ্রহণ করে।

খ. ঘিলাখেলা (চাকমা ও তঞ্চঙ্গ্যা)

এ খেলাটি পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রায় আদিবাসী সমাজে দেখা যায়। 'ঘিলা' নামে একপ্রকার বন্যলতার বিচি দিয়ে এই খেলা করা হয়ে থাকে। এ ঘিলালতা সাধারণত গভীর বনে বড় বড় গর্জনবৃক্ষ বা অন্যান্য বৃক্ষের গায়ে প্যাচিয়ে ওঠে। এর ফল সিম ফলের মতো কিন্তু আকারে সিম ফলের চেয়ে অনেক বড়। এর বিচি প্রায় ১০০-১৫০ গ্রাম ওজন হয়ে থাকে। বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রামে গভীর বন না থাকায় ঘিলার অভাবে অনেক সময় গাছ দিয়ে তৈরি ঘিলা দিয়েও এই খেলা অনুষ্ঠিত হয়। সাধারণত এ খেলা দুই দলে বিভক্ত হয়ে খেলতে হয়। খেলাটি হয় তের স্তরে (ওভারে) এবং প্রত্যেকটি স্তর বা ওভারকে এক পয়েন্ট হিসেবে ধরা হয়। স্তর বা ওভারগুলো যথাক্রমে চুন্দী,

তদলা (গদলী/গতনা), পুন্দলা (রোন), আদত্তো, পিলাং, গুরগজি, মধ্যমা, নক্‌কজি, কেরেই, ভাদ, বিরি (বারেই), তুর, গোদা, চুলেং ইত্যাদি। একস্তরের বা ওভারের মধ্যে পাতানো ঘিলাগুলোকে নির্ধারিত দূরত্বে স্থানচ্যুত করতে পারলে দলটি পরবর্তী স্তর বা ওভারে খেলার সুযোগ পায়। উভয় দল এভাবে খেলার পর পয়েন্ট হিসাব করে যে দল বেশি পয়েন্ট লাভ করে সে দল বিজয়ী হয়।

নাদেং খেলা (চাকমা লোকক্রীড়া)

চাকমা ভাষার 'নাদেং'-এর অর্থ বাংলায় লাটিম। এই খেলা হয় একসাথে কয়েকজনের মধ্যে। প্রতিদ্বন্দ্বী দুই খেলোয়াড়ের মধ্যে একজন নাদেং ঘুরিয়ে দেয় আর প্রতিপক্ষ খেলোয়াড়টি উক্ত নাদেংটিকে লক্ষ্য করে নিজের নাদেং দিয়ে সজোরে আঘাত করে বা 'ঘেই' মারে। আঘাতকারী খেলোয়াড়ের নাদেংটি মাটিতে কমপক্ষে আড়াই পাক ঘুরলে এবং প্রতিপক্ষ নাদেংটি পড়ে (মরে) গেলে আঘাতকারী খেলোয়াড় এক পয়েন্টের আধিকারী হয়। প্রতিদ্বন্দ্বী দুই খেলোয়াড়ের মধ্যে প্রত্যেকে তিনবার করে 'ঘেই' মারার সুযোগ পায়। এভাবে খেলার পর যে খেলোয়াড়র বেশি পয়েন্ট পায় তাকেই বিজয়ী হিসেবে ধরা হয়।

গ. ম্রোদের লোকক্রীড়া তাকেত খেলা

চাংক্রান উৎসব (নববর্ষ উৎসব) হলে ম্রো সমাজে খেলাধুলার আয়োজন করা অত্যাবশ্যকীয়। খেলাধুলার মধ্যে 'তাকেত' (বাঁশ ঠেলা) খেলা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ম্রো পুরুষগণের বৌদ্ধবিহারে ধর্মীয় কার্যাদি সম্পন্ন করা হলে তারপর 'তাকেত' (বাঁশ ঠেলা) প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। এই উৎসবটি চাংক্রানের দ্বিতীয় দিনে হয়ে থাকে। চিম্বুক পাহাড়ে ফটেসিং পাড়ায় এই খেলাটি প্রতি বছর আয়োজন করা হয়।

ম্রো আদিবাসীদের ঐতিহ্যবাহী তাকেত খেলা

দূর-দূরান্তের বিভিন্ন এলাকা থেকে যুবকরা এ খেলায় অংশগ্রহণ করতে আসে। তাদের সাথে আসে তাদের প্রিয়সঙ্গী। খেলোয়াড়রা খেলায় বাজি ধরে তার প্রিয় বান্ধবীদের সাথে। খেলোয়াড় খেলায় বিজয় অর্জন করতে পারলে তার বান্ধবীকে এনামেলের চুড়ি বানিয়ে দেবে আর বান্ধবীও বিজয়ী খেলোয়াড় প্রিয় বন্ধুকে নিজ হাতে বানানো বিন্নি ধানের মদ ও পুরুষদের প্রিয় অলংকার 'পতু' উপহার দেবে। এই খেলাতে দু'জন করে খেলোয়াড় অংশগ্রহণ করে থাকে। তিন হাত লম্বাবিশিষ্ট একখণ্ড বাঁশকে দুই প্রান্তে দু'জন যুবক বগলে আগলে রেখে ঠেলাঠেলি করে। ঠেলাঠেলি করে প্রতিপক্ষকে মাটিতে ফেলে দিতে পারলে বিজয় অর্জন করে। এ খেলার নিয়মগুলো হলো :

১. এ খেলায় তিন হাত লম্বাবিশিষ্ট একখণ্ড মিটিঙ্গ্যা বাঁশ লাগে;
২. দু'জন করে খেলায় অংশগ্রহণ করতে হয়;
৩. একজন খেলোয়াড় যতক্ষণ পরাজয়বরণ করবে না ততক্ষণ অন্য খেলোয়াড়দের সাথে তাকে খেলতে হবে;
৪. এভাবে সকলের সাথে খেলার পর সর্বশেষ বিজয়ীকে চ্যাম্পিয়ন বলে ঘোষণা করা হয়;
৫. খেলার সময় কোনো খেলোয়াড়কে অন্য কেউ প্রভাবিত করতে পারবেনা।

এ খেলার আয়োজনের পেছনে ছোটো একটি পৌরাণিক কাহিনি আছে। এককালে পার্শ্ববর্তী রাজ্যের সাথে ম্রোদের যুদ্ধ বাঁধে। যুদ্ধ সমাপ্তি না হওয়ার পূর্বেই সেনাপতি নিহত হলে সেই সেনাপতির পদটি শূন্য হয়ে পড়ে। অপরদিকে সেনাপতি নিহত হবার পর সেনাপতি না থাকায় প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে সৈন্যদের মধ্যে ভয়ে আতঙ্কের সৃষ্টি হয় এবং যুদ্ধ করতে অনাগ্রহ জন্মে। যুদ্ধ করতে নিরুৎসাহী হয়ে দিকবিদিক পালিয়ে যেতে শুরু করে। তাতে ম্রোদের পরাজয় নিশ্চিত হয়ে পড়ে। এমন অবস্থায় সৈন্যদের মাঝ থেকে সাহসী এবং বলবান শক্তিশালী সেনাপতি নির্বাচনের জন্য রাজা শীঘ্রই 'তাকেত' প্রতিযোগিতার আয়োজন করেন। এই খেলায় যে চ্যাম্পিয়ন হবে তাকেই সেনাপতির আসনে অধিষ্ঠিত করার ঘোষণা দিয়ে রাজা এই তাকেত প্রতিযোগিতার আয়োজন করলেন। রাজার ঘোষণা মতে রাজ্যের সমস্ত যুবক এলো 'তাকেত' খেলায় অংশগ্রহণ করতে। সেখান থেকে খেলায় বিজয়ী চ্যাম্পিয়ন যুবকটিকে দিয়ে রাজা সেনাপতির শূন্যপদটি পূরণ করেন। এরপর নতুন বলবান ও শক্তিশালী সেনাপতি পেয়ে সাহস ও মনোবল নিয়ে আবার যুদ্ধে নেমে পড়লো ম্রো সৈনিকরা। এক সপ্তাহ যুদ্ধের পর সেনাপতি বিজয়ী হয়ে বীরবেশে দেশে ফিরে আসলো। এই বিজয়ে রাজা অত্যন্ত খুশি হয়ে তার কন্যাকে সেনাপতির সাথে বিয়ে দিলেন। এই ঐতিহ্যকে ধরে রাখার জন্য মূলত চাংক্রান উৎসবে ম্রোরা এ তাকেত খেলার আয়োজন করে।

ঘ. ত্রিপুরা লোকখেলা

১. সুকই : ত্রিপুরাদের এই খেলাটি খুবই আকর্ষণীয় ও জনপ্রিয়। সাধারণত দল বেঁধে এ খেলা খেলতে হয়। প্রতিটি দলে ৫ থেকে ১০জন খেলোয়াড় নিয়ে বৈসু দিনে

সাধারণত এ খেলার আয়োজন করা হয়ে থাকে। কমপক্ষে প্রতি দলে ২-৩ জন খেলোয়াড় নিয়ে এ খেলা চলে। সুকই খেলাকে চাকমারা 'ঘিলা খেলা' বলে। এ খেলার জন্য খোলামেলা এবং লম্বালম্বি মাঠের দরকার। সুকই খেলা গোলাকারাকৃতিভাবে খেলতে হয়। ত্রিপুরাদের সুকই খেলায় ২১টি স্তর বা ওভার আছে। যেমন : ১. আঁমক, ২. পেকাই, ৩. এঁসুক বথ, ৪. ইয়াকসি, ৫. খাচুক, ৬. ফামকই-আঁকসি, ৭. অমথাই, ৮. মকল, ৯. কপাল, ১০. আঁকতিরি, ১১. ফিকং; ১২. য়েসি, ১৩. আপলাই ইত্যাদি। যে দলটি আগে নির্ধারিত স্তরগুলো অতিক্রম করে চূড়ান্ত স্তর শেষ করতে পারবে সেই দলটি বিজয়ী দল হিসেবে বিবেচিত হবে।

২.গুদু খেলা : গুদু খেলাও সুকই খেলার মতো দল বেঁধে খেলতে হয়। এ খেলাটি ত্রিপুরাদের ঐতিহ্যবাহী এক ধরনের জনপ্রিয় খেলা। এ খেলাটি অনেকটা কাবাডি খেলার মতো। এ খেলার জন্য দৈর্ঘ্যে ৯-১০ হাত এবং প্রস্থে ৭-৮ হাত প্রশস্ত মাঠ তৈরি করতে হয়। এ ধরনের মাপে মাঠের মাঝখানে দাগ কেটে দুটি ক্ষেত্র (কোট) তৈরি করা হয়। এ খেলায় খেলোয়াড়কে গুদু গুদু শব্দ উচ্চারণ করে এক নিশ্বাসে বিপক্ষ দলের কোটে গিয়ে বিপক্ষ দলের যে কোনো খেলোয়াড়কে স্পর্শ করে ফিরে আসতে হয়। স্পর্শ করে ফিরে আসতে পারলে যে খেলোয়াড়কে স্পর্শ করা হয় সেই খেলোয়াড় মারা গেছে বলে ধরে নেয়া হয় এবং ঐ খেলোয়াড়কে কোট থেকে বের করে দেওয়া হয়। আবার প্রতিপক্ষ দলের খেলোয়াড়রা যদি তাকে ধরে ফেলে এবং ধরা পড়া খেলোয়াড়টি যদি এক নিশ্বাসে উচ্চারণ করা গুদু গুদু শব্দ বন্ধ করে কিন্তু মাঝখানের রেখাটা স্পর্শ করতে না পারে তাহলে সেও মরে যায় বলে ধরে নেওয়া হয় এবং তাকেও কোট থেকে বের করে দেওয়া হয়। এভাবে যে দল অপর দলের সকল সদস্যকে কোট থেকে বের করে দিতে পারবে সেই দলই বিজয়ী দল বলে ঘোষিত হবে। এই খেলাটি হাডুডু খেলার অনুরূপ।

ঙ. খুমী লোকখেলা 'আক্লিং আকোনাই'

খুমীরা নববর্ষের সময় এবং যখন জুমের সব কাজ শেষ হয় তখন এই খেলাটির আয়োজন করে থাকে। 'আক্লিং আকোনাই' খেলাটি দু'জনে মিলে খেলতে পারে, আবার অনেকজনে মিলেও এই খেলা খেলতে পারে। পাড়ার ছেলেমেয়েরা প্রতিযোগিতার মাধ্যমে এই খেলার আয়োজন করে। এই খেলা খেলার সময় পাড়ার সব মানুষ খেলা দেখার জন্য জমায়েত হয়। এই খেলাটি খুমীদের কাছে খুবই আকর্ষণীয় ও জনপ্রিয়। এ খেলায় প্রতিটি দলে ২ থেকে ১০ জন খেলোয়াড় নিয়ে এই খেলার প্রতিযোগিতা চলে। এ খেলাকে চাকমা ও তঞ্চঙ্গ্যারা 'ঘিলা খেলা' বলে। এ খেলার জন্য খোলা এবং লম্বালম্বি মাঠ দরকার। 'আক্লিং আকোনাই' খেলার ১৬টি স্তর বা ওভার আছে। ১. কিউ (হাত), ২. কানেউ (গলা), ৩. আকেং (কোমর), ৪. জাংকাদুই (কোমর নীচে), ৫. ফাই আপং (থাই), ৬. খেউখু (হাঁটু), ৭. উলেসে, ৮. পোকিং, ৯.. থেও ন পু,

১০. খোওঅ, ১১. পোকিং (পায়ের বুড়ো আঙ্গুল), ১২. মাইফোকাআইং (পায়ের পাতা), ১৩. থাইমপং, ১৪.ছ্রাক্রাবোয়া, ১৫. ছহেরে ও ১৬. মিউ কালারুং। যে দলটি আগে নির্ধারিত স্তরগুলি অতিক্রম করে চূড়ান্ত স্তর শেষ করতে পারবে সেই দলটি বিজয়ী দল হিসেবে বিবেচিত হবে।

চ. বম লোকক্রীড়া

লোকক্রীড়াকে বম ভাষায় বলা হয় 'পাং'। বম সমাজে যেসব লোকক্রীড়া প্রচলিত আছে নিম্নে তা বর্ণনা করা গেলো :

১. কয়কাহ্ : এ খেলা ছোটো-বড়ো, ছেলেমেয়ে উভয়েরই ঘিলা খেলা বলা যায়। মেয়েরা ঘিলা দিয়ে খেলে। ছেলেরা গাছ বাঁশ দিয়ে ছোটো আকারে চাকতি তৈরি করে তা দিয়ে খেলে। বম সমাজে কয়কাহ্ খেলা সবচেয়ে বেশি জমে।

২. ত্নেংবহ্ : এ খেলা অনেকটা হা-ডু-ডু খেলার মতো। মাটিতে ঘরের পার্টিশনের মতো বেশ কয়েকটি লাইন কাটা হয়। প্রতি লাইন বা ঘরে একজন খেলোয়াড় দাঁড়িয়ে থাকে। অপর পক্ষের খেলোয়াড়রা নানান কৌশলে সেই লাইন বা ঘর একে একে শেষ পর্যন্ত পার হতে পারলেই খেলায় বিজয়ী হয়। লাইন বা ঘর পার হওয়ার সময় প্রতিপক্ষ স্পর্শ করা মানেই আউট হয়ে যাওয়া।

৩. থানর : এ খেলার জন্য একটি বাঁশদণ্ডের প্রয়োজন। দু'জনের মধ্যে অথবা গ্রুপের মধ্যে এই প্রতিযোগিতা হয়। বাঁশটিকে বগলতলায় চেপে দু'হাত দিয়ে শক্ত করে ধরে প্রতিদ্বন্দ্বীকে ঠেলতে হয়। প্রতিদ্বন্দ্বীকে ঠেলে মাটিতে চিহ্নিত লাইন অতিক্রম করে অনেকখানি পেছনে পাঠাতে পারলে বিজয়ী হওয়া যায়।

৪. মাওপুম পাইহ্ : এক হাত বা ১৮-২০ ইঞ্চি লম্বা একটি বাঁশ লাগে এই খেলার জন্য। সেই বাঁশটির একপ্রান্ত ধরে মাটিতে বসে ধরা হাতে নীচ দিয়ে শরীরটাকে ঘুরিয়ে নিয়ে যে খেলা খেলতে হয় তাকে মাওপুম পাইহ্ খেলা বলে।

৫. পাইহ্ : এটি অনেকটি বলি খেলার মতো। দুই প্রতিযোগী একে অপরকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করে জোর করে চেপে ধরে মাটিতে পিঠ ও মাথা ছুঁয়ে ফেলে দিতে পারলে এই খেলার মিমাংসা হয়। এই খেলা খুবই আকর্ষণীয়।

৬. সাইফা লাক : এটি বাংলা হাতির বাচ্চা উঠানো। একজন মাটিতে উপুড় হয়ে শুয়ে হাত দুটি দিয়ে পা দুটির গোড়ালিতে শক্ত করে ধরে শুয়ে থাকে আর তার প্রতিযোগী চিৎ হয়ে শুয়ে হাত দুটি দিয়ে হাতির বাচ্চার মতো শোয়া লোকটিকে দু'হাতে ধরে উঠিয়ে কোলের কাছে নিয়ে আসতে পারলেই সেই বিজয়ী হবে। এ খেলাতে অনেক শক্তি প্রয়োজন।

লোকপেশাজীবী গ্রুপ

বান্দরবান পার্বত্য জেলায় বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর উৎপাদনের মৌলিক ভিত্তিই হলো সমতল জমি ও পাহাড়ি জমি। তাদের বেঁচে থাকার অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ৫টি প্রধান ক্ষেত্র হচ্ছে ধান উৎপাদন, পশুপাখি পালন, ফলজ বৃক্ষের চাষাবাদ, কাঠ সংগ্রহ ও বেচা-কেনা, বাঁশ আহরণ ও বাঁশ শিল্পের কাজ ইত্যাদি। প্রায় শত বছর আগে এ অঞ্চলের সকল নৃ-গোষ্ঠী জুমিয়া বা জুমচাষি ছিলেন। হান্টারের (১৮৭৬) মতে, পার্বত্য অঞ্চলে কয়েকজন রাজা, হেডম্যান ব্যতীত এ অঞ্চলের অধিকাংশই গরিব এবং সকলেই জুম চাষী। এরা পাহাড়ে জঙ্গল কেটে ধান, তুলা, তিল, ভুট্টা, আদা, হলুদ উৎপাদন করতো। চাষাবাদের ফসল ও পদ্ধতিগত কিছু পরিবর্তন এসেছে কিন্তু জঙ্গল কর্তন, পোড়ানো, এবং কুপিয়ে চাষাবাদের ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকার ফলে ভূমি অনুৎপাদনশীল হয়ে পড়েছে। পরিবার বিভাজনের ফলে জমির পরিমাণও মাথাপিছু কমে আসছে। জুমের ধানের ফলন হেক্টর প্রতি ৩ টন থেকে ১-১.৫ টনে নেমে এসেছে। ফলে উন্নত চাষ ব্যবস্থাপনা ও উন্নত জাতের বীজ সমন্বিত জুমচাষ করেও জুমিয়ারা মানবেতর জীবনযাপন করছেন। জুমে স্থায়ী ফসল আম, কাঁঠাল, লিচু, কমলা ইত্যাদি ফলের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। চাষাবাদ অবিরত ও নিবিড় পদ্ধতিতে এগুচ্ছে। জুমচাষি ছাড়াও এ জেলায় জেলে, কামারসহ অন্যান্য পেশাজীবী রয়েছে।

১. জেলে

বান্দরবান পার্বত্য জেলার লোকপেশাজীবীর মধ্যে জেলে বা মৎসজীবীরা অন্যতম। তারা ৩০ বছরেরও অধিক সময় ধরে বান্দরবান পৌরসভার ৩নং ওয়ার্ডে কালাঘাটা নামক স্থানে জেলেপাড়া গড়ে তুলে বসবাস করে আসছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন জেলার মধ্যে বান্দরবানের এই কালাঘাটা জেলেপাড়াই সবচেয়ে বড়ো এবং একমাত্র জেলেপাড়া। এ পাড়ায় ২৫৪টি জেলে পরিবার রয়েছে। এ পাড়ার মোট লোকসংখ্যা প্রায় ২০০০ জন। কালাঘাটা জেলেপাড়া ছাড়াও জেলার বিভিন্ন নদীতে নৌকায় ও অন্যান্য স্থানেও জেলেরা অস্থায়ীভাবে সাময়িক সময়ের জন্য বসবাস করে থাকে। পার্বত্য অঞ্চলের জেলেদের মাছ ধরার জীবন সমতল অঞ্চলের সাথে সম্পূর্ণ পৃথক ও আলাদা। তারা পাহাড়ি স্রোতস্বিনী সাঙ্গু ও মাতামুহুরী নদীতে মৎস শিকার করে থাকে। যারফলে তাদেরকে প্রতিনিয়ত প্রতিকূল ও বিপৎসংকুল পরিবেশে মৎস শিকার করতে হয়। বর্ষাকালে নদীগুলো অত্যন্ত বিপজ্জনক আকার ধারণ করে। মাঝেমধ্যে অতি বর্ষণের ফলে হঠাৎ 'চকম বন্যা' (Flash Flood) দেখা দেয়। তখন আগে থেকে পূর্ব প্রস্তুতি না থাকলে জানমালের যথেষ্ট ক্ষতি সাধন হয়। যারা নতুন ও অনভিজ্ঞ তারা এই নদীতে মাছ ধরার সময় অসতর্কতার কারণে অনেকে প্রাণ হারায়। নদীটি গভীর বন হতে সৃষ্টি হওয়ায় নদীর উজানে মৎস শিকারে গেলে নানা ধরনের হিংস্র জীবজন্তু এবং স্থানীয় সন্ত্রাসীদের ভয়ের কারণ থাকে। প্রায় সময়ই জেলেদেরকে নৌকার উপর সারারাত জেগে থেকে মৎস শিকার করতে হয়। তারপরও দিনে পর দিন জীবীকার প্রয়োজনে জেলেরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বাধ্য হয়ে প্রতিকূল অবস্থায় মৎস শিকার করতে বাধ্য হয়।

২০-৩০ বছর আগেও সাঙ্গু ও মাতামুহুরী নদীতে সারারাত মৎস শিকার করলে দিনে ৫-৬ মণের মতো নানা ধরনের মাছ পাওয়া যেতো বলে জেলেরা জানান। এক সময়ে এই নদীগুলোতে প্রচুর চিংড়ি, বোয়াল, রুই, কালিগুনিয়া, রাখাল মাছ, বাইন মাছ, শোল মাছ, গুলদিয়া মাছসহ নানা ধরনের মাছ পাওয়া যেতো। বর্তমান সময়ে ২-৩ জন মিলে সারারাত মাছ ধরলেও মাত্র ২-৩ কেজির মতো মাছ পাওয়া যায় বলে জেলেরা জানান। এর কারণগুলো :

১. নদীর নাব্যতা হ্রাস : বর্তমানে জনসংখ্যার চাপে জঙ্গলের বনজসম্পদ অতিরিক্ত আহরণ, রাস্তা-ঘাট নির্মাণ ও পাহাড়ের গায়ে জুমচাষ করার ফলে ভূমির উপরিভাগ ধুয়ে নদীতে পড়ে নদীর তলদেশ ভরাট হয়ে নদীর নাব্যতা ও গভীরতা কমে গেছে। যারফলে নদীতে মাছের প্রজনন ও মৎস বসবাস উপযোগী পানির গভীরতা নেই।

২. তামাক চাষ : প্রতিবছর সাঙ্গু ও মাতামুহুরী নদীর চরের দুই পাড়ে প্রচুর পরিমাণ তামাক চাষ করা হয়। এই চাষ করার সময় তামাক ক্ষেতে প্রচুর পরিমাণ রাসায়নিক সার প্রয়োগ করা হয়। এই রাসায়নিক সার নদীর পানিতে মিশে নদীর মাছসহ নদীতে বাস করা নানা ধরনের জলজ প্রাণী মারা যায়। তাছাড়া তামাক পাতা তোলার পর তামাক গাছ ও মরা পাতাগুলো কেটে নদীতে ফেলে দেওয়ার ফলে মরা তামাক পাতা ও গাছগুলো পঁচে বিষক্রিয়া হয় এবং তাতে অনেক মাছ মারা যায়।

৩. ২০-৩০ বছর আগে এসব নদীতে মাছ অনায়াসে ধরা যেতো। বর্তমানে অনেক মৎসক্ষেত্র বা গভীর কুম বিভিন্ন স্থানীয় প্রভাবশালীদের দখলে আছে। তাদেরকে চাঁদা না দিয়ে অথবা তাদের কাছ থেকে লিজ না নিয়ে কেউ মাছ ধরতে পারে না।

৪. বর্তমানে বান্দরবান জেলার বাইরে থেকে অনেক লোক এসে বিষ প্রয়োগ করে মাছ ধরার ফলে নদীতে আরও মাছ অনেক কমে গেছে। এসব কারণে বর্তমানে বান্দরবান জেলায় বসবাসরত জেলেদের জীবন বিপন্ন হতে চলেছে। নদীতে মাছ না থাকায় এখন তাদের অনেকে এই ঐতিহ্যবাহী পেশা ছেড়ে কেউ রিক্সা, কেউ ভ্যানগাড়ি চালাচ্ছে। অনেককেই বিভিন্ন গার্মেন্টসে চাকুরি করতে দেখা যায়। আবার অনেকেই গ্রামে বা পাড়ায় গিয়ে 'বিলাম মাগা' (ভিক্ষা করা) করে জীবিকা নির্বাহ করে। 'বিলাম মাগা' হলো ৩-৪ জন মিলে দল গঠন করে ঢোল, বিউগল ও বাঁশি বাজিয়ে গ্রামে বা পাড়ায় গিয়ে ভিক্ষা গ্রহণ করে। বান্দরবান জেলায় বসবাসরত জেলেরা ৬০% জন ভূমিহীন এবং ৯৫% জন নিরক্ষর।

২. কামার

বান্দরবান পার্বত্য জেলায় কামারদের আলাদা কোনো গ্রাম বা পাড়া না থাকলেও জেলা-উপজেলার বিভিন্ন বাজারে কামার বা কর্মকারের দোকান রয়েছে। বান্দরবান জেলার কয়েকটি জায়গায় তাদের ছোটো-খাটো পাড়াও লক্ষ্য করা যায়। এ অঞ্চলের আদিবাসী ও বাঙালিরা তাদের নিত্যনৈমিত্তিক কাজে ব্যবহারের জন্য লাঙ্গল, কোদাল, দা, কাঁচি ইত্যাদি জিনিসের জন্য সম্পূর্ণভাবে কামারের উপর নির্ভরশীল। কামারেরা

বেশিরভাগ আদিবাসী জুম চাষীদের জন্য জুমকাটার দা, জুমে আগাছা পরিষ্কার করার জন্য নিড়ানী, কুড়াল তৈরি করে। আর সমতল চাষীদের জন্য কোদাল, ঘণ্টা, বাতলী হাসোয়া, জমির ফাল, লাঙ্গল ও বাড়িতে তরকারি কুটার জন্য বটি, দা, ইত্যাদি জিনিস তৈরি করে।

অনেক কামারেরা উল্লেখ করেছেন যে, তারা ৪০ বছর আগে থেকে বান্দরবানে এসে এ কাজ শুরু করে। ২০-৩০ বছর আগে এ পেশাটি লাভজনক হলেও বর্তমানে এ পেশায় তারা কোনো লাভের মুখ দেখছেন না। লাভের চেয়ে ক্ষতি বেশি হচ্ছে বলে তারা জানান। বর্তমানে লোহার দাম বেশি হওয়ায় অনেকে ভালোমানের লোহা কিনতে পারে না। ভালো লোহা আনতে হলে চট্টগ্রামে গিয়ে তা ক্রয় করে আনতে হয়। দরিদ্রতার কারণে অনেকে চট্টগ্রাম থেকে লোহা কিনে আনতে পারে না। বর্তমানে গড়ে মাসে ৫-৬ হাজার টাকা আয় হয়। কাজের জন্য ৩-৪ জন শ্রমিক রাখতে হয়। তাদেরকেও বর্তমানে বাজারের দর বিবেচনা করে পারিশ্রমিক দিতে হয়। অপরদিকে বিভিন্ন কারণে আদিবাসীদের জুমচাষ কমে যাওয়ায় জুমচাষিদের ব্যবহৃত জিনিসপত্র বিক্রয় তুলনামূলকভাবে পূর্ব থেকে অনেক কম হওয়ায় কামারদের অনেক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়। কর্মচারীদের পারিশ্রমিক দিতে মালিকদের হিমসিম খেতে হয়। শুধু ঐতিহ্যকে ধরে রাখার জন্য এখনো অনেক কামারকে এ পেশায় লেগে থাকতে হয়েছে।

জিনিসপত্রে সাজানো কামারের দোকান

কামারদের তথ্য নিচ্ছেন প্রধান সমন্বয়কারী চৌধুরী বাবুল বড়ুয়া

কামারদের তথ্য সংগ্রহ করছেন সংগ্রাহক সিংইয়ং ম্রো

লোকচিকিৎসা ও তন্ত্রমন্ত্র

ক. লোকচিকিৎসা

লোকসংস্কৃতির অন্যতম উপাদান লোকচিকিৎসা বিজ্ঞান প্রযুক্তির এত উন্নতি সত্ত্বেও লোকসমাজে এখনও প্রচলিত আছে। লোকচিকিৎসার তন্ত্রমন্ত্র হলো গুরুপরম্পরা বিদ্যা। তন্ত্রমন্ত্রের মন্ত্রগুলো সাধারণ লোকের কাছে অপ্রকাশিত থাকে। গুরু শুধু শিষ্যদের এই মন্ত্রগুলো শেখায়। ঝাড়ফুঁক, মারণ, উচাটান, বশীকরণ, জ্বিন-পরীর আসর (আছর), জ্বিন হাজির, গাছাবসান, হাটবসান, বিভিন্ন চালান (লাঠি, বদনা, পাটি, চাউল, ঝাঁটা চালান ইত্যাদি), সাপেকাটা, কবচ, মাদুলি ও তাবিজ ইত্যাদির অনুষঙ্গ হিসেবে বা লোকচিকিৎসা হিসেবে তন্ত্রমন্ত্রের ব্যবহার লোকসমাজে দৃষ্ট হয়।

পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের আদিবাসীদের লোকচিকিৎসা বিষয়ক ধ্যান-ধারণার মূলে ছিল মূলত সর্বপ্রাণবাদ। আদিবাসীরা অত্যন্ত অসহায় ধর্মভীরু। আদিবাসীদের চারদিকে রয়েছে প্রতিকূল প্রাকৃতিক পরিবেশ। আদিবাসীদের এ সর্বপ্রাণবাদই মানুষের আদিম ধর্ম এবং সর্বপ্রাণবাদই আদিম চিকিৎসা ব্যবস্থার মূলভিত্তি। সর্বপ্রাণবাদ অনুসারে পৃথিবীর সর্বত্রই অদৃশ্য ভূতপ্রেত, অশুভ শক্তি ইত্যাদি বিদ্যমান রয়েছে বলে আদিবাসীদের বিশ্বাস। আদিম যুগের মানুষও এভাবে প্রতিটি প্রাকৃতিক শক্তি বা বস্তুকে অতিপ্রাকৃতিক বলে মনে করতো। একারণে এসব শক্তিকে পূজা করার প্রচলন ঘটে। যা বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের সমাজেও বিদ্যমান রয়েছে। আদিতে আদিবাসীদের কাছে প্রাথমিক পর্যায়ে মানুষের মাঝে বিভিন্ন রোগ উৎপত্তির কারণ সম্পর্কে ধারণা ছিল তিনটি। প্রথমত, ধারণা করে কোনো ভূতপ্রেত বা অশুভ শক্তি মানুষের শরীরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে বিভিন্ন অসুখ-বিসুখের সৃষ্টি করে। দ্বিতীয়ত, আদিবাসীরা ধারণা করে অতিপ্রাকৃতিক ক্ষমতাসম্পন্ন মানুষের জাদু প্রক্রিয়া বা তন্ত্রমন্ত্রের ফলে মানুষের মাঝে বিভিন্ন রোগের সৃষ্টি হয়। তৃতীয় ধারণাটি হচ্ছে, মানুষের প্রতি মৃত মানুষ, মৃত প্রাণী, বৃক্ষ ইত্যাদির আত্মার রোষের ফলে মানুষের মাঝে বিভিন্ন রোগের সৃষ্টি হয়।

রোগ সম্পর্কে আদিবাসীদের ধ্যানধারণাকে আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিকশিত রূপের সঙ্গে তুলনা করে রোগের কারণ সম্পর্কে তাদের ধারণা অর্জনকে আদিম প্যাথলজি হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়। আদিবাসীরা মনে করতো যে, রোগীর শরীরে কোনো ভূতপ্রেত প্রবেশ করতো অথবা ভূতপ্রেতের প্রভাবে রোগ হতো। আধুনিককালে সংক্রামক রোগের ধারণার সঙ্গে এ ধারণার মিল রয়েছে। জীবাণুঘটিত রোগগুলো সবসময় জীবাণুর কারণে হয় না, অনেক সময় জীবাণু কর্তৃক সৃষ্ট কিছু বিষাক্ত পদার্থ নানা রোগের সৃষ্টি করে। এ দুটি কারণকে এখন ব্যাক্টেরিওলজি এবং টক্সিকোলজির বিষয় বলে মনে করা হয়। রোগ সৃষ্টির আরেকটি কারণ হিসেবে আদিবাসীরা যা চিহ্নিত

করেছিলো, তা হলো জাদু। আদিবাসীদের বিশ্বাস, যেসব বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন মানুষ তারা জাদুকর বা বৈদ্য। তারা বিভিন্ন জাদুমন্ত্রের মাধ্যমে অন্য মানুষের শরীরে রোগ সৃষ্টি করতে পারে বলে আদিবাসীদের ধারণা। আবার তারা রোগ নিরাময়ও অনায়াসে করতে পারে। জাদুকর বা বৈদ্যরা মানুষের ব্যবহার করা জিনিস নিয়ে ঐ জিনিস দ্বারা বিভিন্ন তন্ত্রমন্ত্র করে তাদের উদ্দেশ্য সাধন করতে পারে। মানব সমাজ বিকাশের ধারাবাহিকতা এক পর্যায়ে এই লোকচিকিৎসা পদ্ধতি ধর্মীয় তন্ত্রমন্ত্রের সাথে মিশে যায়। আবার অন্যদিকে জাদু বিশ্বাসের সঙ্গেও এই লোকচিকিৎসা জড়িত। প্রকৃতপক্ষে জাদুই বিজ্ঞানের পূর্বসূরি। আদিবাসী সমাজের লোকচিকিৎসা ব্যবস্থা এখনও ধর্ম ও জাদুর মাঝামাঝি অবস্থানে রয়েছে। অর্থাৎ ধর্ম ও জাদু উভয়ের প্রভাব চিকিৎসা ব্যবস্থার ওপর বিদ্যমান আছে।

ভূতপ্রেত তাড়ানো

কোনো মানুষের অসুখ-বিসুখ কিংবা কোনো ধরনের রোগ হলে ঐ রোগীর শরীরের অভ্যন্তরে ভূতপ্রেত প্রবেশের ফলে হয়েছে বলে আদিবাসীরা ধারণা করে। ঐ রোগীর শরীর থেকে এসব ভূতপ্রেত তাড়িয়ে রোগীকে রোগমুক্ত করার জন্য বৈদ্য বা ওঝারা ভীতিকর পোশাক পরিধান করে নানা ধরনের নৃত্য করে থাকে। রোগীর শরীর থেকে ভূতপ্রেত তাড়ানোর জন্য ওঝারা নিজ শরীরে হিংস্র জন্তুর চামড়া পরিধান করে। তারপর ওঝারা বাঘের চামড়া পরিধান করলে বাঘের রূপ আর ভাল্লুকের চামড়া পরিধান করলে ভাল্লুকের রূপে রোগীকে হিংস্রভাব প্রদর্শন করে। সে সময় ওঝারা হাতে একটি বিশাল লাঠি বা দা নিয়ে রোগীর সামনে রোগীর শরীর থেকে ভূতপ্রেত তাড়ানোর জন্য ভয়ংকর রূপ ধারণ করে লাফলাফি করে নৃত্য পরিবেশন করে। কখনো কখনো একটি ফাঁকা নল রোগীর শরীরের বিভিন্ন স্থানে লাগিয়ে রোগ সৃষ্টিকারী ভূতপ্রেতকে চুষে বের করে ফেলার ভাব করে। গ্রামে যদি অজ্ঞাত রোগে কোনো লোক মারা যায় তাহলে বৈদ্য অথবা ওঝারা চাল ও নুড়ি পাথরের টুকরা মিশিয়ে মন্ত্র পড়ে তা গ্রামের সর্বস্থানে ছিটিয়ে দেয়। আবার অনেক আদিবাসী আছে যারা মাটির পাত্রে ভূতপ্রেত তাড়ানোর জন্য নানা ধরনের চিত্র অঙ্কন করে গ্রামের চারিদিকে পুঁতে রেখে দেয়। যাতে প্রেতাত্মারা গ্রামে প্রবেশ করতে না পারে। অনেক সময় রোগী অত্যন্ত মুমূর্ষু হয়ে গেলে নানা ধরনের বনজ ওষুধ প্রয়োগ করেও ভূতপ্রেত তাড়ানো হয়।

গাছগাছড়ার ব্যবহার

রোগ নিরাময়ের উপায় হিসেবে আদিবাসীরা বিভিন্ন গাছগাছড়া ব্যবহার করে থাকেন। আদিকাল থেকে ওষুধ হিসেবে বহু ধরনের গাছগাছড়ার ব্যবহার সম্পর্কে তাদের ভালো জ্ঞান ও ধারণা হয়েছিলো। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এসব পরীক্ষা-নীরিক্ষা করার জন্য কোনো বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ব্যবস্থা ছিলো না। আদিবাসীরা রোগ নিরাময়ের জন্য ঔষধি গাছগাছড়ার ওষুধের তালিকা সৃষ্টি করেছে। তারমধ্যে চাকমাদের 'তাল্লিক শাস্ত্র' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আদিবাসী চিকিৎসক বা বৈদ্যরা নানা রোগ উপসমকারী ওষুধের গাছগাছড়ার বাগান করে তা সংরক্ষণ করে থাকেন। এগুলো থেকে

আধুনিককালে বিভিন্ন ওষুধ কোম্পানির নানা ধরনের ওষুধ তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে। অনেক গাছ আছে পেটের পীড়া রোগে প্রয়োগ করলে উপসম হয়। অনেক আদিবাসী সমাজে দেখা যায় উলটকম্বল বৃক্ষের শিকড় পিষে কালো ছাগলের দুধে মিশিয়ে শিশুদের বেরি বেরি রোগ নিরাময়ের জন্য শিশুকে খাওয়ায়। বনৌষধি স্বর্পগন্ধা প্রত্যেক আদিবাসীকে ব্যবহার করতে দেখা যায়। অনেকে পেটের যন্ত্রণা সারানোর জন্য আবার অনেকে ফোঁড়া হলে স্বর্পগন্ধা শিকড় পিষে ফোঁড়ার চারপাশে লাগিয়ে দেয়। তাতে ফোঁড়া তাড়াতাড়ি পেঁকে পুঁজ বেরিয়ে যায় এবং ফোঁড়া শুকিয়ে রোগী তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়।

শৈল্য চিকিৎসা

শৈল্যবিদ্যা বা সার্জারি আদিবাসীদের চিকিৎসা ব্যবস্থা থেকে উদ্ভব হয়েছিলো বলে বলা যায়। আদিতে আদিবাসীরা শৈল্য চিকিৎসার জন্য ধারালো বাঁশের কঞ্চি ব্যবহার করতো। আর জীবজন্তুর অস্থি দ্বারা সুচ বানিয়ে তা ব্যবহার করতো। কোনোস্থানে ফোঁড়া উঠলে বা কাঁটা বিধলে ধারালো বাঁশের কঞ্চি বা ধারালো ছুরি দিয়ে কেটে তা বের করা হতো। বর্তমানে আদিবাসী সমাজে এই চিকিৎসা পদ্ধতির আরও অনেক উন্নতি হয়েছে। ধাতুপাতের তৈরি অনেক ধরনের অস্ত্রপচারের যন্ত্রপাতি তারা নিজস্ব কারিগরি দক্ষতায় তৈরি করে রাখে। অস্ত্রপচারের পর ক্ষতস্থানে হলুদের গরম জলের ছেক দেওয়া হয়। আর বিষাক্ত সাপের কামড় বা জীবজন্তু কামড়ালে ক্ষতস্থানে পশুর শিং দিয়ে চুষে বিষ বের করে দেওয়া হয়। অনেক কবিরাজ, বৈদ্য কোমর ব্যথা, গিরায় গিরায় ব্যথা হলে সুচ ফুটিয়ে তা নিরাময় করে। সেই চিকিৎসার সাথে বর্তমানে চীনের 'আকুপাংচার' চিকিৎসার মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

গ্রাম বন্ধ রাখা

পাহাড়ি কোনো গ্রামে বা পাড়ায় কোথাও কলেরা মহামারী দেখা দিলে সেই পাড়া বা গ্রামের সমস্ত প্রবেশদ্বার বিশেষ ধরনের বাঁশের তোরণ নির্মাণ করে বন্ধ রাখা হয়। অনুমতি ব্যতিরেকে গ্রামে কাউকে প্রবেশ করতে দেওয়া হয় না। এমনকি আত্মীয়স্বজন হলেও না। আদিবাসীরা বিশ্বাস করে যে, রোগ বহনকারী দুষ্টু ভূতপ্রেতরা মানুষের শরীরে অবস্থান করে মানুষের সাথে বিভিন্ন স্থানে গমনাগমন করে। এ বিশ্বাস থেকেই গ্রামে কাউকে ঢুকানো হয় না। এসময় দিবারাত্রি গ্রামে পাহারাদার নিয়োজিত থাকে। কোনো জরুরি কাজে কেউ যদি আসে তাহলে গ্রামের পার্শ্ববর্তী স্থানে বিশ্রামাগারে এক রাত্রি থাকতে হয়। গ্রামবাসীরাই তার আপ্যায়নের ব্যবস্থা করবে। তখন গ্রামের কাউকেও অন্যগ্রামে যেতে দেওয়া হয় না। শুধু কর্মক্ষেত্রে যেতে পারবে আর সন্ধ্যার আগেই অবশ্যই গ্রামে ফিরে আসতে হবে।

খ. তন্ত্রমন্ত্র

আদিবাসীদের সর্বপ্রাণবাদের বিশ্বাস থেকে তন্ত্রমন্ত্রের উদ্ভব ঘটেছে। সর্বপ্রাণবাদ অনুসারে ভূ-মণ্ডলের সব জায়গায় ভূতপ্রেত, জ্বিনপরীসহ বিভিন্ন শুভ ও অশুভ শক্তি বিদ্যমান আছে। রোগ সৃষ্টির মূলে ভূতপ্রেতের কারণ রয়েছে বলে আদিবাসীরা মনে

করে। এমনকি অস্বাভাবিক মৃত্যুকেও ভূতপ্রেতের কারণে হয়েছে বলে তারা মনে করে। রোগীর শরীর থেকে এসব ভূতপ্রেত তাড়ানোর জন্য তন্ত্রমন্ত্রের ব্যবহার করা হয়। ভূতপ্রেতের দুষ্ট প্রভাব থেকে মুক্ত রাখার জন্যও মন্ত্র ব্যবহৃত হয়। এ তন্ত্রমন্ত্রও একপ্রকার জাদুবিশ্বাস বলে মনে করা হয়। কোনো ব্যক্তি দুরারোগে আক্রান্ত হলে মন্ত্র পড়ে ঝাড়ফোঁক দেওয়া হয়। আবার তাল পাতায় অথবা তামার পাতে মন্ত্র লিখে অথবা ভূতপ্রেত তাড়ানোর জন্য নানা ধরনের চিত্র অঙ্কন করে তাবিজকবচ বানিয়ে রোগীর শরীরে ব্যবহার করা হয়। তাছাড়া মরা মানুষের অস্থিমজ্জা, অমাবস্যা রাতে প্রসব করার সময় মরা বাচ্চার হাড়, ফাঁস খেয়ে মরা মানুষের গলায় ব্যবহৃত ফাঁসের দড়ি, বিভিন্ন জীবজন্তুর হাড় ইত্যাদি দিয়ে তালপাতায় বেঁধে তাবিজকবচ বানিয়ে রোগীর গলায় নতুবা বাহুতে বেঁধে ব্যবহার করতে দেওয়া হয়। তাতে দুষ্ট প্রেতাত্মা রোগীর শরীর থেকে বেরিয়ে যায়। তাতে সেই রোগী আরোগ্য লাভ করে।

চাক সমাজে তন্ত্রমন্ত্র

ধর্মীয় অনুরাগ, মনের প্রশান্তি, বিদেহী আত্মার মাগফেরাত, স্বীয় অপরাধবোধ, বিপদ-আপদ থেকে মুক্তি ইত্যাদির জন্য প্রত্যেক ধর্মেই দোয়া-প্রার্থনা করে মহান সৃষ্টিকর্তার কাছে পাপ ও ভুল-ত্রুটির জন্য ক্ষমা পাওয়ার মন্ত্র সাধনা করা হয়। মুসলমানরা যেমন তসবিহ্‌র কড়ি গুণে শত লক্ষ বার আল্লার নাম কিংবা দোয়াদুরুদ পড়ে থাকেন। তদ্রূপ চাক সম্প্রদায়ের লোকেরাও তসবিহ্‌র কড়ি গুণে গুণে দোয়া প্রার্থনা করে থাকেন। মারমা সম্প্রদায়ের মাঝেও তসবিহ্ পড়ার রীতি প্রচলিত আছে। ধর্মীয় বিভিন্ন কার্যাদিতে ক্যংএ অবস্থানরত উপাসক-উপাসিকাদের উদ্দেশ্যে গ্রাম বা পাড়ার লোকজন তাদের সাধ্য অনুসারে ফলফলাদি 'ছোয়াইং' দান করেন। এগুলো আহার করার পর তাঁরা নিম্নোক্ত গাঁথা বা দোয়া বা মন্ত্র পাঠ করে থাকেন :

'আনিংচা, দৌখা, আনাত্তা মিকতা, করুনা, উবিকখা'

এ ভাষার মর্মার্থ চাক নৃ-গোষ্ঠীর অনেকেরই জানা নেই। তবু ধর্মীয় অনুরাগ, শান্তির দিকে অনুরক্ত হবার জন্য এই শ্লোক বা মন্ত্র পাঠ করে থাকেন। বিশেষ ধর্মীয় অনুষ্ঠানে গ্রাম বা পাড়ার লোকজন ও যুবক-যুবতীরা উপাসনালয়ে অবস্থানরত উপাসক-উপাসিকাদেরকে বিভিন্ন ধরনের আহার্য প্রদান করে। উপাসক-উপাসিকারা তা আহারের পর নিম্নোক্ত গাঁথা জপ করে তাদের জন্য দোয়া করেন :

'জাদুদিছা, পাইচিয়া লেবা, দিয়াগা, আনিংচা, দৌখা, আনাত্তা'

বৌদ্ধ ধর্মমতে জীবহত্যা মহাপাপ। মহান সাধকের এ নির্দেশনাকে মেনে চলা অনেক সময় সম্ভব হয় না এ ধর্ম পূজারীদের। অনেক সময় সন্তান, বাবা-মাকে কিংবা সামাজিক অনুষ্ঠানাদিতে প্রাণী হত্যা করে খাওয়াতে হয়। জীবনযাপনের তাগিদে মিথ্যা আচরণ করতে হয়। এহেন পাপ হতে মুক্তির লক্ষ্যে সকাল, বিকেল ও রাতে ৩ বার নিম্নোক্ত গাঁথা পাঠপূর্বক চাকরা ক্ষমা প্রার্থনা করে থাকেন :

"পাথাঐয় তাছিং দাইন, ছ্যাপি ছাইতাফ ছামখারা,আম্রেরে মেসি দাঁগা আনিংচা, দৌখা, আনেকটা--।

তন্ত্রমন্ত্র বিশ্বাস ও সফলতার কাহিনি পাক-ভারত উপমহাদেশে প্রচলিত ছিল এখনও আছে। এ মন্ত্রতন্ত্র ব্যাপারটা অনেকে বিশ্বাস করেন আবার অনেকে করেন না। তবে বিপদে পড়লে প্রায় লোকজনই তন্ত্রমন্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করেন সাধারণত ভান্তে অথবা বৈদ্যেরা তন্ত্রমন্ত্র করে থাকেন কোনো জিনিস চুরি হলে তা উদ্ধারের জন্য ভান্তেরা যে পদ্ধতি অবলম্বন করেন তার বর্ণনা করা গেলো :

প্রয়োজন মোতাবেক বাজার থেকে মাঝারি সাইজের ৭টি মোমবাতি ও সোনালি রঙের রেপিং পেপার কিনতে হয়। রেপিং পেপার দিয়ে মোমবাতি শক্ত করে মোড়ানো হয় যাতে সহজে খুলে না যায়। ভিন্ন ঘরে দরজা বন্ধ করে গভীর মনোযোগ সহকারে প্রত্যেকটি মোমবাতির গায়ে মন্ত্রবাক্য লিখে রাখা হয়। গভীর রাতে চুরি হয়ে যাওয়া স্থানের কাছাকাছি ৭টি মোমবাতি বসাতে হবে তখন লক্ষ্য রাখতে হবে যেন কেউ টের না পায়। দিয়াশলাই-এর কাঠি দিয়ে মোমবাতির অগ্রভাগের সলিতায় আগুন দিয়ে জ্বালাতে হয়। আর একই সাথে একটা মন্ত্র পাঠ করতে হয়। মোমবাতি প্রজ্জ্বলন অবস্থায় যে মন্ত্রটি পাঠ করতে হয় তা নিম্নরূপ :

"ওকাসা ওকাসা ওকাসা,
ক্যাইয়া কায় ওয়েজিক মন্নোক্যায়
একায় সোম্বা দেক্ফ্রা পাথামা দোতিয়া
তাতিয়া তাগ্রিন নাইগ্রিন সেংগ্রিং
স্রাও, ফ্রা রাদনা তারা রাদনা সংখ্যা রাদনা,
এরনা দো থোয়া,
স্রাই সোম্বা দোয়া,
লাওসিরো-ই সিখপুজ,
ফেস্রোও মাইলিও,
কায়েং দো বায়ে,
কায়েং দো রাসো,
আক্যও অফ্রাও,
আপেলেবা কাই সোম্বা,
রাই পে সাই পা,
রাইসোমেও আঁং বা,
দায়েং সে-বা,
নামেও ক্রোছে হ্র পাদমা,
কাওলোই সাংক্রে জে ছা ফ্রাই রোয়ে,
আসুং জাই হুও।
বোয়ানে মা-ত্রা ,
ফো-ত্রা,
নি বাই সাই সা,
ত্রা মারাই কো,
রা বারা লো এ,
সাম ফ্রা--------------"।

[মন্ত্রের বাংলা মর্মার্থ উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি]

ধাঁধা

বান্দরবান পার্বত্য জেলায় ১১টি ক্ষুদ্র জাতিসত্তা ও বাঙালি জনগোষ্ঠী বসবাস করে। নিজস্ব জীবনধারা, সাংস্কৃতিক, আধ্যাত্মিক ও বহির্জাগতিক বাস্তবতাবোধে ওদের জীবনযাপন। ধাঁধা যে কোনো জাতির সাহিত্য সংস্কৃতির একটি অপরিহার্য অনুষঙ্গ। ধাঁধা লোকসংস্কৃতির একটি আকর্ষণীয় কৌতূহল উদ্দীপক উপাদান. লোকসমাজে বুদ্ধিদীপ্তভাবে নানা উপমা-প্রতীক-রূপকের সাহায্যে হেঁয়ালিপূর্ণ ছন্দবদ্ধ বাক্যে প্রশ্ন করে উত্তর প্রত্যাশার যেই সরস উক্তি তা ধাঁধা নামে পরিচিত। ধাঁধার মৌলিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ড. মুহম্মদ এনামুল হক তাঁর 'লোকসাহিত্য' প্রবন্ধে উল্লেখ করেন— 'ছড়া যদি প্রাচীন সমাজের অপরিণত মনের সৃষ্টি হয়, তবে ধাঁধা সেই সমাজেরই পরিণত মনের সৃষ্টি। বুদ্ধিদীপ্তি, সৌন্দর্যবোধ, রসিকতা, চিন্তার উৎকর্ষ সাধন, মননশীলতার পরিচয় দান, প্রতীক ব্যবহারের প্রবণতা প্রভৃতিই ধাঁধা বা হেঁয়ালির মৌলিক বৈশিষ্ট্য ধাঁধায় লোকসমাজের আচার-আচরণ, বুদ্ধি-মেধা, অভিজ্ঞতা, চিন্তা-চেতনা, সামাজিক-সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক জীবনপ্রণালি, ইতিহাস-ঐতিহ্য-কৃষ্টি প্রতিফলিত হয়। নিম্নে বান্দরবানের ভিন্ন স্বাদের প্রচলিত কিছু ধাঁধা তুলে ধরা হলো :

১. চাক ধাঁধা (আপাঁইন চেহ্নেক)

১. আফাং ফুংয়া আছি, আছি ফুয়া আফাং - (নাইদারাছি)
বাংলা : গাছের উপর ফল, ফলের উপর গাছ - (আনারস)

২. আঁ পেক্বহুকছাগে তালুংছানে তালংছা - (আছাবা)
বাংলা : আমার ছোটো বাক্স পাথরে ভরা - (দাঁত)

৩. আঁ কিং ছানিংহুংঙা কাইন্কানুকছানে - (ছাকাইনছি)
বাংলা : আমার ঘরের চালে চালের খুদে ভরা - (আকাশে তারা)

৪. কিংদাই কিংদাই নেপকনে নেপক - (কারকপাই)
বাংলা : ঘরে ঘরে বন্দুক আর বন্দুক - (লাকড়ি)

৫. তাগোছা হুয়াগে নামুহ্রিগো আকানাপো- (আহুবাইমিং)
বাংলা : পাহাড়ের আগাছা পরিষ্কার করে রাখা সম্ভব নয় - (চুল)

৬. আপ্রাণঙা ক্যাগো, আটংহুংঙা কাটকালক - (গয়েংছি)
বাংলা : উপরে ফিটফাট ভিতরে সদরঘাট - (পেয়ারা)

৭. আ কিংয়াগে উকু তারা টাইন্ পিহে - (কিংআন্দারিক)
বাংলা : বাড়ির পাশে একটা হাতি বাঁধা আছে - (বাড়ির ছায়া)

৮. য়ু-লাং চাইন-লাং - (আকানা)

বাংলা : যত দেখি তত দূরে যায় - (কান)

৯. আনু হ্রাকলাং আছা প্রংলাং - (রাকাইক ইংগা)

বাংলা : মা যত কাঁদে, ছেলে ততই বড়ো হয় - (চরকা)

১০. তুংবুকছা পুকটাংগে, তাব্রেহ্রীগো আকানাপে প্রাইনগো আটুহে - (আহু জোহেকো)

বাংলা : একটি দ্বীপকে কোনোদিন পরিষ্কার করে রাখা যায় না - (মাথা ন্যাড়া করা বা চুলকাটা)

১১. আকনে ছিকাটা উইনে বাংগোক - (ত'ইনিং ক্রাইনহেকো)

বাংলা : ধরলে একমুঠো, মেললে অনেক - (জাল ফেলা)

১২. লাংহে কারাইক হুওয়া-হুক, প্রাইন ঙাগারাই ক্রংক্রি - (বাকছা কেহেকা)

বাংলা : যাবার সময় একা, ফেরার সময় অনেক - (শূকরের বাচ্চা প্রসব)

১৩. ইংগা আওয়াইক তোওয়াগে ই-তিক্কো আকিপো - (আক্যকাইন্-তাক)

বাংলা : আমার একটা কাপড় কোনোদিন পানিতে ভেজে না - (কচুপাতা)

১৪. ইক্ হয়ংছা হয়নাগো কাছুকমারা পুকটুংহে - (আছালিক)

বাংলা : পুকুরের মাঝখানে একটা ব্যাঙ ভেসে আছে - (জিহ্বা)

১৫. কাংবাছা কাইনাগে আছি নিংহু আনোতংহে - (আচুক)

বাংলা : পাহাড়ের ঢালুতে দুটি ফল ঝুলছে - (স্তন)

১৬. লাংঙা লাংঙা এডগ এডগ কাফেছে - (উকুফাং)

বাংলা : পর পর পাড়া দিয়ে (লাথি মেরে) যায় - (সিঁড়ি)

১৭. তুংবুকছা পুকটাগে হ-য়ানা তালোহে - (আহুছিহেকো)

বাংলা : পাহাড়ের উপর দিয়ে একটি নৌকা চলে গেছে - (চিরুনি দিয়ে চুল আঁচড়ানো)

১৮. কাংবা কাইনাগে, উসালাঞ্ঝা মারা কোটুং-হে - (চাউফু)

বাংলা : পাহাড়ের ধারে একটি লাল মোরগ ডাকে - (কলার মোচা)

২. ম্রো ধাঁধা (তা অ)

১. তুদ লক উই কম- (লক)

বাংলা : একটি গাছে শত ফল - (জাল)

২. উই লক তুদ কম - (সাম)

বাংলা : একটি ফলের শত চারা - (চুল)

৩. রখুং হন তক আনক হন লদ- (সিপু)

বাংলা : দক্ষিণে জ্বালালে উত্তরে ধোঁয়া বের হয় - (চুরুট)

৪. বুক লক মিক কম - (সাপসা)

বাংলা : একটি মাথায় অনেক চোখ - (আনারস)

৫. মাওয়া ক্লুংইয়ুং চা, পিক পুরমা -(লাটমা উই)
বাংলা : শরীরে আঁচিলে ভরা সুন্দরী - (কাঁঠাল)

৬. মু কোয়াং কই বিয়াতুম বিয়াপা নম হব লব - (লামা)
বাংলা : আকাশে রৌপ্য থালা ভেসে বেড়ায় -(চাঁদ-তারা)

৭. মুলাক কই কু পাউ ওয়াই - (লেম ফ মাই)
বাংলা : সুন্দরীর পেটে স্বর্ণপুষ্প ফুটে - (হারিকেনের আলো)

৮. আরামদা সাইদং উইদা ইয়ুকলো -(ইউপিয়া)
বাংলা : পাতা তলোয়ার, ফল বানরের মাথা - (চালতা ফল)

৯. আরামদা পইসা, উইদা কুলি - (চি উই)
বাংলা : পাতা পয়সা, ফল গুলি - (কুল)

১০. ফেং কুয়া লাকহন স্যিয়া ম চেদ দক - (থক্রিয়া মি)
বাংলা : গুহা থেকে ব্যাঙ লাফিয়ে পড়ে - (থুথু ফেলা)

১১. ক্লাং চ্ মিরতুই ইয়ুব লুব - (কোয়াক কোয়াই)
বাংলা : যুবকটি পুকুরে সর্বক্ষণ ডুব দেয় - (বর্শি ফেলানো)

১২. মং ওয়াই লাক দৈ-এ,
কিয়া তাই নাও তাতু কম- (মিক, নাকং)
বাংলা : যমজ ভাইরা ঝগড়া করে টিলার দুই প্রান্তে,
মারামারি হতো যদি টিলা না থাকতো - (নাক, চোখ)

১৩. ম্তাংচা পু প্রা - (পেরাম)
বাংলা : বুড়ির ভাঙা পাত্র - (কান)

১৪. খিন খালা খে ম্তাংচা ওয়েদটা প্রেওকাই সেং - (কেরেক)
বাংলা : আদিকালের একটি বুড়ি
ছিটিয়ে দিলো হাজার কড়ি - (আঁধার রাতে তারকা রাজি)

৩. খুমী ধাঁধা

১. মাই দরাই আয়ুই নাই (মাইফো)
বাংলা : সুড়ঙ্গ দিয়ে আগুন বের হয় (বন্দুক)

২. নেও হয় রেখেং হয় আক্লি – (আরা)
বাংলা : উত্তর-দক্ষিণে সংযোগ সুড়ঙ্গ - (মদ তৈরি চুলা)

৩. লেঁও সাং চোওয়াই রিয় লেঁও চো মত্মো ক্ নাই - (চোনি ছ নাই)
বাংলা : হাজার লোককে ঢেকে রাখে একজন লোক- (চালুন দিয়ে চাউল ঢেকে রাখা)

৪. আময়ো আমন লেওথুংরে খুতিং চানাই - (মাইথু)

বাংলা : তিন ভাইয়ে মুখোমুখি বসে - (চুলা)

৫. বিউক্লে কালাই হারে যাই খুমী লেও সাঁরে চা খা প খি লাই - (লুংতা)

বাংলা : এক মোচা ভাত হাজার জনে খেলেও ফুরায় না - (দা শান দেয়ার পাথর)

৬. খেঁরা প্লোরা –(নোত্রাইং)

বাংলা : যত দেখি ততই দূরে সরে যায় (নাক)

৭. ঙা ল কিউশারাং আথাই ল আমকামেং - (কি থে় আথায়)

বাংলা : পাতা হাত, ফল মিষ্টি কুমড়া (জঙ্গলি কুমড়া)

৮. উইলো কামনু আয় উইলো কামসেং ম্ প্লে ক্ল –(মাই)

বাংলা : কালো কুকুরকে লাল কুকুর চেটে খায় - (চুলার আগুন)

৯. মই আহিং ম্লোয়াই ম্লাই দিকা – (ল বিউ)

বাংলা : পর্বতের উপরে মরা হাতি পড়ে আছে - (জুমের টংঘর)

১০. তোওয়াং কামথু হেং ফি ফ – (তোওগ)

বাংলা : পাগলা ভাল্লুক হেলেদুলে যায় (জোঁক)

১১. সোপা ওয়াই দেংও খাইং নাই – (সি ক্লাইং)

বাংলা : ছড়ার মাঝখানে সাঁকো (ঘরের বীম)

১২. সাংখো সাং ওয় বি (সো তুং নাই)

বাংলা : মাথার চুল কেটে ফেলা (জুমের ধান কাটা)

১৩. কেসাই পানা ত্লা ওগ – (কে থে পাখো)

বাংলা : হাতির পেটে ছিদ্র (ঘরের দরজা)

১৪. আরেং চন কি ত্লং আ মুকু কুদুই আদিং নাই – (বাই ঙা আ তুই আদিং নাই)

বাংলা : রাজপুত্রের হাতে মুক্তার খণ্ড (কঁচুপাতার পানি)

১৫. তুলি থিং আ বাকাই কয় আম্‌য় হাই – (লো কিনি সোলো আ অমনাই)

বাংলা : পানিতে বাঁশের ভেলা ভাসে - (চাঁদ)

১৬. ল ক্লই মাআ চন পয় হাই তোকো য়ো – (মেক্কেং চন পেও নাই)

বাংলা : বাচ্চা কোলে নিয়ে জুমের মধ্যে অনেক লোক দাঁড়িয়ে আছে - (জুমের ভুট্টা গাছ)

১৭. ল লু মা তম্ল ব, ল ক্ল মা থাইলয় – (চো দেং নাই)

বাংলা : গ্রামের এক প্রান্তের আওয়াজ অন্য প্রান্তে শোনা যায় - (ঢেঁকির আওয়াজ)

১৮. নি চে আম য় ল ভুথুং মা তে খেখু অমনাই – (আ)

বাংলা : যে প্রাণীর পেছনে হাঁটু আছে - (মুরগি)

১৯. নিচে ল লাং পেঁ মাতে তোকো নাই – (চে ওয়ই)

বাংলা : যে মানুষের সাথে সাথে রাস্তার পাশ দিয়ে হাটে - (লাঠি)

২০. নিচে আম য় ল তে্লং তোকো বৈ, তং নাই আখিং ব আলাই – (তুই)

বাংলা : যে জিনিস একসাথে যায়, পৌছে গেলে কিছুই নাই - (পানি)

২১. নিচে আময় ল্ ফেলেং মাতে তোকো নাই – (তাআই)

বাংলা : যে প্রাণী বাঁকা শরীরে হাঁটে (কাঁকড়া)

২২. তিপি থিং য়া ফালা আবাংছে – (দিখং)

বাংলা : পাহাড়ের গুহায় বাঁদুড়রা ঝুলে থাকে (ঘরের ভেতর ঝুলিয়ে রাখা থুরুং)

২৩. তোকো রা অমরা –(লাং)

বাংলা : যত হাঁটে তত বাড়ে - (পথ/রাস্তা)

২৫. নিচে আময়ো আম ন লেং ফ্লিরে মো আথা সু – (ই পাং)

বাংলা : তারা চার ভাই মুখোমুখি থাকে (ঘরের বেড়া)

২৬. আদুং মা লৈ প আদুং কিনি থুং লৈ রেঁ ওই -(নাসিবু)

বাংলা : যে ফুল রাতে ফুটে, দিনে নিভে (কুপি বাতি)

২৭. জাই নাং তোকো মা বাই নাং তোকো মা - (খে)

বাংলা : ভাই ভাই একসাথে যায় - (পা)

পাংখোয়া ধাঁধা

১. উই সেন উই ভম ইন ইনলিয়াক ইন ইনবেল - (লুংথুচুং)

বাংলা : কালো কুকুর ও লাল কুকুর ছোয়ানো - (চুলার উপর পাতিল বসানো)

২ . লৌ লাই জং রোয়াল - (রামাই)

বাংলা : জুমে বান্দরের দল - (কুমড়া)

৩. লৌ লাই ভা আক্ রোয়াল - (থিং কুং মুই)

বাংলা : জুমের মধ্যে কাকের দল - (জুমে পোড়া গাছ)

৪. লৌ লাই সাংখা রাক - (সুরকুল)

বাংলা : জুমের মধ্যে বান্দরের শসা - (সজারু)

৫. থৰাং আনচুন্ আরপাই তিয়াক্কা ভাইনচুন ফেরপুই তিয়াক্কান - (মলক)

বাংলা : পাহাড়ে মুরগির সমান কিন্তু ঝরনাতে পাটি সমান - (জাল)

৬. লামপুই ভাউআন, তার নুতে পোয়ান জুন সারিক সিল - (রাতোয়াই)

বাংলা : রাস্তার পাশে সাতটা কাপড় পরে বসে থাকা বুড়ি - (বাঁশ কুড়ল)

৭. লৌ লাই মাখে - (কুমসু)

বাংলা : জুমের কাঠি - (আখ)

৮ . লৌ লাই পোয়ান সেন জার - (পার)

বাংলা : জুমের মধ্যে লাল কাপড় রৌদ্রে দেওয়া - (ফুল)

৯. মু লৌ বলি -(থিলি/হি)

বাংলা : অদৃশ্য বলবান - (বাতাস)

১০. আনু চাপ আতে লিয়ান - (মুই থির ইন মালা মুই)

বাংলা : মা কাঁদে আর বাচ্চা বড়ো হয় - (চড়কার মধ্যে সুতার রিল)

১১. আ লুই লিয়া আসা লিয়া - (তুই উম)
বাংলা : যত পুরান হবে ততই ভালো হয় - (পানির পাত্র/লাউয়ের খোলস)
১২. ফেই লি কাল খৌ লৌ - (খামপি)
বাংলা : চার পা কিন্তু হাঁটতে পারেনা - (পিঁড়ে/বসার চেয়ার)
১৩. রাল পুই মানাক - (ইন কোয়াই বের)
বাংলা : অজগরের পাঁজর - (ঘরের কে-চি)
১৪. রাল পুই মেলে - (তামথিলিয়াম)
বাংলা : অজগরের জিহ্বা - (কাপড় বুনার বেইন)
১৫. সুন সিপ জান রোয়াক - (মুজু খুর)
বাংলা : দিনে ভর্তি রাতে খালি - (ইঁদুরের গর্ত)
১৬. কির কাল, কির কাল - (থেন)
বাংলা : যায় আবার আসে - (দোলনা)
১৭. সুত লেট বোন - (নার)
বাংলা : উল্টো খুঁটি - (নাক)
১৮. সাই লুম্মু তিয়াক্কান কল কিল দেং - (মিত)
বাংলা : কান্টার গুলি সমান কিন্তু পূর্ব-পশ্চিমে খবর জানা যায় না - (চোখ)
১৯. কেংকই পালি, লাই লুত - (ভা কই)
বাংলা : বাঁকা কোমরওয়ালা কুয়ার ভিতর ডুব দিল - (বড়শি)
২০. আকুং তিন জৌ জাই লো; আমরা খাক্কা - (সামমর)
বাংলা : গাছ গোনা যায় না কিন্তু ফল একটি - (খোঁপা)
২১. তুক থিয়াক জম থিয়াক - (তুই)
বাংলা : কাটলেও কাটে না - (পানি)
২২. থান লৌ সিপ সুক লৌ ভৌ - (লুলুক)
বাংলা : না ভরে ভর্তি, না ধুয়ে সাদা - (নারিকেল)
২৩. মোয়া হই লৌ - (আরতুই)
বাংলা : ঘরের কোনো চিহ্ন নেই - (ডিম)
২৪. লৌ লাই সাই - (লৌ-চু)
বাংলা : জুমের মধ্যে হাতি - (জুমঘর)
২৫. রোল পুই মালোয়াক - (ভাইবুক)
বাংলা : অজগরের বমি - (চালের গুঁড়া)

৫. খিয়াং ধাঁধা

১. ওখো ওয়ং থুম উলুকি হ্মাত- ((খং খ্রম্লঙ্যোং বুঃ আ-ম)
বাংলা : তিন পা এক মাথা - (চুলার উপর ভাতের হাঁড়ি)

২. ইমিক ম্যেই উলুকি মেয়াঃ - (অ-য়)
বাংলা : চোখ আছে মাথা নেই - (কাঁকড়া)
৩. পয়চে পয়েই আমান মেই - (মেত)
বাংলা : দেখতে সুন্দর কিন্তু বদরাগী - (মরিচ)
৪. তুইহ্নেঃ য়ুলা - (প্রিম স্যেই)
বাংলা : গোসল করে কিন্তু ভিজেনা - (কচুপাতা)
৫. ইথিং হ্রম্লঙ্যেং এথেইঃ, এথেই হ্রম্লঙ্যেং ইথিং - (নানদারা থেইঃ)
বাংলা : গাছের উপর ফল, ফলের উপর গাছ - (আনারস)
৬. নিবিহনি হ্ন্যোমাক নাহ্যাঃনি নেন/নুং - (ওয়া)
বাংলা : ধরলে এক মুঠো ছাড়লে অনেক - (জাল)
৭. নসঃথ্যেন অমহ মেয়াঃ - (তুই)
বাংলা : কাটলে কাটে না বা ঘা হয় না -(পানি)
৮. হ্লুইঃ হ্লুইঃ তি লুইঃ লুইঃ স্যেপ স্যেপতি বোওক বোক - (উনসি থেইঃ)
বাংলা : না ভরে ভর্তি, না ধুয়ে সাদা - (নারিকেল)
৯. লোওয়া য়োং সং - (মইমি থেইঃ/মই থেইঃ)
বাংলা : জুমে বানরের দল - (চাল কুমড়া/মিষ্টি কুমড়া)
১০. এলেক-চ -হয়া ওয়াত ওয়াত, এলেন হিঃশুঃ - (য়ো)
বাংলা : শিশুকালে কাপড় পড়ে, বড় হলে কাপড় ছাড়ে - (বাঁশ)
১১. ওখো ওয়ংহ্রি চেতচে চেত্যেইহ্ন্যে ঙাঃ - (ওমপেন)
বাংলা : চার পা কিন্তু হাঁটতে পারে না - (বসার পিঁড়ে)
১২. এস্যেই লেপ নিহ ইথিং হ্লাত - (পালা)
বাংলা : গাছ একটি পাতা দুটি - (দাঁড়িপাল্লা)
১৩. উপুম চে লেক আসাম চে লেন - (হ্লিবোক)
বাংলা : শরীর/দেহ ছোটো আওয়াজ বড় - (বন্দুক)
১৪. চেতচে চেতেই ওখো মেয়ঃ - (ফোল)
বাংলা : পা নেই কিন্তু হাঁটতে পারে - (সাপ)

৬. চাকমা ধাঁধা

১. এই আঘে এই নেই, এই দেজত তে নেই-(ঝিমিলানি)
বাংলা : এই আছে এই নেই, এই দেশেও সে নেই - (বিজলি)
২. চিগোন বুজ্যা দারিহ্ ফোরফোজ্যা-(মোক্যা)
বাংলা : ছোটো বুড়া দাঁড়ি ফরফরা-(ভুট্টা)
৩. ঘর আঘে দুয়ার নেই, মানুচ্ আঘে র নেই-(চমকঘর)
বাংলা : ঘর আছে দুয়ার নেই, মানুষ আছে রব নেই-(দিয়াশলাই)
৪. কালা মোরঙত মালা ভাঝে-(চান)
বাংলা : কালো জলাবর্তে মালা ভাসে-(চাঁদ)

৫. অহরেলে তগায় ন আনে-(পথ)
বাংলা : হারালে খুঁজে পেলে আনে না-(পথ)

৭. ত্রিপুরা ধাঁধা (খুমাংম)

১. যাও যাকং মখ্রো ক্রই - (খাঁ)
বাংলা : হাত, পা ও মাথা নেই - (ঢোল)

২. ম্মা কানাংরু ম্সা তনাংরু - (চ-খা)
বাংলা : মা কাঁদলে সন্তান বড় হয় -(চরকা)

৩. জাং চা, জাং খি -(চখি)
বাংলা : একদিকে খায় আর অন্যদিকে পায়খানা করে -(চরকি)

৪. হা খো খহাঅ খারই ফুকাও -(বুয়াঃ)
বাংলা : একটি গর্তে অনেক কড়ি -(দাঁত)

৫. মুখুবাই চমি, মুখুবাই খিমি-(স্কিাংবু)
বাংলা : মুখ দিয়ে খায়, মুখ দিয়েই পায়খানা করে-(শামুক)

৬. হাফং সাওগাঅ পুখ্রি থাইনয়-(মক)
বাংলা : পাহাড়ের চূড়ায় দুটি পুকুর (দু'চোখ)

৭. তাঁয়ে পাঃয়া -(তৈ)
বাংলা : কাটলেও কাটে না -(পানি)

৮. তাঁয়ে থইয়া -(সাঁপ্রি)
বাংলা : কাটলেও মরে না -(ছায়া)

৯. অসঁ সাইহা হিংমি জাপায় পয়া -(মুশ্রঁ)
বাংলা : হাজার প্রাণী হাঁটলেও পায়ের ছাপ পড়েনা -(পিপীলিকা)

১০. সা ম্লাও, হো স্ৰাও - (নোওশি)
বাংলা : দিনে চাটে, রাতেও চাটে -(ফুলঝাড়ু)

১১. থংগ্লা কংহা বাই নোও তাংমি -(ছাথি)
বাংলা : এক খুঁটি দিয়ে ঘর নির্মাণ -(ছাতা)

১২. হাফং থাইহা শঁ খলা শ্র : -(মথ্রো খ্লাই)
বাংলা : একটি পাহাড় সম্পূর্ণ শনখোলা -(মাথার চুল)

১৩. সা অলে গ্নাং হো অলে কাংগা -(আইজা)
বাংলা : দিনে ধনী, রাতে গরিব -(আলনা/থাক)

১৪. জাও তৈসামি -(মাইচাম)
বাংলা : হাত তোলা - (ভাত খাওয়া)

১৫. সা অলে ক্থুই হো অলে ক্থাং - (বাতি)
বাংলা : দিনে মৃত রাতে জীবিত -(চেরাগ বাতি)

১৬. থাংফুঅ হো ক্রয়, ফাইফুঅ হো গ্রাং -(নোখাই)
বাংলা : খালি পেটে যায়, ভরা পেটে ফিরে- (ঝুড়ি)

১৭. জাংশ্রঃ জাংশ্রঃ -(থুড়ি)
বাংলা : এদিক-ওদিক ঠুশঠাশ -(তাঁতের মাকু)

১৮. মখো ক্রয়, জাকং ক্রয় বহোবাই জাও কংনয় -(খুতাই)
বাংলা : মাথা নেই পাও নেই, আছে পেট আর দুটি হাত -(জামা)

১৯. রাজানি রাইদাং বাঁথ ওয়ামি -(চুবু)
বাংলা : রাজার লাঠি কিন্তু ধরলে কামড়ায় -(সর্প)

২০. জাকং কংহোবাই জাপায় সাইহা -(কলং)
বাংলা : এক পায়ে হাঁটে, রেখে যায় হাজার পদচিহ্ন- (কলম)

৮. বম ধাঁধা

১. যেই সেনে যেই সেনে লিয়াহ নেই লৌ -(আর টি)
বাংলা : যার কোনো মাথার শেষ চিহ্ন নেই -(ডিম)

২. যেই সে নে (২) মুহ লৌ খাম- (চাল)
বাংলা : অদৃশ্য পাহাড় -(কপাল)

৩. সুক লৌ পুয়ান ভৌ, থান লৌ তি খাৎ –(ডাব)
বাংলা : কেউ না ধুইলেও ধবধবে সাদা, কেউ না তুললেও থাকে পানি -(ডাব)

৪. তুক তাই লৌ– (পানি)
বাংলা : শতবার কাটলেও দাগ পড়ে না বা কাটা যায় না- (পানি)

৫. আনু কান তেল্লই আফা কাল - (মাইথাল)
বাংলা : মাকে ধরে রাখলেও ছেলে চলে যায় (বন্দুক ও গুলি)

৬. তল্লাং ভং লৌ - (খেং)
বাংলা : যার কোনো শুরু নেই, যার কোনো শেষ নেই (থালার কিনার)

৯. মারমা ধাঁধা (মারাম পাঁইনত্রুক চা)

১. আথাক্ আপ ক্যঃ চরই
আথি মা ক্দু অহ্ইক (পেনেসিঃ/পিনিসিঃ)
বাংলা : উপর আবরণে নুড়ি পাথর
ভিতরে রসালো সুগন্ধি খোসা (কাঁঠাল)

২. আথাক্ অপ ক্দু অহ্ইক্
আথি মা ক্যঃ চরই (গয়ইসিঃ)
বাংলা : উপর আবরণে সুগন্ধি চামড়া
ভিতরে নুড়ি পাথর (পেয়ারা ফল)

৩. আ-সি ওয়া-ওয়া, আ-পাঙ্ নিঃ নিং
মাত্াক কং (চা বা বাঙ/ চা বা পাঙ)
বাংলা : সোনালি সোনালি ফল
গাছ সবুজ, গাছে ওঠা যায় না (ধান গাছ)

৪. তইং লী দৈং, তোও্য়ং মঃ টু
আথাক্ কা লী ত্ফ্যু-ফ্যু (পাখাক্)
বাংলা : গর্ত ছাড়া চারটি খুঁটি উপরে ফুরফুরে বাতাস (দোলনা)

৫. আঞোমা সাঃ মুইংরে নাইঙ্ভং গা (মক্কা বাঙ্ /মক্কা পাঙ্)
বাংলা : আঞোমা বাচ্চা জন্ম দেয় কোমরের পার্শ্ব দিয়ে (ভুট্টা গাছ)

৬. আঞোমা সাঃ মুইংরে অ্থুক কাঃ (হ্লাপ্য ফোঃ/হ্লোপ্যুফোঃ)
বাংলা : আঞোমা বাচ্চা জন্ম দেয় মাথার উপর দিক দিয়ে (কলাথোড়)

৭. ক্রী লী উই্ লী ক্রী লী উই্ লী (নাহ্)
বাংলা : যতই দেখবে ততই দূরে সরে যাবে (কান)

৮. ক্রুই সিঃ ছিঃ লুঙ্ লাও্য়া ফুঙ্ (সোওয়া)
বাংলা : দশটি কড়ি হাত পাখা দিয়ে ঢাকা (দাঁত)

৯. পাদ্ ম্রা ম্যাক্চিঃ, মাপা হিঃ আখ্রি ফুও্য়া ক্য খুংমা,
চা-রে মা-চা ওয়াইং খং গা (কুও্য়াইং হ্নেক্)
বাংলা : পাদম্রার চোখ নাই, পায়ের পাতা কোমর তল
খায় পেটের অংশ দিয়ে (যাতি/সুপারি কাটার যন্ত্র)

১০. পুওয়ং দাইং মেলাহ্, ম্যাহ্ দাইং মঃ থু
খুইরো মপ্ওয়ংরে, পাইং তঃ ম্যুহ্ (পঃ পক্)
বাংলা : কঁচি পাতা হয় না, ফুলের কলিও হয়না
তবুও ফুল ফুটে, অনেক ফুল (খৈ/মুড়ি)

১১. চিংম্যুহ্ মে-থ্যাইং বিড়ায় ম্যক্
অলু লু বাং ম্রিংগা য়ক্ (ক্রাইংকদং এ্রোয়ে)
বাংলা : ভেজা মাটি ভেদ করে যে গাছ সহজে উঠে (ঢেঁকিশাক)

১২. ছি বুঃ থি মা ছিনাইং মা
ওয়ামি মিঃ হিঃ মা রা সা (ওঃঔঃ)
বাংলা : বোতলের ভেতর সুগন্ধি,
ইচ্ছে করলেও পাওয়া যায় না (ডিম)

১৩. মে ফিব্ইং নাইক রৈঃ উ
মুফুওয়াইং পইং ফ্রুরে নাইক পুঃ ছু (উংসিঃ)
বাংলা : কাঁচা খাওয়া শীতল আলু,
না ধুলেও সাদা থাকে (নারিকেল)

১৪. তোওয়াং গো নুঃ রা রে
তইং গো নুঃ মা রাত্ (লাকচুয়াই)
বাংলা : গর্তকে তুলে নেওয়া যায়,

খুঁটিকে তোলা যায় না (আংতি)

১৫. আ গা তালাইক্ খোওয় ঙা খ্যাইক (ভ্রুসিঃ)
বাংলা : আকাশে একত্রিত পাঁচটি বাতি (চালতা ফল)

১৬. ক্রো লাহ্ রে নোওয়া মালাহ্ (বুঃবাঙ/বুসি পাঙ্)
বাংলা : দড়ি হাঁটে কিন্তু গরু হাঁটে না (কুমড়া গাছ)

১৭. ছুককে ত ছুঃ ফ্রাইং গে তং তলুং (মা মাহ্ ছাইং বাঙ্)
বাংলা : ধরলে এক মুঠো, মুঠো ছাড়লে একটি পাহাড় (মহিলার চুল)

১৮. লাক্ওয়া চং থং নিঙ্ রং থোয়াইং পা, চা-গা রাহ্ (চাঃফাইচ্চা)
বাংলা : সূর্যের আলোতে হাতের পাতা দিয়ে ধর
আলোতে পাবে অনেক অনেক কথা (বই পড়া)

১৯. অ্ খ্রি সোঙ্ খ্যং
অ-চঃ লু নাই ভং (অহ্লুখাইংসা)
বাংলা : তিন পায়ে খাড়া, নীচের কোমর অংশে বুচকা থলি (ভিখারি)

২০. আ গা সি মা ফালাহ্ ম্যু (মুঃরী)
বাংলা : আকাশে ভাসমান থালা (মেঘ)

২১. ওয়ঃমা কোঙ্ খ্যু প্জং লী লাক,
সুইঙ্ তাইং জাক্ (ইংতাইং জা/অয়িং তাইং জা)
বাংলা : মাদি শুকরের পিঠ বরাবর ভাঙা, ঠোঁটগুলোও বাঁকা বাঁকা
সোনালি জল পড়ে ঝম ঝম (ঘরের চাল)

২২. নিং খাঙ্ অহ্মুং ক্রি খাঙ আপ্রাইন্ক (ওয়িরা)
বাংলা : দিনে কলি, রাতে ফুটে (বিছানা)

২৩. তং গ্রবও্ ওয়াইং য়া য়াহ্ থু-কাইঙ্ - এ-কাহইঙকো-রো লাহ্ (রুইওয়াইং)
বাংলা : লম্বা চওড়া সুড়ঙ্গ, অনবরত লাফ দেয় এপাড়-ওপাড় (তাঁতের মাকু)

২৪. আ খ্রি শই্খ্যং বরগ্যং অ গং মাল্লাহ্ -বরগ্যা (কানাইং)
বাংলা : আট পায়ে বরগ্যা, মাথা চলে না বরগ্যা (কাঁকড়া)

২৫. অনং সি তালাক্ ফাঃ বই্লো মকুং বই্ ম খাইং (তৈঃছিঃ)
বাংলা : ছোটো কুয়ার পানি, সেচেও শেষ হয় না (থুথু)

২৬. জাইঙ্ বোঃ সু ব্রী, প-ফ্রই ক্রই
ব্রীং মা লে ক্যাঅ্,হ্রা মা রাহ্ (মোঃসিঃ)
বাংলা : জাইঙবো সুব্রী ফল ঝড়ে পড়লেও মাটিতে পড়ে না
খুঁজেও কোথাও পায় না (বৃষ্টির জলকণা)

২৭. ন হমং য়াং য়ু, নাইক ছাং ফ্রু
ম্রিং গং ম্সোওয়া, থিঃ থাক্ থংমা জাইং ফ্রাং সোওয়া (লাহ্-নীঙ্)
বাংলা : শুভ্রদেব হাতির শুরে মাটিতে হাঁটে না
আসমানে হাঁটা চলা করে (চাঁদ-সূর্য)

২৮. ব্লুমা লইং ভু, লু গো ম্যুঃ
লইং ভু আসা, আঁ মা চাহ্ (আংগীঃ/রাঙ্ ছিঃ)
বাংলা : ঘাড় থেকো রাক্ষসী গিলে মানুষ
ঘাড় থেকো রাক্ষসীর মাংস আমি খাই না (শার্ট/জামা)

২৯. অত্ং তাফাক, গ্রি সইং খং মা
প্যাইংরে হক্ষাক (ঈয়াই)
বাংলা : এক পাখি গভীর রাতে পাখা মেলে (হাত পাখা)

৩০. আখ্রিমা পঙ্ ফ্রি ওয়াইলো নিং, অসংমা ঠ্ক্যাছংলো লাহ্
ই সইং খংম্মা নারি ফাইংসা, আঁ য়ক্ক্যা (ক্রাকফা/ক্রাফা)
বাংলা : পায়ের ফুল প্যান্ট, মাথায় ঝুটিক্যাপ
রাত দুপুরে সময় ধরে বলে আমি সেই পুরুষ (মোরগ)

৩১. আপাঙ্ সোং বাঙ্
আসিঃ তলুং রুইম্মারা আনাইন্দা (থমং খ্যাকচা)
বাংলা : তিনটি গাছ আঁটি ভরা ফল,
গোনা যায় না অগণিত ফল (ভাত রান্না করা)

৩২. ছু-কে ত- ছু
ফাইং গে তা-ফ্রা খু (কোয়াইং)
বাংলা : ধরলে এক মুঠো, মুঠো ছাড়লে অনেক বড় (জাল)

১০. চাঁটগাইয়া ধাঁধা (ভাংগো কিস্‌সা)

বান্দরবান পার্বত্য জেলার বিভিন্ন জায়গায় দেশের অন্যান্য অঞ্চলের বাঙালি জাতির অনেক মানুষজনের বিচ্ছিন্নভাবে বসবাস থাকলেও এখানে তাদের নিজস্ব সংস্কৃতির প্রভাব তেমন বেশি লক্ষ করা যায় না। বিভিন্ন অঞ্চলের বাঙালি জনগোষ্ঠীর প্রবাদ প্রবচনের প্রচলনও বান্দরবানে তেমন প্রচলিত নয়। চট্টগ্রাম জেলা বান্দরবান জেলার পার্শ্ববর্তী জেলা হওয়ায় স্বাভাবিকভাবে চট্টগ্রাম জেলার অনেক লোকের বসবাস বান্দরবানে রয়েছে। তাই বান্দরবান জেলায় চট্টগ্রামের প্রবাদ প্রবচন ও ধাঁধার প্রচলন রয়েছে। নিম্নে চট্টগ্রামের (চাঁটগাইয়া) কিছু ধাঁধা উপস্থাপন করা হলো।

১. লাল মিয়া হাড্ত যায়, প্রতি হাড্ত থাপ্পর খায়-
[লাল মিয়া হাটে যায়, প্রতি হাটে থাপ্পর খায়] - (মাটির হাড়ি)

২. এই কুলের বুড়ি ঐ কুলত যায়, ধুপুর ধাপুর আছাড় খায়
[এ কুলের বুড়ি ঐ কুলে যায়, ধুপুর-ধাপুর আছাড় খায়] -(ঝাড়ু)

৩. পু'দে থেলে মুখে খায়, পেট ফুরালে বাড়িত যায়
[পাছায় ঠেলে মুখে খায়, পেট ফুরালে বাড়ি যায়] -(কলসি)

৪. তারা বাপ-পুত তাল তলাদি যায়, তিনান তাল পড়ি রইয়ে জনে উগ্‌গা খায়
[তারা পিতা-পুত্র তালতলা দিয়ে যায়, তিনটা তাল পড়ে আছে জনে একটা করে খায়]-(তারা তিন জন-নাতি, বাবা, দাদা)

৫. বাইরে অস্থি ভেতরে চাম, কেমন মর্দের ফিকিরী কাম
[বাইরে হাড় ভেতরে চামড়া, কেমন পুরুষের আশ্চর্য কাজ]-(জুঁইর নামক ছাতা)

৬. ঝাড়থুন নিঅলিল ভোজা, পাছাত লাভি মাথাত বোঝা
[ঝাড় থেকে বের হলো লোক, পাছায় লাঠি মাথায় বোঝা] -(আনারস)

৭. রাগ করলে লাগে না, বেরাগ করলে লাগে-(দুই ঠোঁট)

৮. আঁধার ঘরে বাঁদর নাচে, না না করলে আরো নাচে] -(জিহবা)

৯. উভে ভেম ভেম, ন মেলে পাতা
[ভেম ভেম করে উঠে, কিন্তু পাতা মেলে না] - (হরিণের শিং)

১০. এক ভোল মাংস, এক্কেন আড্ডি
[এক ভুলা মাংস, হাড় কিন্তু একটি] - (খড়ের গাদা)

১১. রাজারত্ পইরত্ ইছা মাছর ভরা, টিপ দিলে মরা
[রাজার পুকুরে চিংড়ি মাছে ভরা, টিপ দিলে মরা] -(লেবু)

১২. ঘরর ধাকে গাছর গাই, বছরে বছরে দুধ পায়
[ঘরের কাছে গাছের গাই, বছরে বছরে দুধ পায়] –(খেজুর গাছ)

১৩. আল্লার কী কদুরতি, ফলের ভিতর পানি
[আল্লাহর কী কুদরতি, ফলের ভিতর পানি]-(ডাব)

১৪. আছাড় মাইল্যে ন ভাংগে, টিপ দিলে ভাংগে
[ছুড়ে মারলে ভাঙেনা, টিপ দিলে ভাঙে] -(ভাত)

১৫. কচি মাইয়া বাজারত্ যায়, মাইনসর আ-তর চিংটি খায়
[কচি মেয়ে বাজারে যায়, মানুষের হাতের চিমটি খায়]-(লাউ)

১৬. উভুত্তুন পইজ্যে বুড়ি, তিন ঠেং উরয়া গরি
[উপর থেকে পড়ছে বুড়ি, তিন পা উপর করে] (চুলা)

১৭. গাছ থক থক পাতা কেরানী, খাইযে লাললোয়া
[গাছ থাক থাক সরু পাতা, মানুষে খায় লালটা] (খেজুর)

১৮. গাছ থক থক পাতা ভাল ডাল খাইযে লাললোয়া
[থাক থাক গাছ, পাতা ডালের মতো, মানুষে খায় লালটা] (পেঁপে)

প্রবাদ-প্রবচন

বান্দরবান পার্বত্য জেলায় ১১টি ক্ষুদ্র জাতিসত্তা ও বাঙালি জনগোষ্ঠীর বসবাস রয়েছে। এই পর্বতময় অঞ্চলকে ঘিরে বাস করছে বিভিন্ন ভাষাভাষীর বিভিন্ন আদিবাসী মানুষ। তাদের রয়েছে নানামুখি সাংস্কৃতিক জীবন। এ জেলার মানুষের ধাঁধাতে যেমন বৈচিত্র্য রয়েছে তেমনি প্রবাদ-প্রবচনের মধ্যেও বৈচিত্র্যতা পরিলক্ষিত হয়। এ প্রবাদ-প্রবচন যেমনি লোক সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে, এটিও লোক সাহিত্যের একটি অন্যতম অঙ্গ। নিম্নে বান্দরবানের এ ভিন্ন স্বাদের প্রচলিত প্রবাদ-প্রবচনসমূহ তুলে ধরা হলো :

<u>ম্রো প্রবাদ-প্রবচন</u>

১. রাক ওয়াই ন রিয়া তিয়া ওয়াই

অনুবাদ : যত চড়াই উৎরাই থাকুক বিকল্প রাস্তা পাওয়া যায়।

ভাবার্থ : বিপদ যতো বড়োই হোক না কেন উদ্ধারের পথ থাকে।

২. প্রি মাক লাক-এ লংসন মাক লাংক্রী।

অনুবাদ : বাঘের কামড়ের চেয়ে অনেক সময় পিঁপড়ের কামড় ভয়ঙ্কর।

ভাবার্থ : বড়ো সমস্যার চেয়ে কোনো কোনো ক্ষেত্রে ছোটো সমস্যাই বিপজ্জনক।

৩. প্রি পনতুই মাই সিক বত।

অনুবাদ : নদী পাড়ি দেওয়ার শেষ মুহূর্তেই বাঘের লেজ ভিজে গেলো।

ভাবার্থ : বিপদের শেষ মুহূর্তেই আরেক বিপদ আসা।

৪. রব ইয়ং অলু ওয়াই দৈমী।

অনুবাদ : কাঁকড়ার ন্যায় মস্তকবিহীন।

ভাবার্থ : অতি কৃপণ লোক।

৫. তুমচা দাম ইয়া পোয়া তুই তাকু কুই।

অনুবাধ : একটিমাত্র ছোটো পুঁটিমাছ নদীর নয়বাঁক পানি ঘোলা করতে পারে।

ভাবার্থ : একজন দুষ্টলোকই সমস্ত এলাকার অশান্তি সৃষ্টি করতে পারে।

৬. তুই দেন দাম ইয়ং।

অনুবাদ : উষ্ণ জলের মাছ।

ভাবার্থ : উশৃঙ্খল লোক

৭. সংসিং খাইয়ং লউ প্রুংরোং।

অনুবাদ : জ্যান্ত চিংড়ি মাছ ওজনকালে লাফলাফি করে।

ভাবার্থ : বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী লোকজন।

৮. লংপাং চাং বের প ইয়।
অনুবাদ : তেলাপোকা বুলবুলি পাখি সাজতে চায়।
ভাবার্থ : বামন হয়ে চাঁদে হাত দেওয়া।

৯. ক্রয়োক ক্রয়দর মা ত।
অনুবাদ : কেউ তাড়াচ্ছে বানর, আবার কেউ তাড়াচ্ছে হনুমান।
ভাবার্থ : মতের অমিল।

১০. হুয়া হন ওয়াদুই ইয়ং তাই।
অনুবাদ : পাথর আর ডিম।
ভাবার্থ : অসামঞ্জস্যপূর্ণ সম্পর্ক।

১১. চু লুকই কোয়াক হাপ চ-প, হাপতাই তা-ল
হাপ লুকই কোয়াক চু চ-প, হাপতাই তা-ল।
অনুবাদ : কাঁটার উপর কলাপাতা নিক্ষেপ করলে কলাপাতা ছিদ্র হবে,
আবার কলা পাতার উপর কাঁটা ফেললেও কলাপাতাই ছিদ্র হবে।
ভাবার্থ : ছোটোরাই সবসময় ক্ষতিগ্রস্ত ও নির্যাতিত হয়।

১২. তুক মী দা দাংসেক, তুক দৈমী দা কোয়াই উদ না।
অনুবাদ : চালাক লোকেরা সবসময় কাচের মতো ধারালো হয়
আর নম্রলোকেরা সবসময় মোমের মতো নরম হয়।
ভাবার্থ : উত্তম অধম।

১৩. চা সুরমি লাং, সরমি লাং
অনুবাদ : টক খায় একজন, পায়খানা করে আরেকজন।
ভাবার্থ : অন্যায় করে একজন, শাস্তি পায় অন্যজন।

১৪. আক্লুঙ তালি চুং কই খেদ না, কা ঙা চাক
আক্লুং প্রে চুং মিকই খেদ না, কা চেনটক।
অনুবাদ : চারপায়ী প্রাণীকে পালন করলে মাংস পায়
আর দু'পায়ের প্রাণীকে (মানুষ) সাহায্য করলে প্রাণ যায়।
ভাবার্থ : উপকারীর অপকার করা।

১৫. কুপ প্রি কুয়া না প্রি ইয়ো
কুপ মার কুয়া না মার ইয়ো চাংকম ক্লা।
অনুবাদ : বাঘের আস্তানায় গেলে বাঘ,
আর বনবিড়ালের আস্তানায় গেলে বনবিড়াল সাজতে হয়।
ভাবার্থ : যখন যেমন তখন তেমন।

১৬. পক প্ল ওয়া
অনুবাদ : জাল থেকে পালানো পাখি
ভাবার্থ : দাগী আসামী।

১৭. খা মি চাপ দা কাদপো দিংদৈ।
অনুবাদ : তিতা কখনো মিষ্টি হয় না।
ভাবার্থ : খারাপ লোক কখনো ভালো হয় না।

চাক প্রবাদ-প্রবচন (তুহ্তকা তা)

১. থাক্লাং ইকু রামোহে
[অল্প বিদ্যা ভয়ংকর]

২. বাঁ বাঁ ছাগারিগো, চিকছায়ে আছাপনায়
[অতি লোভে, তাতি নষ্ট]

৩. আঁগিংয়ান আনিংপো আঁছা বুন্ঙা নিংহে
[শক্তের ভক্ত, নরমের যম]

৪. কুয়াং ক্রক্নে, আছাকানোয়া আটাকহে
[প্রশ্রয় দিলে মাথায় ওঠে]

৫. উমকে কাইলোয়া মুন্ফেহে
[চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে]

৬. ফুনতার্নেয়া টার্নোক্ নামে ছাদিক লুহে
[আছাড় খেলে জায়গা চেনে]

৭. আচো ছাগা আছাপেনাংহে, লাংচাইন ব্রংয়াগা ক্রাইন্হে
[গেঁয়ো যোগী ভিক্ষা পায় না]

৮. হ-রাংনা টানামারাপুনে, ছাইন ছাইন পুহে
[একের ভুলে দশের সর্বনাশ]

৯. দুঃখা আহাননে, ছখ্খা লুহে
[কষ্ট করলে কেষ্ট মেলে]

১০. আছা কেমিং, বাইলুং সাতহেট
[গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল]

১১. চিন্গো ছিনগা হ্রাংগ্রী আবেপো
[যত গর্জে তত বর্ষে না]

১২. আহুবো সিঠকনে, কাইকট আলইপ
[ভাগ্যের লিখন যায় না খণ্ডন]

১৩. পুক রোপেয়া সিচাইকহে
[বাড়া ভাতে ছাই দেওয়া]

১৪. আমিকা কাংঠান উকোহে
[কুসংবাদ বাতাসের আগে যায়]

১৫. তাহ্ন ইন পেয়াংহে, আতা ইন চিহ্ে
[কাঁচা ধানে মই দেওয়া]

১৬. কাবাইন আঁ তুনগো, ই আরামাক এঁ
[ভাসমান ভেলায় বসে পিপাসা পাওয়া ঠিক নয়]

১৭. ইচ্ছিক আক্রো টানারিপো, আছাপো-গালু লুরিপো
[চিংড়ি মাছ মৎস নয়, গরিব লোকও মানুষ হিসেবে গণ্য নয়]

১৮. কংগালাক-আয়ুগো হি-ঈ ঠক্‌নাকে আপনাথেক্‌হ্রাইক্‌হেক
[নিজের পায়ের কুড়াল মারা অর্থাৎ নিজেই নিজের ক্ষতি করা]

১৯. তু প্রিগা আঠংনাকে আটো গাদালে ফ্রাইক হেক
[কথা বলতে না জানলে গালি দেওয়ার মতো]

২০. ক্যজো লোভা ছাইংনাকে ছিবো হেক্‌
[অতি লোভে তাঁতি নষ্ট]

২১. কংগা লাক্‌ আংয়ুগো আং মালাং হেক
[আকাশের অবস্থা দেখে ধান রোদে দেওয়া। তুলনা : অবস্থা দেখে ব্যবস্থা]

২২. আমাইং ঙেহেকালু ক্লাহে
[যার ঘা তার ব্যথা]

২৩. মাইং ছা-ঈ সুক্‌নাকে কওয়েং ছাবো হেক্‌
[ছোট বাচ্চার সাথে দুষ্টুমি করলে লজ্জা পেতে হয়। তুলনা : আক্কেল সেলামি]

২৪. লুওয়াং য়ুগো কওয়েং য়াহেক্‌
[লোকের অবস্থা দেখে পান বানানো]

২৫. তাহ্ন ইন পেয়াংহে, আতা ইন চিহে ।
[পাকা ধানে মই দেওয়া]

২৬. আহ্ন মাব্রুকো সিচাইহে ।
[ডুবে ডুবে জল খাওয়া]

২৮. কাফো প্রোনগো মুনয়াং ফ্রাইনে, পেছি আ-ঈ খ্যাই নাই ।
[গরিব লোক রাজা হলে, দেশে শান্তি থাকে না]

২৯. য়াংছা তুপ্রিগা লুয়াং, সাকাইকা আহ্রাপো ।
[বাচালকে সবাই অপছন্দ করে]

৩০. নাং মিকছারা পাইন হে ।
[অমাবস্যার চাঁদ]

৩১. কুংনুকক্রা ছামুকশি ছানহে ।
[আগুন লাগা সংসার]

৩২. লু-গে চেরক হুয়ায়, চিককে কংগালাক আ।
[আকাশ কুসুম ভাবনা]

৩৩. কাং প্যাকহে ।
[বিসমিল্লায় গলদ]

৩৪. কাইছাইং হে।
[অগ্রাহ্য করা]

৩৫. নাং প্যাক হে।
[বদনাম হওয়া]

৩৬. নাং রোয়াং হে।
[প্রচার হওয়া]

৩৭. উকু ইন তালুং আতাইঙে ।
[ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে আকাশ-পাতাল ব্যবধান]

৩৮. আপুক ক্রিহে ।
[গভীর জলের মাছ]

৩৯. তাহু ক্রিহে ।
[চুরি করা]

৪০. তু-কিগালুয়াং আচাক পোহে।
[মিষ্টভাষীকে ভয় পেতে হয়]

৪১. মাচেকো আতুং হেক্য।
[মুখে মধু অন্তরে বিষ]

৪২. আপানাগা মন্না পিগো, লুগা ছাইতা পোহে।
[শাক দিয়ে মাছ ঢাকা]

৪৩. থিন প্রাইংয়াং আপানাগা চিক মাইকানি রিতুগাহে।
[মগের মুল্লুক]

৪৪. নাইছাকিংয়াগা,পাইংছা ।
[আলালের ঘরের দুলাল]

৪৫. না আইংঞেন নেথ,ঙাআছি রিগা ইংঞেন গায়া।
[কেউ আমাকে না দিলে তাকে দেবো কেন?]

৪৬. আকোই ক্যান টাঙা ওউথেগ আকিৎইপ।
[যে ব্যক্তির আক্কেল জ্ঞান নেই সে কোনো কথা শুনবেও না, শুনলেও বুঝতে চাইবে না]

৪৭. টাউও রানে থেকাকাদাই থেয়ান আফ্রিংঞেন পৌকা ।
[ডুলার তলা যদি ফুটা হয়, ডুলায় যতই দাওনা কখনও ডুলা ভরবে না]

অর্থাৎ সংসারে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যদি বুদ্ধির ঘাটতি হয়, অপচয় হয়;
তবে যতই রোজগার করুক না কেন সংসারের কোনো উন্নতি হবে না।

৪৮. ছামৌমে ক্যাংহে ছামো তাব্রাইয়া লুভাক্যংহে ।
[মানুষ গরু চরায়, গরুও উল্টা মানুষকে চরায়।
অর্থাৎ নেতা যদি ফাঁকি দেয়, সেই ফাঁকির সুযোগ তার সহকর্মীরা কিংবা অধস্তনরাও নিয়ে থাকে]

৪৯. ছলের রাই গরুর সিন্নি।
[হারানো ছাগলের জন্য গরু মানত অর্থাৎ পোয়া বোঝে তো সের বোঝে না]

খিয়াং প্রবাদ-প্রবচন

১. মাহ্‌তাতিঃ লা উনুং দনেই
[অল্প বিদ্যা ভয়ংকরী]

২. আচাংচে কেঃ ওনোওচে লিঃ
[শক্তের ভক্ত নরমের যম]

৩. নুলুমচল্যেং মেইহি ল্যেত্‌তি
[ভাগ্যের লিখন যায়না খণ্ডন]

৪. দুঃখা খেম্‌তি লাহা সকাক্‌ দুঃখা খামলা
[ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভাঙে]

৫. খ্রং ক্যেঃ বলিয়েই নাক্‌
[পরের ধনে পোদ্দারি]

৬. ইম্‌ বুঃ এয়েই উপুতিঃ ন চোঙাই
[ঘরের ভাত খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো]

৭. তুইমেং দ্যিম উনুং লো লোক
[খালি কলসি বাজে বেশি]

৮. এখেও থকা ইবি লেও
[যত গর্জে তত বর্ষে না]

৯. নোচোঙেই ম্যেনহি অপয় নেএইলাঃ
[সবুরে মেওয়া ফলে]

১০. মল এয়্যাঃনি আক্যাঙঃ মেই
[চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে]

১১. অমহ্‌ উওয়া ময়োম্‌ এইলা মহ্‌তেই/নিয়েই খ্রাং মহ্‌ত
[যার ঘা তার ব্যথা]

১২. খেওসে পোক্‌লান
[কুসংবাদ বাতাসে আগে যায়]

১৩. মমুত পয় এচেতেয়োং বাং নামহ্‌ত
[যারে দেখতে নারে তার চলন বাঁকা]

১৪. উ বুঃ এয়োম এই খেও হও
[নুন খাই যার, গুণ গাই তার]

১৫. ইলিয়া হ্রি আহাতা হ্রি
[ধারেও কাটে ভারেও কাটে]

১৬. ওখো ওয়ং হ্নি চে লোঙোং তঙেই
[দু' নৌকায় পা দেওয়া]

১৭. সিলা তুই
[তেলে-জলে মিশে না]

১৮. অনহ্‌কু নালাঃহি উলুকি লো
[কান টানলে মাথা আসে]

১৯. ইহ্রিং চে ইহ্রিঙ্যেং নোলোওঃ
[কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা]

২০. নুপুম্‌ নপয় হি ঈকিত খেনি পয়
[আপন ভালোতো জগত ভালো]

২১. খপ আক নওকস ইহুয় অম, বুং আক কোং এই
[এককাপ খেলে যা, পুরো বোতলেও তা]

চাকমা প্রবাদ-প্রবচন

১. লোগ মুয়ত জয় লোগ মুয়ত খয়
[লোকের মুখে জয়, লোকের মুখে ক্ষয়]

২. ভাত ভালো চুধা খা, পথ ভালা বেঙা যা
[ভাত ভালা হলে তরকারি ছাড়া খাওয়া যায়, পথ ভালো হলে বাঁকা পথেও যাওয়া যায়]

৩. আমনত্তুন থেলে খা, পরত্তুন থেলে চা
[নিজের থাকলে খাও, পরের থাকলে চাও]

৪. লাভে লুয়া বয়, অলাভে তুলায়্য ন বুয়ায়
বাংলা : লাভে লোহা বহন করে, অলাভে তুলাও বহন করে না।

৫. গাছ চিনে বাগলে, মানুছ চিনে আগলে
[গাছ চেনা যায় বাকলে, আর মানুষ চেনা যায় আচরণে]

৬. সেদাম নেই যার, তিন মোক তার
[যার কোনো কাণ্ডজ্ঞান নেই, তার তিন বউ]

৭. মুখত দাঁড়ি, বুকত কেশ, তারে কয়দে মদ্দর বেশ

[মুখে দাঁড়ি বুকে কেশ, সেইতো পুরুষের যথার্থ রূপ]

৮. বিদেশত গেলে রাজার ঝি অ বাঁদি অয়

[রাজকন্যাও বিদেশে গেলে সাধারণ বাঁদির মতো ব্যবহার পায়]

৯. কোমরত্ নেই তেনা, মিডাগুলি ভাত খানা

[কোমরে যার কাপড় নেই, সে মিষ্টি দিয়ে ভাত খায়]

১০. যে কুগুরঅ লেজ বেগা, চুমায় ভরে থেলেও লেজ উজু নঅয়

[যে কুকুরের লেজ বাঁকা, বাঁশের চোঙায় ভরে রেখে দিলেও তা আর সোজা হয় না]

১১. এহ্দ্পা ছুগেলে মোচ্ছ পারা

[হাতি মরলেও লাখ টাকা]

১২. ছাজ ভাঙ্গে গাল খজরায়

[সুসিদ্ধ ভাত তবু বলে গাল ফুটছে অর্থাৎ সুখে থাকতে ভূতে কিলায়]

১৩. এক দিনে জার কাল ন যায়

[শীতকালটা এক দিনে যায় না অর্থাৎ এক মাঘে শীত যায় না]

১৪. চিগোন মরিচ জাল বেজ

[ছোটো জাতের লঙ্কায় ঝাল বেশি থাকে]

১৫. আমন্ অ আন্দাজ পাগলে বোঝে

[নিজের আন্দাজ পাগলেও বুঝে]

১৬. বুরা বান্দরেয়ো গাজত উধে

[বানর বুড়ো হলেও গাছে চড়ে]

১৭. ভাই নেই ঘরত কোলঅ বোঝা

[নিরন্নের ঘরে ঝগড়ার বাসা অর্থাৎ নিত্যকলহ]

১৮. বিল অ ধান্লই বান্দর বাজা

[বিলের ধান নিয়ে বানর রাজা]

১৯. খেই পাল্যে বাবঅ নাঙ

[আপনি বাঁচলে বাপের নাম]

২০. বেজ্ খেদঅ চেলে অল্লয়ো লাগত ন পায়

[অতি লোভে তাতি নষ্ট]

২১. যদঅ গরু তদঅ গবর

[যত গরু তত গোবর অর্থাৎ সংখ্যায় বেশি হলে ঝামেলাও বেশি হয়]

২২. পীর অ নাঙদি ফগিরে খায়

[পরের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে খাওয়া]

২৩. ধিঙি স্বর্গত গেলেয়ো বারা বানে
[ঢেকি স্বর্গে গেলেও বারা বাঁধে]

২৪. ঘরত ভাত খেইন্যায় মামু মোজ চরা না
[ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো]

খুমী প্রবাদ-প্রবচন (পালে-লে)

১. সিখি দি খা সিঙাবাইমা রাম
[কোনো কাজ করার আগে প্রচার করা ঠিক নয়]

২. নাম চু নাচা
[কৈ মাছের প্রাণ]

৩. আনা আহ্
[অমর]

৪. লাংতেং থাংবুই কিনি থুং আং
[অপ্রয়োজনে খরচ করা (অমিতব্যয়ী)]

৫. লেংওসাই
[বাকি কাজ দেরি হওয়া]

৬. কাংখাইং তগো কানে কামসাং অং
[উত্থান-পতন]

৭. হু বাইকেং আকাতি ডাই
[বুঝালে উল্টো বোঝে]।

৮. লুহা লুচা ফ্রে নাই
[সবার সাথে মিলেমিশে থাকা]

৯. মিলিমিকা ফ্রেনাই
[বংশের ইতিহাস জানা]

১০. তাআয় লিকি
[অতি কৃপণ লোক]

১১. আ ক্লোছেঅ
[দীর্ঘায়ু হোক]

১২. তেবেওল
[মেলামেশা করতে না জানা]

১৩. খুমুং আনল মাপা অং
[গণ্যমান্য ব্যক্তিকে মান্য করা]

১৪. ওয়াই ডুং ল এউবি লঅং মিওথিং নহ্
[অথর্ব লোককে তিরস্কার করা]

১৫. খুমা তগহ্ থরুনা
[জিনিসের তুলনায় সংখ্যায় বেশি]

১৬. খারাই আ আংদেং আ
[অতিরিক্ত খাওয়া]

১৭. তাগো ওউং লুংতাল
[একটি জিনিসকে বহুবার ব্যবহার]

১৮. আ লুমাই ল কিনি থুংররে
[লাশ থাকতে বিবাহ করা]

১৯. মতেং ও লুমাই কিনি থুংরে
[মন স্থির থাকা]

২০. সোপাংপ উই
[শরীরের প্রতি অযত্ন থাকা]

২১. প্রেয়ং তিং এ ঙেরায় তেলি তেলে নাই
[বুদ্ধিমানের মতো চালাক]

২২. তুই থিং এ নালৈ এঙামা পোপি নাই
[বোকা লোক চালাক হওয়া]

২৩. তুই থিং এ আসেং আতংতাই
[ভালো হলে সামনে, খারাপ বেলায় পিছে থাকা]

২৪. উকি তেংয়া মুই নিনা ঙোঅ
[অতি গরিবলোক]

২৫. লাংতেং এ তোগো লেউছি
[অনর্থক রাগান্বিত হওয়া]

মারমা প্রবাদ-প্রবচন

১. মাঙঃমা অম্যোঃ মহিহ্, শামা অরোঃমহিহ্
[জিহ্বার যেমন অস্থি নেই, রাজারও তেমন আত্মীয় নেই]।

২. খ্রুহ্ মতইকে অ্মুই ম্খ
[হোচট না খেলে মাকে কেউ ডাকে না]

৩. ছাং লাঃগে লাইঃম্লো
[হাতির যেতে কোনো রাস্তার দরকার হয় না]

৪. ওয়াঃনাহ্ ওয়াঃ খ্যইংরারেহ্, ছাং নাহ্ ছাং ফাইঃ বারে
[বাঁশ দিয়ে বাঁশ বাঁধতে হয়, হাতি দিয়ে হাতি ধরতে হয়]

৫. আঃখ্রিঃখা আবাই্‌ত ম্‌সাঙ
[জোর যার মুল্লুক তার]

৬. অম্যাক কঙঃলে ত্‌লুঙঃ, লু কঙঃলে ত্‌য়ক
[মণি ভালো হলে একটাই যথেষ্ট, মানুষ ভালো হলে একজনই যথেষ্ট]

৭. ক্যিঃস্যে ত্‌খালেঃ মতোয়াই
[টিয়া পাখি কখনো ডাক দেয় না]

৮. সুঙেগো অক্ষ্যত্, মাঙগো অমহ্
[শিশুকে করতে হয় আদর, রাজাকে করতে হয় প্রশংসা]

৯. খুইমা আরোঃ খাঙ, লুমা আম্যো খাঙ
[কুকুরের টান হাড্ডির প্রতি, মানুষের টান স্বজনের প্রতি]

১০. ফ্রইফোসু ত্‌য়ক্‌কো ফ্যাক্‌রো ম্ প্যাক্, ম্‌ফ্রইফোসু ত্‌য়ক্‌কো প্যাংরো ম্‌ফ্রই।
[প্রতিভাবান ব্যক্তিকে দমানো যায় না, আর প্রতিভাহীন ব্যক্তিকে গড়ে তোলা যায় না]

১১. অঞং চংগে আকং চাঃবারে
[সবুরে মেওয়া ফলে]

১২. পইঞা শৈওঃলু ম্‌খোঃ
[বিদ্যারূপ ধন চুরি যায় না]

১৩. পইঞা লোগে অ্‌গং সুংলুংগো
[বিদ্যার খোঁজে জ্ঞানবৃক্ষের কাছে যাও]

১৪. মুইংমা অ্‌রোঃ মিহিঃ মংমা অ্‌ম্যো মিহিঃ
[আগুনের হাড় নেই, রাজার কোনো স্বজন নেই]

১৫. হ্লিমা চিঃয়ই চামা ফাইয়ই
[নৌকা যত বাইবে ততই শিখবে অর্থাৎ যত পড়বে তত শিখবে]

১৬. ক্রী ঃমুং লোগে গ্রেমুং ক্যাক্
[বড়ো হতে চাও যদি ছোটো হও তবে]

লুসাই প্রবাদ-প্রবচন

১. লাইকিং পুয়ানপুই তাহ্‌তুর আর আনি
[আজকের কাজ আজকেই কর]

২. মাহ্‌নি ইনফাক লেহ্ সাখিঙাল আহ্ এংমাহ্‌আবেত লৌ
[আত্মপ্রশংসা অন্যের হাসি কুড়ায়]

৩. সেবৌ হ্মু সে কাংখার আং নি
[চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে]

৪. মিআ ইন্ আন্ আটমু আন্ লেম
[বোকারাম বোকামির ফল পায়]

৫. মি থেম্ থিয়াম লৌভিন আন থুয়ামথিল আনমহ্ ছিয়াত
[নাচতে না জানলে উঠান বাঁকা]

ত্রিপুরা প্রবাদ-প্রবচন (কাওপুং)

১. আপ্রাং সাওগা থাও রৈদই
অনুবাদ : শৈল মাছের তেলের উপর তেল দেয়া
ভাবার্থ : ভালো জিনিসকে আরও ভালো করা।

২. লাইফাং গা
অনুবাদ : কলা গাছের কষ লাগা।
ভাবার্থ : সমস্যা সৃষ্টি করা।

৩. মুখই জাফাং মুখই
অনুবাদ : টক গাছে টক ফলই ধরে
ভাবার্থ : বংশগত আচরণের ভালো-মন্দ দিক।

৪. মের্মা মায়াসিং লাই জাচাওমি
অনুবাদ : সিদল/নাপ্পি না পাইতেই পাতা নিয়ে হাত পাতে
ভাবার্থ : গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল।

৫. কেসকুং কেদাং
অনুবাদ : কাজে অবহেলা করা
ভাবার্থ : পিছপা হওয়া।

৬. ফিংলে ফিংল্লে
অনুবাদ : অস্থির চতুর
ভাবার্থ : কুচরিত্রের নারী বিশেষ।

৭. নাকুং নাকাং
অনুবাদ : দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর সমস্যা
ভাবার্থ : দুই প্রতিদ্বন্দ্বির মধ্যে সমস্যা সমাধানে অস্বীকার করা।

৮. তৈ কুনা ম্লেমবাই জাওখ্রাই বাইমি
অনুবাদ : স্নানের অনিচ্ছা সত্ত্বেও সাঁকো ভেঙে স্নান করতে হলো
ভাবার্থ : অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাধ্যগতভাবে কাজ করা ।

৯. ওয়াক কানা থং খুমি
অনুবাদ : শুকর খুঁটিতে ধাক্কা খাওয়া
ভাবার্থ : অনধিকার চর্চায় বিপদের সম্মুখীন হয়।

১০. মুসুখি সাওগা পদবা

অনুবাদ : গরিব থেকে ধনী/সাধারণ পরিবার থেকে শিক্ষিত ও বড়ো লোক হওয়া

ভাবার্থ : গোবরের পদ্মফুল।

১১. ওয়াকই ম্ফাং ওয়ামি

অনুবাদ : গাছে ও বাঁশে তজ্জা বানানো

ভাবার্থ : গরমিল। (পরিবারে ও সমাজে সমস্যা সৃষ্টি হলে বাক্যটি ব্যবহৃত হয়)।

১২. থাইলি ম্সং

অনুবাদ : কলা গাছের ঝোপ

ভাবার্থ : আত্মীয়স্বজন বা বংশবৃদ্ধি হওয়া।

১৩. আ ম্ক দই

অনুবাদ : দুই চোখা মাছ

ভাবার্থ : অনেক ভাই-বোনের মধ্যে মৃত্যুর পর যদি দুই ভাই-বোন বেঁচে থাকে অথবা শুধু দুই ভাই-বোন অথবা দুই ছেলে জন্ম হয়ে থাকে তাহলে ত্রিপুরা সমাজে মাছের দুই চোখ বলা হয়ে থাকে।

১৪. থাও গ্রাং ম্লিয়া

অনুবাদ : অতিরিক্ত তেল মাখা চুল মোলায়েম হয় না অর্থাৎ বাচালের কথায় কেউ কর্ণপাত করে না।

ভাবার্থ : অতিরঞ্জিত ভালো না।

১৫. চলাসা ওয়াসা

অনুবাদ : পুরুষরা কুড়ালের সামিল

ভাবার্থ : নারীর চেয়ে পুরুষের শক্তি অধিক।

১৮. ব্রইসা খাওরইসা

অনুবাদ : নারীরা কুঁড়ির মতো

ভাবার্থ : সরল ও কমলবতী।

১৯. মিঁয়া সুমবার তাঁথেম খ্রঃ

অনুবাদ : জ্ঞানের পরিমাপ আর ফিতার মাপা একই

ভাবার্থ : যাহা সন্দেহ লাগে তাহা বাস্তবেও ঠিক।

২০. সর্গ নাইসা খুতই ম্সুসা

অনুবাদ : অপরের গায়ে থুথু ফেলা

ভাবার্থ : নিজের দোষ চাপা দিয়ে কথা বলা।

২১. বোঁন মুখি তা-খাওদি

ভাবার্থ : নিজেকে না জেনে, অপরকে সমালোচনা করা।

বম প্রবাদ-প্রবচন

১. আম রুলপি লন নাক থু আ সিম

[আপন দোষ/ নিজের অপরাধ ঢাকবার প্রচেষ্টা]

২. টিল সাক থিয়াম লৌ মা লাক আ তৱা
[নিজের থুথু নিজের গায়ে ফেলা]

৩. বু : ফুন লৌ ল : বা সাম
[ইট মারলে পাটকেল খেতে হয়]

৪. এই চুবুক পা আ থি, চিয়ামচা রিয়াম পা আ দাম
[যে ব্যক্তি বাচবিচার করে না সে মরে, আর সাবধানী ব্যক্তিরা বাঁচে]

৫. হাম মাসা রয়, বয় মাসা লাল
[আগে আরাম-আয়েস করলে পরে কষ্ট পেতে হয়]

৬. মি সর তং লৌ মাহ সর তং
[গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল]

৭. মালি দ্যাং লে রুয়াল্লি থেই ঃ
[রানের ক্ষতস্থানে আঘাত পাওয়া আর প্রাক্তন প্রেমিক/প্রেমিকার কথা মনে পড়ার বেদনা একই রকম]

৮. নু লে পা সিম নাই লৌ জুবুই লাম ম্লাং রিল
[বাবা-মার অবাধ্য হলে বাঁশ ইঁদুরের (জুবুই) মতো রাস্তার ধারে পড়ে থাকতে হয়]

৯. নু নাও খুয়া লে সাখী খুয়া সা থেই লৌ
[বনের হরিণের যেমন নির্দিষ্ট কোনো ঠিকানা নেই তেমনি মেয়েদেরও কোথায় বিয়ে হবে তার কোনো ঠিক নেই]

১০. নুপি ফানখুম লে নাও সৌ নুক
[ঘরজামাই হওয়া আর বাঁশ উল্টা দিক থেকে টানা একইরকম কষ্টদায়ক]

১১. উইচৌ সাক হাম
[গায়ের জোরে জবর-দখল করে সব নিজের ভোগের জন্য হস্তগত করা। যেমন : কুকুরের সব হাড্ডি নিজের দখলে রেখে অন্য কাউকে খেতে না দেয়ার মতো]

১২. কাপ্ ছাদাক্ লে বিয়াং লৌ টাং
[যে পাত্রে রাখা হয় সে পাত্রের আকার ধারণ করা]

১৩. সাইপুম্ পেহ্
[মিথ্যাবাদীদের কোনো বিশ্বাস নেই]

১৪. চিল্ সাক্ থিয়ামলৌ মাহ্লাক্ তৱুং
[যে লোক থুথু ফেলতে জানে না তার নিজের গায়ে থুথু পড়ে]

১৫. নো লে পা থো আঁইলৌ, যাবুই লাম ম্লাং রিল্
[গুরুজনের কথা না মানলে বিপদে পড়ে]

১৬. মোর শোত্ কামখং
[খাওয়ার প্রতি যে লোভী তাকে কেহ ভালো চোখে দেখে না]

চট্টগ্রামী প্রবাদ-প্রবচন (চাঁটগাইয়া প্রবাদ)

বান্দরবান পার্বত্য জেলার বিভিন্ন জায়গায় দেশের অন্যান্য অঞ্চলের বাঙালি জাতির অনেক মানুষজনের বিচ্ছিন্নভাবে বসবাস থাকলেও এখানে তাদের নিজস্ব সংস্কৃতির প্রভাব তেমন বেশি লক্ষ্য করা যায় না। বিভিন্ন অঞ্চলের বাঙালি জনগোষ্ঠীর প্রবাদ প্রবচনের প্রচলনও বান্দরবানে তেমন প্রচলিত নয়। চট্টগ্রাম জেলা বান্দরবান জেলার পার্শ্ববর্তী জেলা হওয়ায় স্বাভাবিকভাবে জেলার অনেক লোকের বসবাস বান্দরবানে রয়েছে। তাই বান্দরবান জেলায় চট্টগ্রামের প্রবাদ-প্রবচন ও ধাঁধা প্রচলন রয়েছে। নিম্নে চট্টগ্রামের (চাঁটগাইয়া) কিছু প্রবাদ-প্রবচন উপস্থাপন করা হলো।

১. মরিচ পোড়া খাই ঘিয়র ঢেক
[মরিচ পোড়া খেয়ে ঘি খাওয়ার ঢেঁকুর তোলা]

২. পলর কাম নয় ছিন্নি খাওন
[পাগলের কাজ নয় ছিন্নি খাওয়া]

৩. ঘিয়র বাসে ছালা বেচা
[অপরের গুণে নিজে গুণান্বিত হওয়া]

৪. ঢেঁই মক্কা গিলেও বারা বান্দে
[যার যা অভ্যাস সে তাই করে]

৫. নাম ফাইট্টে যার, পোন ফাইট্টে তার
[খ্যাতির বিড়ম্বনা]

৬. ওজার ভাঙ্গার ঘর, বৈদ্যর নিত্যম্বর
[পরের উপকার করে নিজের ভাগ্য পাল্টাতে না পারা]

৭. টা-ডা বাঁলর মেজাজ গরম
[একরোখা বাঙালির মেজাজ গরম]

৮. ইছা মাছর লেজপুরী খাইন্নজানে
[চিংড়ি মাছের লেজ পুড়ে খেতে জানে না]

৯. লক্ষী ছাড়া হ'রর খুঁড়া
[লক্ষী মানুষ ব্যতীত অন্য মানুষ মাটিতে পোতা বাঁশের খুঁটির মতো]

১০. বীজ ধান বাকি দিলে ছোঁয়া
[বিপদে সহযোগিতার কদর নেই]

১১. কৈ মাছের ঈরা, কুইশ্যলর গিরা
[সমাজের কৃপণ ব্যক্তি]

১২. যার ব'রে ফুইঁরে খাইয়ে ঢেঁই দেইলে ভরার
[যার বাবাকে কুমিরে খেয়েছে, সে ঢেঁকি দেখলেও ভয় পায়]

১৩. খাইয়ে দাঁড়িঅলা, বাইজ্যে মোছঅলা
[ভালো মানুষ দোষ করেও পার পায়, খারাপ মানুষ দোষ না করেও ধরা পড়ে]

১৪. অরীয়ে ভাইলে ছাড়, বউয়ে ভাইলে মার
[শাশুড়ি গালমন্দ মাজর্নীয় কিন্তু বউয়ের গালমন্দ অমার্জনীয়]

১৫. হুনি, সারেং, দরগাহ— এই তিনে চাটগাঁ
[শুঁটকি, সারেং, দরগা— এই তিনে চট্টগ্রাম]

১৬. যম, জামাই, ভাইনা— এই তিনজন নয় আপনা
[যম, জামাই, ভাগিনা এই তিনজন আপন নয়]

১৭. উআইসস্যার লাই ধান ফুওয়ার, খাইয়াল্লাই ভাত পাতৎ
[উপবাসীর জন্য ধান শুকাচ্ছে আর খাওয়া শেষ করা লোকের জন্য পাতে ভাত দিচ্ছে]

১৮. পরর মাথাৎ কাঁট্ঠল ভাঁই খঅন
[পরের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে খাওয়া]

১৯. কাম্মুয়া গাভর ভাতে ন মরে
[পরিশ্রমী মানুষ ভাতে মরে না]

২০. নরমর বাঘ, দরর কুঁইর
[শক্তের ভক্ত নরমের যম]

২১. মরা আঁতি লাখ টেঁয়ার
[মরা হাতি লাখ টাকা]

২২. রায়ূলীর তুন পোয়া চওন
[সংসারত্যাগী বৌদ্ধভিক্ষুর কাছে ছেলে চাওয়া]

২৩. টেঁয়া থাইলে বাঘের দুধঅ পঅন যায়
[টাকা থাকলে বাঘের দুধও পাওয়া যায়]

২৪. আঅনর ভালা পঅলেঅ বুঝে
[নিজের ভালো পাগলও বুঝে]

২৫. নিততি গরবার আদর নাই, নিততি ছালনার ফোঁয়াদ নাই
[নিত্যদিনের অতিথির কদর নাই, নিত্যদিনের তরকারির মজা নাই]

২৬. কোণ পাইলে দোন চায়, বইঅত পাইলে হুতত্অ চায়
[বসতে দিলে শুইতে চায়]

২৭. কেঁড়া দি কেঁড়া তোলন
[কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা]

২৮. ঘরর গরু ঘাডার খের ন খায়
[ঘরের গরু উঠানের ঘাস খায় না]

২৯. ছওল নাচে খুডার বলে, মাইয়ালোক নাচে মদ্দার বলে।
[ছাগল নাচে খুঁটির জোরে, মেয়েলোক নাচে পুরুষের বলে]

৩০. সুখে থাইলে ভূতে কিলায়
[সুখে থাকলে ভূতে মারে]

৩১. আজিয়া গেলে যাগুই, আরেকদিন থাইলে থাঅ পরেবঅ
[আজকে গেলে যাও, আরেকদিন থাকলে থাকতে হবে]

৩২. মা গঙ্গা আই যদি ফারাইটারি মুষ বলি দিঅম
[বিপদে পড়লে সৃষ্টিকর্তার নাম]

৩৩. যতহঅন ফাতত ভাত ততহঅন আশীর্বাদ
[যতক্ষণ ভাত পাতে থাকে ততক্ষণই আশীর্বাদ]

৩৪. অতি সুন্দরীর নেক নাই
[অতি সুন্দরী মেয়েরা উপযুক্ত স্বামী পায় না]

৩৫. ফুইর মারি ভাঁইর খাড়ি লঅন
[ভিক্ষুককে মেরে টাকা কেড়ে নেওয়া]

৩৬. কোদালে বুক টানে
[আপনজনকে বুকে টেনে নেয়]

৩৮. খাইল্যা থেইল্যা বেশি মাতে
[খালি কলসি বেশি বাজে]

৩৯. অতি চালাকর গলায় দড়ি
[অতি চালাকের গলায় দড়ি]

৪০. অক্কল তরকারির বঅর পাতা
[সকল তরকারির ধন্যাপাতা]

লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কার

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে বান্দরবান পার্বত্য জেলা অবস্থিত। এ জেলায় ১১টি আদিবাসী বসবাস করে। তাদের সমাজে লোকসংস্কার বা লোকবিশ্বাসের প্রভাব অপরিসীম। লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কার তাদের সমাজকে এখনো প্রভাবিত করে। এসব লোকসংস্কার বা লোকবিশ্বাস, লোকসাহিত্য ও লোকসংস্কৃতির এক অমূল্য সম্পদ। লোকসংস্কার বা লোকবিশ্বাস, লোকসমাজের আচার-ব্যবহার, চিন্তনে-মননে, চেতনা-অবচেতনা, ব্যক্তির বিশ্বাসে বিশেষভাবে পরিলক্ষিত। এগুলো প্রতিফলিত হয়েছে বিভিন্ন পূজা-পার্বণ, বিবাহপ্রথা, জন্ম-মৃত্যুবিষয়ক সামাজিক ও ধর্মীয় আচার-আচরণ, খাদ্য, সাংস্কৃতিক ও চাষাবাদ পদ্ধতিতে।

ক. খিয়াং লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কার

মৃতের শবযাত্রা নবজাতক কিংবা শিশুদের দেখাতে নেই। কারণ এতে নবজাতক কিংবা শিশুরা মৃত ব্যক্তির সহযাত্রী হতে পারে বলে খিয়াংরা বিশ্বাস করে। 'শুমপুম' মাছ কিংবা মাংস বাজার থেকে প্রকাশ্যে বা মানুষে দেখতে পায় ওভাবে আনতে নেই। তাতে 'ঢুংনু' নামক অপদেবতা বুড়ির কুনজর পড়ে। নিছক দায়ে পড়ে আনতে হলে ঐ মাছে বা মাংসের মধ্যে এক টুকরা তেঁতুল বা টকজাতীয় জিনিস দিয়ে 'কুনজর' মুক্ত করে রান্না করতে হবে। নবজাতক সন্তানকে ছুঁতে হলে আগুনে হাত একটু গরম করে নিতে হয়। তা না হলে শিশুর অমঙ্গল হওয়ার সম্ভবনা থাকে বলে খিয়াংরা বিশ্বাস করে।

শিশুর জন্ম : গর্ভবতী নারীদের কিছু নিয়মকানুন মেনে চলতে হয়। যেমন : অন্তঃসত্ত্বাকালে তাদের জন্য চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ দেখা নিষেধ। সন্ধ্যার সময় বাইরে যাওয়া ও ঘোরাফেরা করা নিষেধ। অন্যথায় অপদেবতার কুনজর পড়লে শিশু ও তার মা ক্ষতিগ্রস্ত হবে বলে খিয়াংদের বিশ্বাস। সন্তান জন্মের সময় প্রসূতি মা ও নবজাতক সন্তানকে নিজেদের থাকার ঘরের বাইরে অন্য ঘরে চুলার আগুনের পাশে থাকতে হয়। আগুনের পাশে থাকলে নাকি অপদেবতা বা অপশক্তির কাছ থেকে রক্ষা পাওয়া যায় বলে খিয়াংরা বিশ্বাস করে।

খ. ম্রো লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কার

১. বন-জঙ্গলে হরিণ অবাধভাবে বিচরণ করে থাকে। অনেক সময় হরিণ কোনো হিংস্র জীবজন্তুর আক্রমণে আহত হলে হরিণটি দুর্বল হয়ে পড়ে। তখন হরিণকে মারা সহজ হয়। তবে এ ধরনের আক্রান্ত অসহায় হরিণকে মারা ম্রো সমাজে নিষিদ্ধ রয়েছে। অসহায় আক্রান্ত হরিণ মারলে নাকি অশুভ অমঙ্গল বা আপদ-বিপদ হতে পারে। যদি কোনো কারণে এ ধরনের অসহায় হরিণ মারা হয় তাহলে হরিণ মারার পর ঐ হরিণ নিয়ে যদি গ্রামে ঢোকে তাহলে ঢোকার সাথে সাথে অন্যদের গৃহপালিত পশুপাখির যে কোনো একটি মেরে ফেলতে হয়। অর্থাৎ অন্য আরেকটি অন্যায় কাজ করতে হবে।

এরপর এ অন্যায় কাজের জন্য বিচারসভা আহ্বান করা হয়। অন্যায়কারীকে সেই সভায় জরিমানা দেয়ার মতো অন্যায় করে যার পশু মারা হয় সেই পশুর মালিককে সামান্য জরিমানা দিতে হয়। এর কারণ হলো, বড়ো কোনো বিপদ থেকে মুক্ত হওয়া এবং নিজেকে পরিশুদ্ধ করা। এই কাজ করলে অন্যায় কাজের জন্য পাপ হতে মুক্তি পায় এবং আপদ-বিপদ হতে রক্ষা পায় বলে ম্রোরা বিশ্বাস করেন।

২. ম্রোরা কখনোই হরিণের শাবক লালনপালন করে না। জঙ্গলে কোনো সময় যদি হরিণের বাচ্চার দেখা পায় তাহলে কখনো হরিণের বাচ্চাকে কেউ স্পর্শ পর্যন্ত করে না। হরিণের বাচ্চাকে স্পর্শ করাও কুলক্ষণ বলে ম্রোরা মনে করে। কেউ যদি হরিণের শাবক ঘরে নিয়ে আসে তাহলে সেই গ্রামের অশুভ-অমঙ্গল হয় এবং পাড়ায় কোনো দুর্ঘটনা বা আপদ-বিপদ হবে বলে ম্রোদের ধারণা। রুমা উপজেলার সিংলক পাড়াবাসী আমাই ম্রো গত ২০১০ সালে জঙ্গলে বাঁশ কাটার সময় মা হারানো একটি হরিণের শাবক খুঁজে পায়। সেই হরিণ শাবকটিকে ঘরে নিয়ে আসার পথে বলিপাড়া বিজিবি ক্যাম্পে সে ধরা পড়ে যায় এবং তাকে বেশ শাস্তিও পেতে হয়। যা হরিণের শাবক ধরার ফল বলে আমাই ম্রো জানিয়েছেন। এই বিশ্বাসটুকু ম্রো সমাজে খুবই প্রচলিত।

৩. শিকার বিষয়ে কিছু বিশ্বাস : (ক) ধনেশ পাখির বাচ্চা প্রজননের সময় ম্রো আদিবাসীরা ধনেশ পাখি শিকার করে না। ধনেশ পাখিরা সাধারণত মার্চ থেকে এপ্রিলে বাচ্চা প্রজনন করে থাকে। এ সময় স্ত্রী ধনেশ পাখিটি ডিম দেওয়ার পর গাছের গর্তের ভেতর ডিমে তা দিতে থাকে। যে সময় স্ত্রী ধনেশ পাখিটি ডিমে তা দিতে থাকে তখন গর্তের মুখ মাটি দিয়ে লেপে দেয় পুরুষ পাখিটি। শুধু স্ত্রী পাখিটির ঠোঁট বের করে রাখতে পারে এইমতো করে একটা ফাঁকা জায়গা রাখা হয়, যা দিয়ে পুরুষ পাখিটি স্ত্রী পাখিটিকে খাবার দিয়ে থাকে। এ সময় শুধু পুরুষ পাখিটিকে দেখা যায়। ডিম থেকে বাচ্চাগুলো যখন ফুটে বের হয় তখন পুরুষ পাখিটি বাচ্চা ও স্ত্রী পাখিসহ সবাইকে খাবার দিয়ে থাকে। বাচ্চা বড়ো হলে মা পাখিটি বাচ্চাদেরকে নিয়ে গর্তের বাইরে একসাথে বেরিয়ে আসে। এ সময় পুরুষ পাখিটিকে মেরে ফেললে মা পাখিসহ সব বাচ্চা মারা যাবে। ধনেশ পাখির বাচ্চা প্রজননের সময় পুরুষ পাখিটিকে মেরে ফেললে ধনেশ পাখির পরিবার যেভাবে মারা যায় ঠিক তেমনিভাবে যে ধনেশ পাখিকে মারবে সেই মানুষটির পরিবারও নির্বংশ হয়ে যেতে পারে বলে ম্রোরা বিশ্বাস করে।

(খ) ম্রোরা কোনো বড়ো জীবজন্তু শিকার পেলে যেখানে সে জীবজন্তুকে শিকার করা হয়েছে বা ফাঁদে ফেলা হয়েছে সেখানে একটি লাল রঙের মোরগ ছেড়ে দিয়ে আসতে হয়। উল্লেখ্য যে, গৃহপালিত পশুপাখির যেমন মালিক থাকে ঠিক তেমনি বন্যপশুদেরও কোনো না কোনো মালিক আছে বলে ম্রোরা বিশ্বাস করে। তারা মনে করে জঙ্গলে জীবজন্তুকে লালনপালন ও রক্ষা করে অরণ্যের কোনো না কোনো দেবদেবী। আমরা যদি কারও পালিত পশু মেরে ফেলি তাহলে ঐ পশুর মালিক রাগ করে, বিচার-আচার হয়, এমনকি মালিককে জরিমানাও দিতে হয়। ঠিক তেমনি বন্য পশুপাখি মারলেও ঐ পশুপাখির মালিকরা রাগ করে। তাই মালিক যাতে রাগ না করে তার জন্য মালিকের উদ্দেশ্যে লাল রঙের মোরগ ছেড়ে দিয়ে আসতে হয়। তাতে মালিক খুশি ও সন্তুষ্ট হয় বলে ম্রোদের বিশ্বাস।

৪. যে পাহাড়ে বাদুড় পাখির গর্ত বা সুড়ঙ্গ থাকে সে পাহাড়ে ম্রো আদিবাসীরা জুম চাষ করে না। যে পাহাড়ে বাদুড় পাখির গর্ত থাকে সে পাহাড়ে যে জুমচাষ করে তার পরিবারের সব সদস্য মারা যায় বলে ম্রোদের বিশ্বাস। আর শশ্মানঘাটে ঘরবাড়ি নির্মাণ ও জুমচাষ করলে সংসারে অমঙ্গল হয় এবং নানা ধরনের রোগব্যাধি হয় বলে ম্রোরা বিশ্বাস করে।

৫. গভীর বনে অনেক জায়গায় প্রস্রবণ দেখা যায়। প্রস্রবণ সংলগ্ন পাথরে জমে থাকে প্রাকৃতিক লবণ। এ লবণ জীবজন্তুদের প্রিয় খাবার। শাম্বা হরিণ, বলগা হরিণ ও গয়ালের কাছে এ ধরনের লবণ অত্যন্ত প্রিয়। তাই বেশিরভাগ শিকারি এ ধরনের প্রস্রবণের পাশে বসে সহজভাবে জীবজন্তু শিকার করে থাকে। এ ধরনের প্রস্রবণের পাশে জুমচাষ করা ম্রো সমাজে সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। এসব জায়গায় জুমচাষ করলে গা ফুলা রোগ ও পায়খানা-প্রসাব বন্ধ হয়ে যাওয়া রোগে আক্রান্ত হয় বলে ম্রোদের বিশ্বাস।

৬. জুমে ফসলের চারা অঙ্কুরোদগম হওয়ার আগে জুমের ভেতর কোনো পাখির বাচ্চা স্পর্শ করলে বা ধরে ফেললে ফসলের চারাগুলো অঙ্কুরোদগম হয় না বলে ম্রোরা বিশ্বাস করে। অজান্তে কেউ যদি পাখির বাচ্চা ধরে ফেলে তাহলে সেই ভুল প্রতিকারের জন্য বিশেষ ধরনের পূজা-অর্চনা করতে হয়।

৭. জুমচাষ করতে ম্রোরা কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ রীতিনীতি মেনে চলে। পাহাড়ি ছড়ায় এক প্রকার লাল কাঁকড়া পাওয়া যায়। এ ধরনের কাঁকড়া জুমের জুমঘরে রান্না করলে নাকি তুলার ফল ধরে না। ফল হলেও নাকি খুবই কম ফলন হয়। পাহাড়ে এক ধরনের পাহাড়ি শামুক আছে যেটা শুধু জুমে বা ঝোপঝাড়ে পাওয়া যায়। এ ধরনের শামুক ছড়া ও ঝিড়িতে বাস করে না। এ ধরনের শামুক জুমে রান্না করলে নাকি তিল-তিশি ফল ঝরে পড়ে যায়। আবার জুমঘরে হরিণের মাংস, চেংমাছ, শোলমাছ রান্না করলে নাকি ফসল ভালো হয়না।

৮. ঝিড়ি, ছড়া, নদ-নদীগুলোকে কোনো না কোনো দেব-দেবীই সৃষ্টি করেছে বলে ম্রোরা বিশ্বাস করে। ঝিড়ি, ছড়া, নদ-নদীর জলে পায়খানা প্রসাব করলে পায়খানা প্রসাবকারীর উপর দেব-দেবী প্রচণ্ড রাগ করে; তখন পায়খানা প্রসাবকারীকে অকালে পানিতে ডুবে মৃত্যুবরণ করতে হয় বলে ম্রোরা বিশ্বাস করে।

৯. ম্রো সমাজে কেউ কোনো দুর্ঘটনায় বা অস্বাভাবিকভাবে মারা গেলে বিশেষভাবে নীরবতা পালন করে তার জন্য শোক প্রকাশ করতে হয়। তখন কেউ জুমের কাজে যায় না। শোক পালনের মধ্যদিয়ে পাড়ায় একদিনের কর্মবিরতি রাখতে হয়। এ সময় কেউই গ্রামে কোনো আনন্দ-উল্লাস, হৈচৈ, হাসি-ঠাট্টা করতে পারবে না। কোনো প্রকার বাজনা বা বাঁশি বাজাতে পারবে না। দুর্ঘটনায় মৃত্যুবরণকারী গোত্রের লোকেরা যতক্ষণ মৃতদেহের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন না করবে ততক্ষণ কোনো তরকারি দিয়ে খাবার খেতে পারবে না। এ সময় শুধু লবণ দিয়ে পান্তাভাত খেতে পারবে। তরকারি দিয়ে খাবার গ্রহণ করলে পুরা গোষ্ঠীর লোকেরাই আরও দুর্ঘটনায় মারা যাবে বলে ম্রোদের বিশ্বাস। আর সে সময় কেউ যদি জুমে কাজ করতে যায় তাহলে নীরবতা ভঙ্গ হবে এবং গ্রামের অশুভ ও অমঙ্গল হবে বলে ম্রোরা বিশ্বাস করে।

১০. শশ্মানকে ম্রোরা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সমতুল্য পবিত্রস্থান বলে মনে করে। মৃতদেহ দাহ করার পর মৃতব্যক্তির আত্মার অবস্থানের জন্য চিতার পাশে একটি বিশেষ ঘর তৈরি করা হয়। মানুষের বাড়িতে যেসব জিনিসপত্র সাধারণত ব্যবহার করা হয়ে থাকে সেসব জিনিসপত্র সেই ঘরে সাজিয়ে রাখা হয়। মৃত্যুর পর মানুষের আত্মা আত্মীয়-স্বজনদের গর্ভে পুনর্জন্মগ্রহণ করে। নির্দিষ্ট কারও গর্ভে জন্মের আগে এক সপ্তাহ ধরে এ আত্মা শশ্মানের পাশের ঘরে অবস্থান করে। তাছাড়া সমাজপতি থেকে শুরু করে সকল শ্রেণির লোককে এ শশ্মানে দাহ করা হয়। তাই শশ্মানে কোনোভাবেই পায়খানা প্রসাব করা যাবে না। অজান্তে কেউ যদি তা করে থাকে তাহলে শশ্মান অপবিত্র হওয়ার কারণে শশ্মানকে পবিত্র করার জন্য ধর্মীয় পুরোহিতদের নিয়ে শশ্মানের পবিত্রতা পু-নরায় আনয়ন করতে হয়। শ

১১. গ্রামের মধ্য দিয়ে যদি কোনো হরিণ অথবা বনমোরগ ঢুকে চলে যায় তাহলে ঐ গ্রামে অমঙ্গল হয়। গ্রামবাসীদের বিপদ-আপদ হয় ও মামলা-মোকদ্দমা হয়। গ্রামে রোগব্যাধি হয় ও মহামারী, দুদিন-দুর্বিপাক আসে বলে ম্রোরা বিশ্বাস করে।

গ. চাকমা লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কার

চাকমারা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী হলেও তাদের মাঝে হিন্দু ধর্মের কিছু প্রভাব লক্ষণীয়। কিছু কিছু দেব-দেবী পূজা তাদের মধ্যে প্রচলিত রয়েছে। তবে বর্তমানে এসবের প্রচলন কম হলেও প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে এখনো ঐসব পালন করতে দেখা যায়। সেগুলো নিম্নে তুলে ধরা হলো :

১. ভাত-দ্যা পূজা : পূর্ব-পুরুষের আত্মার সদগতি কামনা করে এবং মৃত্যুর পর কে কোথায় পুনর্জন্ম নিলেন তা নির্ণয়ের জন্য এ ভাত-দ্যা পূজার আয়োজন করা হয়। এটি এক ধরনের গোত্রপূজা। বিগত শতকের চল্লিশের দশকেও পার্বত্য চট্টগ্রামে এই ভাত-দ্যা পূজা প্রচলিত ছিলো। বর্তমানে এ ভাত-দ্যা পূজা প্রায় বিলুপ্ত হয়ে গেছে বলে বলা চলে।

২. থানমানা : চাকমাদের পূজার মধ্যে থানমানা পূজা সবচেয়ে বড়ো পূজা। প্রতিবছর গ্রামে গ্রামে থানমানা পূজার আয়োজন করা হয়। গ্রামবাসী সবাই মিলে পরিবার পিছু একটি মোরগ বা মুরগি এবং তার সঙ্গে প্রয়োজন মতো চাল ও টাকা পূজার উদ্দেশ্যে দান করে। গ্রামের মঙ্গলের জন্য বাস্তুদেবতা 'থান'কে এই পূজা দেওয়া হয়। এ পূজা সাধারণত গ্রামের নদীতীরে আয়োজন করা হয়। এ পূজায় ১৪জন দেব-দেবীকে পূজা দেওয়া হয়। এই পূজা দেওয়া হলে গ্রামবাসীদের শুভ ও মঙ্গল হয় বলে চাকমা আদিবাসীরা বিশ্বাস করে।

৩. বুরপারা : 'বুরপারা' শব্দের আক্ষরিক অর্থ 'ডুব দেওয়া'। 'মাদাদোনা' এর অর্থ মাথা ধোয়া। স্থানভেদে কেউ বুরপরা, কেউ মাদাদোনা বলে। এর প্রকৃত অর্থ হচ্ছে 'ওঝাদের দ্বারা ঘিলা, কোজোই, ইঝিং সোনা ও রূপা ধৌত মন্ত্রপুতপানি দিয়ে মাথা ধুয়ে বিপদ-আপদ থেকে পরিত্রান পাওয়া ও পরিশুদ্ধ হওয়া। চাকমা পরিবার যখন মনে করে যে, কোনো কারণে তার 'ফী-বলা' অর্থাৎ বালা-মুছিবত বা

আপদবালাই উৎপন্ন হয়েছে, তখন এই বিশেষ প্রক্রিয়ায় পরিবার-পরিজন সকলে পরিশুদ্ধ হয়ে থাকে। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে সমষ্টিগতভাবে একই গোষ্ঠীভুক্ত লোকজনকে এভাবে পরিশুদ্ধ হতে হয়। তা না করলে পরিবার ও গোষ্ঠীর মধ্যে অমঙ্গল হয় বলে চাকমারা বিশ্বাস করে।

৪. টাবু বা খুমা : চাকমা ভাষায় 'টাবু' শব্দটি হলো 'খুমা'। কোনো গোষ্ঠীতে যদি কোনো 'টাবু' প্রচলিত থাকে তবে সেই গোষ্ঠীর সব লোক তা মেনে চলে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, লারমা গঝার 'চার্জ্যা' গোষ্ঠীর লোকদের মধ্যে উনুনশালে (রান্না ঘরে) একত্রে তিনটি চুলা তৈরি করা নিষেধ। বোর্বুয়া গঝার নাদুকতয়া গোষ্ঠীর লোকদের মধ্যে মিষ্টি কুমড়ার চারা রোপণ করা নিষেধ ইত্যাদি। বাবুরা গঝার গোঝল্যা গুত্থির লোকেরা 'কালা হেরা কচু' (এক প্রকার কচু) রোপণ করতে পারে না। এসব তাদের প্রচলিত লোকবিশ্বাস।

ঘ. চাক লোকবিশ্বাস 'পূজা-হেক্কা'

চাক সম্প্রদায়ের বিশ্বাস অনুসারে যে কোনো শুভ কাজের জন্য মানত করে থাকেন। যেমন ছেলেমেয়েদের শিক্ষায় উন্নতি লাভ, চাকুরিতে সফলতা, জুমের ফসল যেন বন্যপ্রাণী ও পোকামাকড়ে নষ্ট না করে, সংসারে মঙ্গল হয় ইত্যাদিতে। এ মানতকে চাক ভাষায় বলে 'পূজ হেক্কা'। বাংলাদেশে সর্বত্রই মানতের প্রচলন রয়েছে। এখানে অনগ্রসর জনপদে বসবাসকারী চাক সম্প্রদায়ের পূজ হেক্কার উপর আলোকপাত করা হলো, যা বাস্তবেই করা হয়ে থাকে। পূজ হেক্কার মানতকার্য সম্পাদন করা হয় খাল/ছড়ার পানির কাছাকাছি। পূজ হেক্কাতে প্রয়োজন হয় প্রথমে ৯-১০ ইঞ্চি লম্বা দুটি বাঁশের চোঙা যার উপরের মাথার গিট কেটে সরু করা হয়। চোঙার উপরের আবরণ পাতলা করে নিচ থেকে উপরের দিকে সরু ও পাতলা করে বাকল উঠানো হয় ও পরে পছন্দমতো প্রাপ্ত ফুল প্রবেশ করানো হয়। আর বাঁশের সরু চোঙার অপর মাথার গিঁট কেটে তা সোনালি র‍্যাপিং পেপার দিয়ে মোড়ানো হয়। বাঁশের চোঙা দুটি এক বিয়ৎ (নয় ইঞ্চি) দূরে দূরে একটু কাত করে কাঁদামাটির ভেতর পুঁতে দিতে হয়। চোঙার মাঝখানে কলাগাছের কাঁচা পাতা রেখে তাতে ভাত রাখা হয় এবং ভাতের উপর দুটি কাঁচা ডিম রেখে দিতে হয়। তারপর এক হাত লম্বা দুটি খুঁটি উক্ত চোঙার পাশাপাশি মাটিতে বাঁকা করে পুঁতে দিয়ে বাঁশের খুঁটির মাথায় সাদা সুতার দু'-তিনটি পেচ দিয়ে গিঁট মেরে দিতে হয়। এরপর উদ্দেশ্য হাসিলের লক্ষ্যে পূজ হেক্কার মানত করা হয়। এ কাজটি গোপনে/ আনুষ্ঠানিকভাবে /প্রকাশ্যে দিনে কিংবা রাতে সম্পাদন করা যায়।

ঙ. পাংখোয়া লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কার

১.পাংখোয়ারা বিশ্বাস করে যে, মানুষ সর্বপ্রথম যেখান থেকে বেরিয়ে এসেছিলো মৃত্যুর পর পুনরায় সেখানে চলে যায়। তারা মনে করে যে, সেটাই মৃত্যুব্যক্তিদের দেশ। কিন্তু যদি তারা সেখান থেকে ফিরে আসতে চায় এবং অনেক কান্নাকাটিও করে তথাপি তারা সেখান থেকে ফিরে আসতে পারে না যদি তারা এই পৃথিবীতে খারাপভাবে জীবনযাপন

করে। তবে যদি তারা পৃথিবীতে বসবাসের সময় ভালো কাজ করে এবং ভালোভাবে জীবনযাপন করে তাহলে 'খোজিং' তাদেরকে একটা নতুন দেহ দিয়ে পৃথিবীতে ফেরৎ পাঠাতে পারে।

২. সমাজে কেউ যদি কোনো অপরাধ করে থাকে, তাহলে দা, বর্শা, বন্দুক এবং রক্তকে সাক্ষী রেখে শপথ করানো হয়। বিশ্বাস রয়েছে যদি কেউ শপথকে অবজ্ঞা করে তাহলে সে নিজে এবং তার পরিবারের লোকজনের নিশ্চিত মৃত্যু ঘটবে। যদি গ্রামে কোনো জিনিস চুরি হয় তাহলে পাড়ার প্রধান হেডম্যান/কারবারির বর্শাকে সাক্ষী রেখে শপথ করানো হয়। পাড়ার প্রধানের বর্শাটা মাটিতে বিদ্ধ করে রাখা হয় এবং যারা সেটাকে অতিক্রম করে যায় তাদেরকে সেটা স্পর্শ করতে হয়। এভাবে বর্শা স্পর্শ করে সংঘটিত ঘটনা সম্পর্কে কিছুই জানে না বলে তাকে শপথ করতে হয়। যে এভাবে শপথ করার সাহস করে না, যা কিছু হারিয়েছে তার জন্য তাকেই জবাবদিহি করতে হয় এবং তাকেই দোষী সাব্যস্ত করা হয়।

পাংখোয়া সমাজে আরও অনেক লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কার রয়েছে। এখানে কিছু উদাহরণ দেওয়া হলো :

১. স্বপ্নে মানুষের লাশ দেখলে পরের দিন শিকারে গেলে শিকার পাওয়া যায়।
২. স্বপ্নের মধ্যে পাকা কলা খেলে পরের দিন মাংস খেতে পায়।
৩. স্বপ্নের মধ্যে পাঁকা কাঁঠাল খেলে পরের দিন মাংস খেতে পায়।
৪. স্বপ্নের মধ্যে ঘোলা পানি তুলতে দেখলে অসুখ-বিসুখ হয়।
৫. শিকারে বের হওয়ার আগে ভাত বা তরকারি রান্নার সময় নাড়ানি দিয়ে নেড়ে দেয়ার সময় তা ভেঙে গেলে বিপদ হয়।
৬. স্বপ্নে পরিষ্কার পানি তুলতে দেখলে রোগ থেকে মুক্তি পায়।
৭. মধ্যরাতে পাড়ায় মোরগ ডাক দিলে ধরে নেয়া হয় যে, কোনো অবিবাহিত মহিলার পেটে অবৈধ সন্তান ধারণ করেছে।
৮. মধ্যরাতে জংলি মোরগের ডাক শুনে যদি পাড়ার মোরগ সেই ডাকে সাড়া দেয় তাহলে পাড়ায় কোনো বড়ো অতিথির আগমন হবে অথবা পাড়ার শুভলক্ষণ হিসেবে ধরে নেয়া হয়।
৯. কেউ যদি স্বপ্নে চাল দেখে তাহলে তার আয়ু বাড়ে।
১০. কেউ যদি স্বপ্নে মাছ দেখে তাহলে সে টাকা পায়।
১১. কেউ যদি স্বপ্নে মানুষের বিষ্ঠা খায় তাহলে সে তাজা মাংস পায়।
১২. স্বপ্নে হাতি দেখলে কাজে সাফল্য লাভ করে।
১৩. লাউ, শশা, মিষ্টিকুমড়া ও চালকুমড়া বা লতাজাতীয় গাছের ফল মহিলারা গর্ভবতী অবস্থায় খেতে পারে না। কারণ, বাচ্চা যদি পুত্রসন্তান হয় তাহলে সেই সন্তান বড়ো হয়ে শিকার করলে সে সময় তার পায়ে লতা প্যাঁচাবে। এই ভয়ে পাংখোয়া গর্ভবতী নারীরা কোনো লতাজাতীয় ফল খায় না।

১৪. গর্ভবতী মহিলাকে বেগুন তরকারি খেতে মানা করা হয়। কারণ, বেগুন খেলে নাকি বাচ্চার মুখে দাগ হয়। আনারসও খেতে দেয়া হয় না। আনারস খেলে নাকি বাচ্চার চুল কুঁকড়ানো হবে। কলার থোড় (কলা মোচা) গর্ভবতী মাকে খেতে দেয়া হয় না। কলার থোড় খেলে নাকি বাচ্চাটির মাথা কলার থোড়ের মতো লম্বা হয় আর ডিম খেলে নাকি বাচ্চার মাথা গোল হয়।

চ. ত্রিপুরা লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কার (খাথৈম : সাই : ম)

১. অল্প বয়সীদের লাউ, তেঁতুল বীজ, নারিকেল চারা, সুপারি চারা রোপণ/বপন করা নিষেধ।

২. ছেলেমেয়েদের ঘরের মাঝখানে পিতার ঘর তোলা আর জুমচাষ করা যাবে না।

৩. স্বামী-স্ত্রীর মাঝখানে কোনো লোক বসতে পারেনা।

৪. যাত্রাপথের সামনে পশুপাখি প্রদক্ষিণ করা অমঙ্গলের লক্ষণ।

৫. যাত্রাপথে খালি কলসি দেখা অমঙ্গলের লক্ষণ।

৬. সম্বন্ধি (স্ত্রীর বড় ভাই) সম্পর্কীয় লোকের সাথে হাত মেলানো/বিভিন্ন দ্রব্যাদি দেওয়া-নেওয়া করা যাবে না।

৭. কোনো অতিথি ঘরের প্রথম দরজা দিয়ে ঢুকে বা প্রবেশ করে সাথে সাথে শেষ দরজার বারান্দা গিয়ে প্রসাব করা যাবে না।

৮. যে কোনো ঘরে ঢুকে 'বখৌ' (এক প্রকার ঝুড়ি, যেখানে ত্রিপুরারা গুরুত্বপূর্ণ জিনিসপত্র, দলিল-দস্তাবেজ, টাকা-পয়সা, অলংকারাদি রাখে) খোলা নিষেধ।

৯. রাতে চুল আঁচড়ানো, কাপড় বুনা, সেলাই করা নিষেধ।

১০. দরজা-জানালা দিয়ে মুখে পানি নিয়ে কুলি করা অমঙ্গল।

১১. চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণের সময় গর্ভবতী মহিলাদের তরকারি কাটা নিষেধ।

১২. দুধের শিশুর মা অন্ধকারে বাইরে যাওয়া নিষেধ।

১৩. ঢালু জমি কিংবা পানির উৎসস্থানে লাল ফেনা ও ভেজা মাটিকে দেবতার বাসস্থান বলে বিশ্বাস করে পূজা করতে হয়।

১৪. যাত্রাপথে মৃত ব্যক্তি, মৃত পশুপাখি দর্শন অমঙ্গল।

১৫. রাতে ঘর ঝাড়ু দেওয়া অমঙ্গল।

ছ. খুমী লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কার

১. ঘরের জানালা দিয়ে ওঠানামা করলে অসুখ-বিসুখ হয়।

২. ভাত খাওয়া অবস্থায় উঠে গিয়ে মলত্যাগ করলে গরিব হয়।

৩. ভাত খাওয়ার সময় গান গাইলে গরিব হয়।

৪. বুড়োবুড়িকে অকথ্য কথা বললে বা গালি দিলে অভিশাপ পায়।

৫. পানিতে প্রসাব করলে রোগব্যাধি হয়।

৬. অন্যকে তিরস্কার করলে নিজের কাছে ফিরে আসে।

৭. বাড়ি থেকে বাহির হয়ে বাড়িতে ফিরে এসে রাত না কাটিয়ে অন্য পাড়াতে গেলে অসুখ হয়।
৮. নারীদের পরনের কাপড়ের নীচ দিয়ে গেলে অমানুষ হয়।
৯. বড়োদের সাথে তর্ক/অমান্য করলে অভিশাপ পায়।
১০. হাতের তালু চুলকালে অর্থপ্রাপ্তি হয়।
১১. পা চুলকালে আঘাত পায়।
১২. স্বপ্নে মারমা লোক দেখলে জুমে তুলা ফলন ভালো হয়।
১৩. স্বপ্নে ভাত খেতে দেখলে বাস্তবে কষ্ট পায়।
১৪. স্বপ্নে মদ্যপান করলে রোগী হয়।
১৫. স্বপ্নে আগুন দেখলে যে কোনো ব্যক্তির সাথে ঝগড়া হয়।
১৬. স্বপ্নে বন্দুক/অস্ত্র দেখলে বিচারে জয়লাভ করে।
১৭. স্বপ্নে পাখি দেখলে লজ্জা পেতে হয়।
১৮. স্বপ্নে পয়সা/রূপার মুদ্রা দেখলে গায়ে দাউদ রোগ হয়।
১৯. স্বপ্নে মাছ দেখলে অর্থপ্রাপ্তি হয়।
২০. স্বপ্নে কুকুর দেখলে গ্রামে ভূতপ্রেত ঢুকে।
২১. স্বপ্নে ধান দেখলে মন খারাপ হয়।
২২. স্বপ্নে পাকা ফল খেলে মাংস খেতে পায়।
২৩. প্রস্রবণের জায়গায় জুম কাটা নিষেধ। কাটলে পরিবারের সদস্য মারা যায়।
২৪. স্বপ্নে কাকের মাংস খেলে কুষ্ঠরোগ হয়।
২৫. স্বপ্নে নৌকা চড়ে উজানে গেলে আয়ু কমে।
২৬. স্বপ্নে লম্বা চুল দেখলে আয়ু বাড়ে।

জ. বম লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কার

১. বহমান নদীতে মলমূত্র ত্যাগ অতিশয় গর্হিত কাজ। পাহাড়ি নদী/ছড়া উঁচু পর্বত থেকে নীচের দিকে অর্থাৎ জলপ্রপাত সৃষ্টি হয়ে জল বাষ্পীয় আকারে বিলীন হয়ে যায়। বহমান নদীতে মলমূত্র ত্যাগ করলে মানুষের আত্মাও নিরুদ্দিষ্ট হয়ে বিলীন হয়ে যায়। এই বিশ্বাসে বমরা বহমান নদীতে মলমূত্র ত্যাগ করে না।
২. কারও দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করা অতিশয় অসৌজন্যমূলক আচরণ। যার দিকে আঙ্গুল দেখানো হলো তিনি ভুল বুঝতে পারেন অথবা অন্য অর্থ হতে পারে তার কাছে। তাই কারও দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ নিষেধ।
৩. কারও দিকে বিশেষ করে প্রবীণদের দিকে পা লম্বা করে বসা অতি অসৌজন্যমূলক আচরণ। যাকে বমরা বেয়াদবি মনে করে।
৪. দুই মহিলার মধ্যে হাতাহাতি/ধরাধরি হলে কোনো পুরুষলোক সেখানে গিয়ে তাদের মারামারি/হাতাহাতি খালি হাতে ছাড়িয়া দিতে/বাঁধা দিতে/থামাতে যাওয়া

বম সমাজে বিধেয় নয়। ধান ভাঙার জন্য যে কাষ্ঠদণ্ড ব্যবহৃত হয় সেটি দিয়ে হাতাহাতিরত দুই নারীকে ছাড়াতে হবে।

৫. স্বামী-স্ত্রী একত্রে হাঁটলে স্ত্রী অবশ্যই স্বামীর আগে হাঁটবেন। এতে পুরুষের/স্বামীর মানহানি বা অসম্মানের কিছু নেই। স্ত্রী, পুত্র-কন্যাকে সামনে রাখার যুক্তি হলো এই যে, কোনো আচমকা বিপদ উপস্থিত হলে পুরুষ/স্বামী সাথে সাথে দেখতে পাবেন এবং তাদের সুরক্ষার জন্য যথাযথ ভূমিকা রাখতে পারবেন। অপরদিকে অবলা নারী শিশুসন্তানসহ পিছনে থাকলে স্বামীর আক্রমণকারীকে আগেভাগে দেখতে পাবে না। তাই বম সমাজে স্বামী-স্ত্রী একত্রে হাঁটলে স্ত্রীরা সামনে হাঁটে।

৬. স্বপ্নে গোলাভরা ধান দেখা অশুভ। নিকট আত্মীয়দের মৃত্যুর সংবাদ আসতে পারে।

৭. হাতের তালু চুলকালে অথবা চোখের পাতা টানলে/কাঁপলে অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকে।

ঝ. মারমা লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কার

১. **ক্ষ্যংসামা (ক্ষ্যংনাইক) পূজা :** কোনো খাল, ছড়া বা নদীতে ছাগল, মুরগি, কবুতর ইত্যাদি বলি দিয়ে ছড়া, খাল বা নদীর দেবতাকে সন্তুষ্ট করার জন্য এই পূজা করা হয়। তাতে মারমারা মনে করে তাদের পরিবারে সুখশান্তি আসে।

২. **চুংমাংলী (ঘর রক্ষক দেবতা) পূজা :** বাড়িতে বাড়ির গৃহকর্তার অবস্থানকারী কক্ষে এই পূজা করা হয়। এক আড়ি ধান, মোরগ অথবা মুরগি, পাঁইপোয়ে (বাঁশ দিয়ে তৈরি বিভিন্ন ধরনের ফুল ও সাজানোর উপকরণ) হলো এই পূজার মূল উপকরণ। সাধারণত বছরে একবার এই পূজা করা হয়। এই পূজা করলে পরিবারে সুখশান্তি বজায় থাকে বলে মারমারা বিশ্বাস করে।

৩. **ইংনাইক পূজা :** চুংমাংলী পূজার পরই ইংনাইক পূজা করা হয়। এই পূজার উপকরণ ছাগল অথবা শূকর। এই পূজায় প্রতিবেশীকে নিমন্ত্রণ করে খাওয়ানো হয়। এই পূজা করলে পরিবারে সুখশান্তি হয় বলে মারমাদের বিশ্বাস।

৪. **অবঙমাহ্ পোয়ে (ছদয়হ্ পোয়ে) :** মুরগিই এই পূজার প্রধান উপকরণ। জুমে এই পূজা করা হয়। জুমের ফসলের ভালো ফলন হওয়ার জন্যই এই পূজা করা হয়ে থাকে। এই পূজাতেও অন্য মানুষদেরকে খাওয়াতে হয়।

৫. **টংনাইক পোয়ে (পাহাড় দেবতা পূজা) :** পাহাড়ের পাদদেশে একটি মোরগ বলি দিয়ে এই পূজা করতে হয়। পাহাড় থেকে বাঁশগাছ আহরণ করতে পাহাড় দেবতা যাতে আহরণকারীকে আপদ-বিপদ হতে রক্ষা করে তার জন্য এ পূজা করা হয়।

৬. বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় কেউ যদি দরজায় কোনো ধরনের ধাক্কা খায় তাহলে সে যাত্রায় অশুভ এবং অমঙ্গল হয় বলে মারমারা বিশ্বাস করে। তারা মনে করে, এই অশুভ সংকেত কাটানো বা মুছানোর জন্য কিছুক্ষণ আবার ঘরে বসে থাকতে হয়। এরপর ঘর থেকে বের হলে যাত্রা মঙ্গল ও শুভ হয় বলে মারমারা বিশ্বাস করে।

৭. যাত্রার সময় কোনো খালি কলসি দেখলে যাত্রা অশুভ হয় বলে মারমারা মনে করে।

৮. যাত্রার সময় কোনো মহিলাকে চুল খোলা অবস্থায় দেখলে যাত্রা অশুভ হয়।

৯. যাত্রার সময় যদি কোনো মহিলাকে কোমরের উপর বুক এবং গলা পর্যন্ত 'থ্বিং' (মেয়েদের লুঙ্গি) পরা অবস্থায় দেখে তাহলে যাত্রা অশুভ হয়।

১০. যাত্রার প্রাক্কালে কোনো প্রাণীকে হত্যারত অবস্থায় দেখলে যাত্রা অশুভ বা অমঙ্গল হয়।

১১. যাত্রাকালে কোনো পাখির বিষ্ঠা যদি মাথায় পড়ে তাহলে অমঙ্গল হয়।

১২. কুকুর যদি স্বাভাবিক ডাক ছাড়া একটানে অস্বাভাবিকভাবে দীর্ঘক্ষণ ধরে কু-উ-উ-উ শব্দ করে ডাকে তাহলে তা অশুভ লক্ষণ বা সংকেত।

১৩. কোনো কুটুমপাখি যদি ঘরের আশপাশে কমপক্ষে পর পর তিনবার ডাকে তাহলে ঘরে অবশ্যই অতিথির আগমন হয় বলে মারমারা বিশ্বাস করে।

১৪. বন বা জঙ্গলের বানর কিংবা গুইসাপ যদি কারও ঘরে ঢুকে তাহলে সে ঘরের অমঙ্গল বা বিপদ হয়।

১৫. পাহাড়ের কোনো পাড়ার ঠিক মধ্যখান দিয়ে যদি কোনো বনমোরগ উড়াল দিয়ে সেই পাড়া পার হয়, তাহলে অবশ্যই ঐ পাড়ার বিপদ কিংবা ক্ষতি হবে বলে মারমারা বিশ্বাস করে।

১৬. **রোয়াসাং নাইক (পাড়ারক্ষক দেবতা পূজা) :** ফুল-ফলসহ বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্য দিয়ে এই পূজা করা হয়। এই পূজা করা হলে পাড়ারক্ষক দেবতা পাড়াকে ভালোভাবে রক্ষা করে বলে মারমাদের বিশ্বাস।

১৭. **ক্ষ্যংফু (ছড়া বা খাল রক্ষাকারী দেবতা) পূজা :** ছড়া, খাল ও নদীর দেবতাকে খুশি রাখার জন্য ছড়া, খাল বা নদীতে বাঁশের তৈরি মাচাংএ বিভিন্ন ফল-ফুল ও খাদ্যদ্রব্য দিয়ে এই পূজা করা হয়। এরফলে খাল, ছড়া বা নদী আশপাশের মানুষকে ঐ দেবতা রক্ষা করে বলে মারমাদের বিশ্বাস।

১৮. **রোয়াখাং পোয়ে (পাড়া বন্ধ) :** পাড়ায় যাতে বাইরের কোনো অশুভ শক্তি প্রবেশ করতে না পারে তার জন্য পাড়া রক্ষাকারী দেবতাকে সন্তুষ্ট করতে এই পূজা করা হয়। এই পূজার ফলে পাড়ার লোকেরা বাইরের ক্ষতিকর অশুভ শক্তির হাত থেকে রক্ষা পায় বলে মারমাদের বিশ্বাস।

১৯. মারমা সমাজে কোনো মানুষ মারা গেলে ছোটো একটি বাঁশের চোঙায় কিছু চাল ভরে নিয়ে সেই মরা মানুষের কানের পাশে ঐ বাঁশের চোঙাটিকে কয়েকবার নাড়ানো হয়। যাতে ঐ নাড়ানোর শব্দ মৃতব্যক্তির কানে ঢুকে। কোনো কারণে যদি মানুষটি প্রাণে বেঁচে থাকেন তাহলে তিনি ঐ নাড়ানোর শব্দে সাড়া দেবেন বলে মারমারা বিশ্বাস করে।

২০. **কুংখ্যো :** মারমা সমাজে কোনো লোক মারা গেলে বাঁশ থেকে তোলা একটি বেত দিয়ে ঐ মৃতদেহের মাথা থেকে পা পর্যন্ত (আপাদমস্তক) মেপে নিয়ে মৃতব্যক্তির পরবর্তী জন্মের আয়ুকাল নির্ণয় করা হয়। বাঁশের বেতটিকে এক নিঃশ্বাসে ভেঙে ভেঙে ভাঁজ করে ঐ পরীক্ষাটি করা হয়। ঐ আয়ুকাল নির্ণয়ে এক নিশ্বাসে বেতটিকে ভেঙে যতবার ভাঁজ করা হয়েছে মৃতব্যক্তিটি পরবর্তী জন্মে ততবছর বাঁচবেন বলে মারমারা বিশ্বাস করেন। আর বেতটিকে ভেঙে ভাঁজ করার সময়

বেতটির কোনোস্থানে ভেঙে গেলেও বেতটি বিচ্ছিন্ন না হয় বা একেবারেই ছিঁড়ে না যায় তাহলে বেতের যেখান থেকে ভাঁজ করা শুরু সেখান থেকে যেস্থানে এই অবস্থা হয়েছে সেখান পর্যন্ত কয়টি ভাঁজ হয়েছে তা গুনে দেখে মৃতব্যক্তিটি পরবর্তী জন্মে ততবছর বয়সে যে কোনো বিপদে বা জীবন ঝুঁকিতে পড়বে বলে মারমাদের বিশ্বাস।

২১. পূর্ণিমা এবং অমাবস্যা তিথিতে কোনো লোক মারা গেলে তাকে ঐদিনেই সৎকার করতে হয়। নতুবা ঐ মৃতব্যক্তিকে ঘরে বা পাড়ার মধ্যে না রেখে পাড়ার বাইরে কিংবা শ্মশানে রাখতে হয়। ঐ মৃতদেহকে ঘরে বা পাড়ায় রাখলে ঘরের মানুষের এবং পাড়ার অমঙ্গল হবে বলে মারমারা বিশ্বাস করে।

২২. কোনো কারণে যদি কোনো লোক পাড়ার বাইরে মারা যায় তাহলে ঐ মৃতব্যক্তিকে পাড়ায় বা ঘরে ঢুকানো যায় না। ঐ মৃতদেহকে শ্মশানে বা পাড়ার বাইরে রাখতে হয়। ঐ মৃতদেহকে ঘরে বা পাড়ায় রাখলে ঘরের মানুষের এবং পাড়ার অমঙ্গল হবে বলে মারমাদের বিশ্বাস।

লোক্‌প্রযুক্তি

ক. আদিবাসীদের তাঁত বুননযন্ত্র

কোমরের সাথে বেঁধে নিয়ে বুনা হয় বলে আদিবাসীদের তাঁতকে কোমরের তাঁত বলা হয়। প্রতেক আদিবাসীদের এই কোমর তাঁতের নিজস্ব নাম আছে। সাধারণত নারীরাই আদিবাসী সমাজে কোমর তাঁতে কাপড় বয়ন করে থাকে। একটি কোমর তাঁতের দৈর্ঘ্য সাধারণত ৮-৯ হাত এবং প্রস্থ আড়াই হাত হয়ে থাকে। এই তাঁত টানানোর জন্য আলাদাভাবে কোনো ঘরের প্রয়োজন হয় না। ঘরের উঠানে খোলা জায়গায় অথবা ঘরের ভেতরে খোলা স্থানে বাঁশের সাথে তাঁতকে ঝুলিয়ে টান টান করে কাপড় বয়ন করা যায়। সব আদিবাসীর তাঁতের সরঞ্জামাদি প্রায় একই ধরনের এবং বুনন পদ্ধতিও প্রায় একই রকম। তবে প্রত্যেক আদিবাসীর কাপড়ের শৈল্পিক বৈশিষ্ট্য ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। গাছ, বাঁশ, সজারুর কাটা, পশুর চামড়া, হাড় ইত্যাদি দ্বারা কোমর তাঁতের উপকরণ তৈরি করা হয়। প্রত্যেক আদিবাসীর নিজ নিজ নামে কোমর তাঁতের সরঞ্জামাদির নামকরণ লক্ষ্য করা যায়। এখানে বিভিন্ন আদিবাসীদের নামকরণকৃত কোমরতাঁতের সরঞ্জামাদির বর্ণনা করা হলো :

১. তাগলক : বুননে শক্তভাবে কোমর তাঁতকে ধরে রাখার জন্য এই তাঁতের সরঞ্জাম ব্যবহার করা হয়। এ সরঞ্জামকে চাকমারা তাগলক, ম্রোরা সংখক নামে অভিহিত করে। ইহা বাঁশের তৈরি এবং এর দুই প্রান্তে খাঁজকাটা থাকে। এই খাঁজকাটায় রশি বেঁধে কোমরের সাথে বাঁধা হয়। যাতে তাঁতটি সম্পূর্ণরূপে টান টান থাকে।

২. সিনচা : সিনচা হলো ম্রো ভাষা। কোমর তাঁতে কাপড় বুনার সময় এই সিনচা ব্যবহার করা হয়। এটি তাঁতে ঢুকিয়ে দিলে তাঁতের সুতাগুলোর ওঠানামা করতে সুবিধা হয়। এটি ছোটো বাঁশ অথবা বাঁশের কঞ্চি দিয়ে তৈরি করা হয়। চাকমরারা তাঁতের এ সরঞ্জামকে 'লেললেবি' বলে।

৩. তারাম : ইহা বাঁশের তৈরি এক প্রকার তাঁতের সরঞ্জাম। এর দুই প্রান্ত সুচালো থাকে। কোমর তাঁতকে বয়নের সময় সোজা ও সমান রাখার জন্য এই তারাম ব্যহবহার করা হয়। তারাম হলো চাকমা ভাষা। ম্রোরা তাঁতের এই সরঞ্জামকে 'পুন' বলে।

৪. বিয়ং : আদিবাসীদের বয়ন শিল্পে এটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় তাঁতের সরঞ্জাম। এই বিয়ংয়ের দ্বারা কাপড়কে মসৃণ ও মজবুত করা যায়। একটার পর একটা সুতা ঘন করে বুনতে এ বিয়ং দিয়ে সজোরে ধাক্কা দিতে হয়। প্রতিবারই বিয়ংকে তাঁতের মধ্যে ঢুকিয়ে পুনরায় বের করতে হয়। এ বিয়ংটি জংলি একপ্রকার পামজাতীয় গাছ অথবা সুপারি গাছ দিয়ে তৈরি করা হয়। ম্রোরা তাঁতের এই সরঞ্জামকে 'পংপাই' বলে।

৫. ব-অ-হাদি : কোমর তাঁতে নীচের সুতাগুলোকে উপরে তুলতে এই ব-অ-হাদি ব্যবহৃত হয়। এগুলো ছোটো ছোটো চিকন বাঁশের দ্বারা তৈরি করা হয়। এর একদিকে চোখা থাকে।

৬. সুচ্চেক বাঁশ : একটি মাঝারি সাইজের মসৃণ বাঁশের একপ্রান্ত চোখা করে এই সুচ্চেক বাঁশ তৈরি করা হয়। তাঁতের উপরের সুতাগুলোকে টেনে তুলে বিয়ংয়ের সাহায্যে বুনন শক্ত করার কাজে সুচ্চেক বাঁশ ব্যবহার করা হয়।

৭. বেইন ফারদ দড়ি : সুচ্চেক বাঁশের বিকল্প সরঞ্জাম হিসেবে এগুলো ব্যবহার করা হয়। সুচ্চেক বাঁশ কোনো কারণে খুলে গেলে এই ফারদ দড়ির সাহায্যে সুতাগুলো পুনরায় তোলা সম্ভব হয়। সুচ্চেক বাঁশ থাকাকালীন এই ফারদ দড়ি ব্যবহার করা হয় না। এগুলো সুতা দ্বারা তৈরি করা হয়।

৮. শিয়েং : তাঁতকে শক্ত করে ধরে রাখার জন্য শিয়েং ব্যবহার করা হয়ে থাকে। তাঁতে কিছু অংশ বুনা হয়ে যাওয়ার পর সময়মতো শিয়েংটি উপরে তোলা হয়। তারপর তা তাগলকের ন্যায় সুতাগুলোকে শক্ত করে ধরে রাখে। এগুলো বাঁশের তৈরি এবং একচোখা।

কোমর তাঁত বুননরত এক আদিবাসী নারী

৯. তাম্মো বাঁশ : এগুলো বাঁশ কেটে তৈরি করা হয়। তাঁতকে অপর প্রান্তে শক্ত করে ধরে রাখার জন্য এগুলো ব্যবহার করা হয়ে থাকে। দুটি খুঁটি গেড়ে তাতে এই তাম্মো বাঁশটিকে দু'প্রান্তে শক্ত করে বাঁধা হয়।

১০. তাসসিচাম : এগুলো ছোটো একটুকরা চামড়াবিশেষ। হরিণের বা মহিষের চামড়া শুকিয়ে এই তাসসিচাম তৈরি করা হয়। তাসসিচামের সাথে দড়ি বেঁধে কোমরের পেছনে এটি বাঁধা হয়। যারফলে তাঁতে কাপড় বুনার সময় এই তাস্‌সিচাম দ্বারা সম্পূর্ণ তাঁতটি কোমরের সাথে টান খেয়ে সম্পূর্ণ তাঁতকে সোজা টান টান করে

রাখতে সাহায্য করে এবং কোমরেও কোনোরকম ব্যথা অনুভব হয় না। ম্রোরা তাঁতের এই সরঞ্জামকে 'নামফাই' বলে।

১১. মাকু : সুতার নলী ঢুকানোর জন্য কাঠ বা বাঁশ দিয়ে এগুলো তৈরি করা হয়। এগুলোর মাঝখানে একটি ছিদ্র থাকে। উক্ত ছিদ্র দিয়ে সুতাগুলো ক্রমশ বেরিয়ে আসে।

১২. কুদুক কাদাক : সজারু কাঁটা বা পশুর হাঁড় দিয়ে এই কুদুক কাদাক তৈরি করা হয়। তাঁতের বুননকে ঘন অথবা হালকা করার কাজে এটি ব্যবহার হয়ে থাকে। ম্রো ভাষায় এই তাঁতের সরঞ্জামকে 'লুচুক' বলে।

খ. ধানের পোকা দমন পদ্ধতি

বান্দরবান পার্বত্য জেলায় বেশিরভাগ লোকই চাষাবাদ করে জীবিকা নির্বাহ করে। সাধারণত আদিবাসীরা পাহাড়ের গায়ে জুমচাষ করে। তবে বর্তমানে বেশিরভাগ মারমা, চাকমা, তঞ্চঙ্গ্যা ও চাক আদিবাসীদেরকে জমি চাষ করতে দেখা যায়। আমন ধানের চাষের জন্য জুলাই মাসে বৃষ্টির শুরুতেই ধান গাছের মুড়া (গোড়া) সহ জমি চাষ দিয়ে প্রস্তুত করা হয়। ধান গাছের মুড়া পঁচনের ফলে জৈব পদার্থের পরিমাণ বেড়ে তা জৈব সারের কাজ করে। তবে ধান গাছের মুড়া সম্পূর্ণ পঁচে মাটিতে মিশতে প্রায় ১৫ থেকে ৩০ দিন সময় লেগে যায়।

ধানের জমিতে পোকা দমনে আসাম লতা

বীজতলা থেকে ধানের কচি জালা (চারা ধান) এনে লাগানোর পর ১৫-২০ দিনের মধ্যে নতুন কচি বের হতে শুরু করে তখনই সে ধানে মাজড়া পোকার আক্রমণ হয়। অপরদিকে জুমে ধানের শীষ বের হলে যখন ধানের ফুল ধরে তখন নানা ধরনের

পোকামাকড় আক্রমণ করে। কৃষকরা তখন নানান প্রকার পোকা দমনকারী ওষুধ ব্যবহার করে থাকে। পোকা দমনে কীটনাশকের পাশাপাশি বনজ উদ্ভিদের ব্যবহারও পরিলক্ষিত হয়। এই উদ্ভিদটি নরম সরু কাণ্ডবিশিষ্ট এবং এর পাতাও নরম।

লম্বায় ৩-৫ ফুট। এই উদ্ভিদটির কাণ্ড কেটে এনে কৃষকেরা ঐ পোকা আক্রান্ত জমিতে ৪-৫ হাত দূরে দূরে পুঁতে দেয়। যত ঘন করে বনজ উদ্ভিদটি লাগানো যায় ততই পোকার আক্রমণ কমে। এই উদ্ভিদটি 'আসাম লতা' নামে পরিচিত। আবার কোনো কোনো স্থানে পোকা তাড়ানি গাছ হিসেবে পরিচিত। এর বৈজ্ঞানিক নাম Eupatorium species। উদ্ভিদটির পোকা দমন শক্তি পরীক্ষাধীন রয়েছে।

গ. চাক আদিবাসীদের গোধা বা বাঁধ নির্মাণ

ধান বাংলাদেশের প্রধান ফসল। সমতল ভূমির চাষাবাদের পদ্ধতির সাথে পাহাড়ি পরিবেশে ধান চাষ পদ্ধতি ভিন্ন। পাহাড়ি এলাকায় কৃষকেরা বোরো (irrigated) ও আউশ ধান (Rain fed) চাষ করে থাকে। রবিশস্য বোরো ধান চাষের জন্য গোধার প্রয়োজন। পাহাড়ি ঝরনা, ছড়া ও খালের জল নদী বা সাগরমুখী বিধায় অনাবৃষ্টির সময় গোদা বেঁধে ঐ জল আটকিয়ে রেখে বোরো ধানের চাষ করা হয়। কিন্তু গোধা তৈরি করা অত্যন্ত ব্যয়বহুল এবং কষ্টসাধ্য। গোধা তৈরি সাধারণত ডিসেম্বর ও জানুয়ারির মাঝামাঝি সময়ে সম্পাদন করতে হয়। অত্র পাহাড়ি এলাকায় আগাম মৌসুমী বৃষ্টির কারণে অনেক সময় গোধা ভেঙে যায়। ফলে ধানের ছড়া বের হবার আগে পানির অভাবে কৃষকরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

লোকপ্রযুক্তি গোধা

বংশ পরম্পরায় আদিবাসীরা তাদের ঐতিহ্য ধরে রাখতে বর্তমানেও জুমচাষ করছেন, এখানে উল্লেখ্য, নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলায় অগণিত ছড়া, দুটি খাল ও একটি আঁকাবাঁকা নদী, নাম যার বাঁক্খালী, এদেরই মাঝে উজান থেকে ভাটির দিকের চাষি গোষ্ঠী, জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে সবাই মিলে ছোটো ছোটো গোধা তৈরির মাধ্যমে পানি আটকিয়ে রবিশস্য হিসেবে ধান চাষ করে থাকেন। যদি গোধা ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, কৃষকরা নায্য মূল্যে সার পান আর প্রাকৃতিক দুর্যোগ যদি না ঘটে, তবেই কৃষকের সোনালি ধান তাদের মুখে হাসি ফোটায়।

প্রধানত ছড়ার বা ঝরনার উজানভাটি আর প্রশস্ততা ভেদে গোধার স্থাপন বা তৈরির খরচ নির্ধারিত হয়। যত উজানের গোধা হবে উহার উচ্চতা তত বেশি হবে এবং ভিত্তিও মজবুত করে তৈরি করতে হবে। এতে খরচও বেশি পড়ে। মজবুত ভিত্তির কারণ হলো, পানি প্রবাহের প্রথম ধাক্কা উজানের গোধার উপরই পড়ে। তবে প্রত্যেক গোধার উপরেই এক বা দুটি নালা থাকে যা দিয়ে গোধার ধারণক্ষমতার অতিরিক্ত পানি সহজে নির্গমন হতে পারে এবং পরবর্তী নীচের গোধায় আটকায়। এভাবেই চলতে থাকে অতিরিক্ত জলপ্রবাহ আটকানো এবং ব্যবহার, যা দিয়ে ধান চাষ করা হয়। ক্রমান্বয়ে নীচের দিকে চলমান স্রোত কমতে থাকে আর বাঁধ তৈরির খরচও কমতে থাকে। উজানের গোধা তৈরিতে ৫০,০০০ থেকে ১,০০,০০০ টাকা খরচ লাগে। গোধা তৈরিতে ঐ গোধা দ্বারা উপকারভোগী প্রত্যেক চাষি জমির আনুপাতিক হার হিসেবে খরচ বহন করে থাকেন। এ ধানী জমির এক ফসলের লাগিয়ত বা জমার জন্য ভূমিহীন চাষি জমির মালিককে কানি (৪০ শতক) প্রতি দিতে হয় ৩০০০-৩৫০০ টাকা। যদি জমিতে গোধার পানি না ওঠে অর্থাৎ সেচ না দেওয়া যায় সেক্ষেত্রে জমির লাগিয়ত মূল্য কম। তখন দিতে হয় ২৫০০-৩০০০ টাকা। এরূপ ক্ষেত্রে জমির মালিক ঐ ভূমিহীন চাষিকে পাম্পের মাধ্যমে গোধা থেকে সেচের সাহায্য নিয়ে পানি দিতে হয়। গোধার মালিকরা পাম্প মালিকের নিকট থেকে কোনো টাকা দাবি করেন না। ব্যাপারটি সত্যই প্রশংসনীয়। কারণ, যারা অর্থ ব্যয় করে গোধা তৈরি করেছেন তাদের গোধা থেকে পাম্প বসিয়ে অন্যের জমিতে পাম্প মালিক পানি সেচ দেন। বর্গা চাষিকে তার বর্গা জমির ৩৩% অংশ পাম্প মালিককে ঐ পানির বিনিময়ে দিয়ে দিতে হয়। পাম্প মালিক তো জ্বালানি ও পাম্পের খরচ বাবদ টাকা কিংবা ধান দাবি করতেই পারেন। তাই হিসাব কষে বর্গা চাষি ও পাম্প মালিককে জমির এক তৃতীয়াংশ দিতে হয়। গোধা তৈরি থেকে ধান না কাটা পর্যন্ত (ডিসেম্বর থেকে মে মাসের প্রথম সপ্তাহ) গোধায় স্বাভাবিকভাবে মাছ জন্মে, আবার কেউ কেউ মাছ ছেড়ে মাছের চাষ করে থাকেন। এ পানি দিয়ে উজানের কোনো চাষিকে অন্য কৃষি ফসল কিংবা গাছগাছালি লাগাতে অথবা গো-মহিষাদির গোসল করাতেও মানা নেই। গোধার জল সজীবতা ফিরিয়ে দেয় কৃষকের মাঠের ফসলে। ধান গোলায় ওঠার পরই গোধা ভেঙে দিয়ে শুরু করে মাছ ধরার উৎসব। তখন গোধা না ভেঙে উপায় নেই। কারণ, ভারি বর্ষণ হলে এমনিতেই গোধা ভেঙে যাবে। পাহাড়ি এলাকায় হাতির আনাগোনা কম থাকলেও ধান কাটার

সময়টাতে হাতির উৎপাত বেড়ে যায়। ধান খাওয়ার আশায় প্রবেশ করে লোকালয়ে। আক্রান্ত হয় সোনালি ধান। এদিকে কৃষকের মাথায় হাত। সর্বনাশা হাতির এ কর্মকাণ্ড প্রতিহত করতে চাষের এলাকায় তৈরি করা হয় মাচাং। এ মাচাং তৈরি হয় শক্ত গাছের উপর। এ এলাকায় এ ধরনের ১০০টিরও বেশি মাচাং রয়েছে। হাতির পাল যখন আসে মাচাং-এর পাহারাদার চাষিরা সতর্ক সংকেত বাজায় আর চারদিক থেকে বেজে ওঠে কাঁসার শব্দ এবং লাঠির মাথায় খড় বা নেকড়া পেচিয়ে কেরোসিন লাগিয়ে আগুন ধরিয়ে হৈ হৈ রৈ রৈ শব্দে হাতি যে জমিতে আসে সেই জমির দিকে যায়। পাহাড়ি চাষিরা তীর-ধনুক ও বোম্বা (আগুনের মশাল) নিয়েও হাতির আগমনকে প্রতিহত করতে চেষ্টা করে। এতে হাতির পাল মাঝেমধ্যে পালিয়ে যায়, আবার ভয়কে উপেক্ষা করে হাতিরা অন্য জমির ধানও খেয়ে থাকে। হাতির পাল পাকা ধান খেতে না পারলেও পাকা ধানে মই দিয়ে যায়। হাতিও তার প্রতিশোধ নেয়। প্রতি বছর এ এলাকায় ৫-১০ জন লোক হাতির আক্রমণে মারা যায়।

গোধার প্রস্তুত পদ্ধতি

প্রথমে সবাই মিলে গোধার স্থান নির্বাচন করে যাতে গোধা তৈরির স্থান লম্বায় কম হয় এবং পানির বেগও কম হবে এবং নির্ধারিত জমিতে সেচ নিশ্চিত করা যায়। গোধার ভিতটি লম্বায় ৫০-১০০ ফুট হতে পারে। এ গোধার উজানের দিক লম্বায় প্রায় ২ কিলোমিটার। গোধা প্রস্তুতের জন্য প্রথমে ৫-৭ ফুট প্রশস্তে বালি ফেলে পরে ৩-৪ ফুট স্তরের ধানের নতুন খড় বালির উপর বিছিয়ে দিতে হয়। তারপর আবার ৪-৫ ফুট উঁচু করে বালি ফেলতে হয়। এভাবে বাঁধ ১৫-১৬ ফুট উঁচু করতে হয় যাতে কমপক্ষে গোধা জমির সমান্তরাল উঁচু হয়। গোধার উপরিভাগ ৫-৬ ফুট প্রশস্ত রাখা হয়। গোধার পেছনে বাঁশ, বাটনা ও জাম ইত্যাদি গাছের খুটি পুঁতে দিতে হবে। সম্ভব হলে বাঁশের বেড়া দিয়ে চেপে দিতে হবে যাতে বাঁধের মাটি বা বালি সরে গিয়ে ভেঙে না যায়। গোধার সুবিধাজনক সাইট দিয়ে পানি নির্গমন ড্রেন (আউট লেট) করতে হবে। উজানের কাঁধে দুটি আউট লেট থাকলে ভালো হয়। চাষের জমিতে পানি প্রবেশের ড্রেন রাখতে হয় বাঁধের সামনে। স্বাভাবিক নিয়মেই উজানের পানির চাপে জমিতে প্রয়োজনীয় সেচযোগ্য পানি প্রবেশ করে। লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে পানির উচ্চতা বাঁধের উপর দিয়ে উঠে না যায়। এমন অবস্থা হলে নির্গমন ড্রেন খুলে দিতে হবে। অপরদিকে দুষ্ট ছেলে বা শত্রুরা গোধা যাতে ভাঙতে না পারে সেজন্য প্রহরী নিয়োগ করা হয়। এছাড়া ড্রেনের পানি যাতে অপচয় না হয়, তাও প্রহরীদেরকে লক্ষ্য রাখতে হয়।

চরকা

চরকা হলো যা দিয়ে সুতা তৈরি করা হয়। এই চরকা গাছ দিয়ে তৈরি। চরকা দক্ষ আদিবাসী কারিগররা তৈরি করে। চরকাতে বিভিন্ন পাত, ডিজাইন, সুতা, লোহার শিক প্রয়োজন হয়। এই চরকা দিয়ে সুতা টানা বা তৈরি করা হয়। সুতা টানার জন্য লোহার শিক চোকা করে আটকানো হয়ে থাকে। চরকার মুখে তুলা প্যাঁচিয়ে দেওয়ার পরে আস্তে আস্তে লম্বা করে টান দেয় এবং সুতাগুলোকে প্যাঁচায়।

চরকা
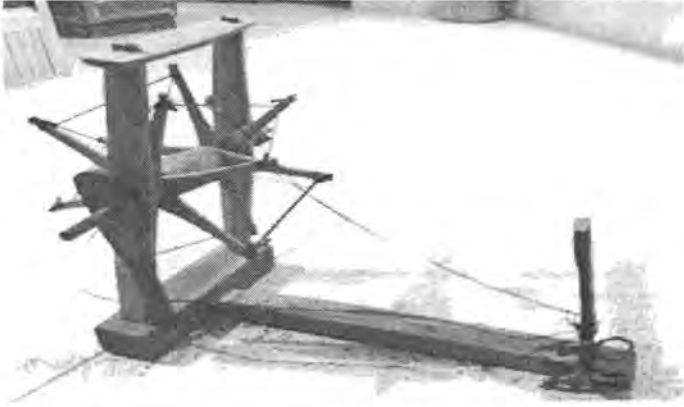
প্যাঁচাতে প্যাঁচাতে বড়ো হলে খুলে দেওয়া হয়। চরকা বিভিন্ন কাঠ দিয়ে তৈরি করা যায়। তবে গামার, চাঁপালিশ, চাঁপাফুল ও গুটগুটিয়া কাঠ দিয়েই বেশিরভাগ চরকা বানানো হয়। পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত সকল পাহাড়ি জনগোষ্ঠী সাধারণত নিজেদের তাঁতে পরিধেয় কাপড় বুনে। সেই ক্ষেত্রে তাঁতের কাপড় বুনার অপরিহার্য অনুষঙ্গ হচ্ছে সুতা। তাই সকল পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর একটি অতি প্রয়োজনীয় সামগ্রী হচ্ছে চরকা।

কাঠের ঢেঁকি

এই কাঠের ঢেঁকি প্রায় পাহাড়ি সমাজে দেখা যায়। এক টুকরা কাঠের গুঁড়িকে ২ হাত লম্বা কেটে নেয়া হয়। এরপর দুই হাত লম্বা কেটে নেয়া কাঠের গুঁড়ির মাঝখানে গর্ত খোদাই করা হয়। এর সাথে ৩-৪ হাত লম্বা একটি কাষ্ঠদণ্ড বানানো হয়। কাঠের গুঁড়ির ভেতর ধান রেখে ওই কাষ্ঠদণ্ড দিয়ে ধান ভানা হয়।

ঢেঁকি

অনেক সময় পিঠা বানানোর জন্য এই কাঠের ঢেঁকিতে চালও গুঁড়া করা হয়। তাছাড়া পাহাড়িরা শুকনা আদা-হলুদ ও শুকনা মরিচ এই কাঠের ঢেঁকিতে গুঁড়া করে থাকে।

তথ্যনির্দেশ

১. সুগত চাকমা (ননাধন) : (পার্বত্য চট্টগ্রামের ভাষাসমূহের পরিচিতি, রাকা (সেতু), জুম ইসথেটিক্স কাউন্সিল (জাক), রাঙ্গামাটি।
২. জাফার আহামাদ হানাফি, উপজাতীয় নন্দন সংস্কৃতি, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ঢাকা
৪. আব্দুল হক চৌধুরী, প্রাচীন আরাকানে রোয়াইঙ্গ্যা হিন্দু ও বড়ুয়া বৌদ্ধ অধিবাসী
৫. ভন্ফগাং মে : পার্বত্য চট্টগ্রামের কৌমসমাজ
৬. Abdul Mabud Khan, The Moghs (A Budhist Community in Bangladesh)
৭. T.H. Lewin, Hill Tracts of Chittagong and Dwellers Theren.
৮. T.H Lewin, A Fly on the Eheel.
৯. Sir Arthur phayre : History of Burma, London, 1883
১০. Abdus Sattar : In the Sylven Shadows,1971
১১. Lorenz G. Loffler, MRU, Hill people on the Border of Bangladesh.
১২. Vunson, ZO History.
১৩. চৌধুরী বাবুল বড়ুয়া, সমুজ্জ্বল সুবাতাস, (সম্পাদক), বালাঘাটা, বান্দরবান
১৪. বাংলাদেশের আদিবাসী, অক্সফাম, বাংলাদেশ
১৫. Rajput A.B.. The tribes of Chittagong Hill Tracts. Karachi. 1965.
১৬. Hutchinson. R.H.S. : An Account of Chittagong Hill Tracts, 1906,
১৭. Bessaignet, P. Social Reasearch in East Pakistan, Asiatic Society of Pakistan Publication, No. 5. (ed) Pierre Bessaignet 2nd Edition, 1964,
১৮. Bernot, L., Ethnic Group of Chittagong Hill Tracts, in Social Research in East Pakistan, Asiatic Society of Pakistan Publication, No. 5. 2nd Sedition. 1964 (ed.) Pierre Bessaignet.
১৯. Mackenzie, Akexander , The North-East Frontier of India, reprinted, 1989,
২০. Willem van Schendel, Francis Buchanan in South–East Bengal (1798), His Journey to Chittagong Hill Tracts, Noakhali and Comilla, 1992,
২১. Ishaque, M. (ed., Bangaldesh District Gazetteers, Chittagong Hill Tracts, 1971.
২২. Bawm Social Council Bangladesh, Bawm Census 2003
২৩. Shahu & Dolian, L, Bawm Zo History, Unpublished.
২৪.. Osman Gani, M: Bose, S.K.; Emdad Hossain.A.T.M.; Mridha, M.N.1999. A compilation of Indigenous Technology Knowledge for Watershed Management

in Bangladesh. Asian Watmanet, Participatory Watershed Management Training in Asia. (PWMTA) Program, FAO. Illustration of Field document : 11. Kathmondu. P.B : 25. Nepal. 42 pp.

২৫. Bose, S.K., Ghani, O., Emdad Hossain, A.T.M.; Tareque, M.and Mridha N.N.1998. A Compilation of Indigenous Technology Knowledge for Upland Watershed Management in Bangladesh. Publisher: Participatory Watershed Management. Training in Asia (PWMTA) Program. FAO. Field Document No : 11, 50 pp

২৬. Emdad Hossain, ATM. 2006. Contributor of the book named Selected Natural Resource Conservation Approaches and Technologies in The Chittagong Hill-Tracts of Bangladesh.Edited by S.K. Khisa et al. 2006. BANCAT,DSC- Intercooperation and IFESCU. printed by Neo Concept (Pvt.) Ltd. 186pp

২৭. মোহাম্মদ ইকবাল, ২০১২. নাইক্ষ্যংছড়ির ইতিহাস ও উন্নয়ন, প্রান্ত প্রকাশন, ৩৬ বাংলাবাজার, ঢাকা-১০০০, পৃ. ১২৪

২৮. ফিলিপ গাইন, ২০১১, চাক প্রান্তিক জীবন, সেড, প্রকাশক ১/১ পল্লবী, মিরপুর, ঢাকা, পৃ.৭৭

২৯. http:www://bangladeshecotours.com

৩০. ২০১১ সালের আদমশুমারি